তৃষ্ণা আমার দু'চোখে

প্রবীর রঞ্জন বসু

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীর কুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাঃ লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৭১

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রক ঃ
শ্রীকমল মিত্র
নবমুদ্রণ
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তৃষ্ণা আমার দু'চোখে

এই উপন্যাসটিকে ভ্রমণ উপন্যাস বলা চলে কি না তা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের মনের ছবি আর প্রকৃতির মাড়িকে তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমার ছিল কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যা সৃষ্টি করতে চেয়েছি তা করতে পেরেছি কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে, তাই এক বাক্যে এই উপন্যাসটিকে ভ্রমণ-উসন্যাস বলতে গিয়েও বলতে পারছি না। অসংখ্য মানুষের মনের জলছবি এবং দু'চোখ ভরে যা দেখছি তা এই উপন্যাসটিতে তুলে রাখতে পেরেছি কি না সে কথাও নির্দ্বিধায় এক বাক্যে স্বীকার করে নিতে পারছি না। সমস্তটাই পাঠকের কাছে ছেড়ে দিচ্ছি, তারা আমার অক্ষমতা অনুধাবন করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে যা ঠিক করবেন তা আমি নতমস্তকে স্বীকার করে নেব—এ অঙ্গীকার থাকল।

লেখক

লেখকের নতুন আঙ্গিকে অন্য এক সৃষ্টি—

'স্বর্গ ও নরকের মানুষ'

আমার প্রয়াত স্ত্রী সীমার স্মরণে

তমসো মা জ্যোতির্গময়। অন্ধকার থেকে আলোতে চল। আঁধার পেরিয়ে আলোতে পৌঁছনই তো মূল কথা। তোমার আমার—সকলেরই একটাই আকাঙ্ক্ষা যে ভাবেই হোক আলোর সন্ধান পেতে হবে। এই আলোর সন্ধানে কত মানুষ গৃহ-ছাড়া, কত মানুষ পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যতক্ষণ বেঁচে আছি আমরা ততক্ষণ শুধু ছোটা আর ছোটা। দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। চ্যুত থেকে বিচ্যুত হয়ে কেউ ছোটে আবার কেউ চার দেয়ালের মধ্যে থেকেই মনের লাগাম খুলে দেয়। শুরু হয় ছোটা। মনের গতি অপ্রতিবন্ধ। বন-বাদার, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু কিম্বা মহাসিন্ধুর ঊর্মিমালা—কোনো কিছুই তার ছোটার গতির অন্তরায় হতে পারে না। আদিত্যের আলোর পরশে শর্বরীর প্রতিদিনের মৃত্যু কিন্তু তা তো শুধু জাগতিক নিয়মে দিবারাত্রি, আঁধার আর আলোর খেলা। এই আলোর জন্য ছটপটানি নয়; এই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারটার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য নেই। সত্যিকারের আলো, যার জন্য তোমার আমার ছোটা তা জ্ঞানকুম্ভ। মনে মনে প্রতি মুহূর্তে বলি জ্ঞানের আলোর কলসটা গড়িয়ে দাও বিধি, সেই আলোতে স্নান করে বলি আর নয়, আর ছোটা নয়, তখন শুধু সুখের বেণু গায়ে মেখে অনন্ত কালের বিশ্রাম।

মৃত্যু কী? রক্ত-মাংসের খোলস থেকে প্রাণ-পাখিটা যেদিন বেরিয়ে পড়বে সেদিনই কী মৃত্যু! এরকম প্রশ্ন যদি কখনো কেউ করে বসে আমাকে তাহলে বলব, দূর তা কেন মৃত্যু মানে স্থবির হওয়া, যে মুহূর্তে ছোটা বন্ধ সে মুহূর্তেই মৃত্যু। তুমি আমি যখন আর আলোর জন্য নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে চাইব না সে মুহূর্তেই আমরা মৃত।

জ্ঞানবৃক্ষের ফলটা হস্তগত করার উদ্দেশ্যে কেউ পুঁথিপত্রের মধ্যে ডুবে থাকে আবার কেউ শরীরকে নিয়ে ছুটে বেড়ায় বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। শেষোক্ত শ্রেণীতে এই অধম অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব-সংসারের সৌন্দর্যের নির্যাসটুকুর প্রতি৯তার লোভ। যে জ্ঞানবৃক্ষের ফলটির দিকে সে হাত বাড়িয়ে আছে তা পেতে হলে গৃহকোণ ছাড়তে হবে, মানুষের মনের সাগরে ডুব দিতে হবে, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য আর অশান্ত পারাবার দু'চোখ মেলে দেখতে হবে। এটাই তার আলো, এটাই তার পরম পাওয়া।

এই কারণেই আমি গৃহহীন, যাযাবর। হাটে-গঞ্জে মানুষ দেখি। তাদের ব্যথা আমার বুকে বাজে, তাদের আনন্দ আমার মনকে স্পর্শ করে। জন-সমুদ্রের মধ্যে গা ভাসিয়ে দি, এই সমুদ্রের সঙ্গে ভেসে চলি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। এতেই আমার সুখ। যখনই পথ চলি তখনই যেন দেখতে পাই সেই মানুষটাকে যে একতারা বাজিয়ে কখনো পাকা সড়ক ধরে, কখনো পায়ে পায়ে যে পথ তৈরি

হয় সে পথ ধরে হেঁটে যায় গান গইতে গাইতে—আমার নয়নের মণি নীলমণিরে কোথায় গেলে দেখতে পাব। এই মানুষটা আমার কল্পনার রাজ্যে ভূমিষ্ঠ হয়নি, তাকে দেখেছিলাম অস্তমিত সূর্যের আলোয়, দূর থেকে। এ এক ছবির সাথে আরো এক ছবি মনে ভাসে—কানি মনসার প্রজাকুল হিস্ হিস্ করে শব্দ করে আর মাথা দোলায়, তাদের কণ্ঠ নীল। মৃত্যুকে দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখে সাপুড়িয়া গাল ফুলিয়ে মহানন্দে পেট মোটা বাঁশি বাজায়। ভয় তাকে স্পর্শ করে না, ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে না। বুক তো কাঁপেই না বরং এক সময় মৃত্যুকে খপ্ করে ধরে ঝুড়িতে ভরে নিয়ে হাঁটা দেয়। ভাবি এ আর এমনকি কঠিন কাজ, শুধু ভাবি না সাপুড়িয়াকে মনে মনে উদ্দেশ্য করে বলি, আমারও অত্যাশ্চর্য এক বাঁশি আছে যে বাঁশি বাজিয়ে হাটে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াই আর খপ্ খপ্ করে এক একটা মনকে ধরে মনের ঝাঁপিতে ভরে হাঁটা দি। এরপরই সেই মানুষটার গান আমার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়—আমার নয়নের মণি নীলমণিরে কোথায় গেলে দেখতে পাব।

তৃষ্ণা আমার দু'চোখে। দু'চোখের তৃষ্ণা মেটাতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছি। 'কত দেখিলাম কত শুনিলাম তবু মিটিল না তৃষ্ণা'—সত্যি আজও মনে হয় অনেক কিছু দেখা বাকি রয়ে গেল। প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাই কে যেন আমার কানের কাছে বলে চলেছে আর নয় এবার বেরিয়ে পড়। যখনই মনে হয় সত্যি তো আর নয়, আর থাকা চলে না তখনই বেরিয়ে পড়ি। এবারও বেরিয়ে পড়েছিলাম একই কারণে।

এবারের গন্তব্যস্থল উত্তর ভারত। সিক্সটি ওয়ান আপের কম্পার্টমেন্টে আমি। আমার সঙ্গী চল্লিশজন। প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী বলতে তিনজন—পাঞ্জাবী, সুন্দরী ললনা দু'জন, একজন প্রৌঢ়া। ট্যুরিস্ট-এজেন্টের রিজার্ভ করা কামরায় আমরা চল্লিশজনই মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত। আমার অবশ্য গোছাবার কিছু নেই যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তা একটা কাঁধে ঝোলানো ঝোলার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

ট্রেন ছাড়তে অনেক দেরি। সবাই কর্মব্যস্ত। আমার কিছু করণীয় নেই বলে প্লাটফর্মের জন-সমুদ্রের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে বসে আছি। রাত দশটায় বাতাসের পর্দা ফাটিয়ে হুইসেল বেজে উঠতেই কিছু মানুষ উঠল গাড়িতে এবং সেই সঙ্গে কিছু মানুষ নামল। হুইসেল বাজার অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানের পরই ট্রেন দুলে উঠল। অশান্ত জন-সমুদ্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম আমরা। এক সময় দুরন্ত গতিতে মাঠ-ঘাট ধু-ধু প্রান্তর ডিঙিয়ে ছুটতে আরম্ভ করল সিক্সটি ওয়ান আপ।

ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে দু'চোখের পাতা এক করার অভ্যেস আমার নেই। তাই জানালা গলিয়ে অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে রাখলাম বাইরে। কত নাম-না-জানা শহর অচেনা গ্রাম দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে

চোখের নিমেষে। অন্ধকারের মধ্য থেকে কখনো জেগে উঠছে এক একটি শহর, তখনই চোখে পড়ছে আলোর বন্যা। ট্রেন থামতেই শুনতে পাচ্ছিলাম কুলিদের হাঁকডাক, ফেরিওয়ালাদের এক টানা কণ্ঠস্বর আর সেই সঙ্গে চোখে পড়ছিল যাত্রীদের ওঠা-নামার ব্যস্ততা। ট্রেন চলতেই সেই কোলাহল মিলিয়ে আবার বিরাজ করতে শুরু করছিল নীরবতা। শুধু মাঝে মাঝে ছোট দু'একটা বাচ্চার কান্না রাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছিল। দৃষ্টিটা ট্রেনের কামরায় ফিরিয়ে আনলাম। প্রায় সকলেই ঘুমিয়ে আছে, শুধু পাঞ্জাবী প্রৌঢ়ার চোখে ঘুম নেই। আমার চোখে চোখ পড়তেই হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। আমি উঠে তাঁর কাছে যেতেই একটু সরে আমাকে বসার জায়গা করে দিয়ে বললেন, বৈঠো বেটা।

আমি বসার সঙ্গে সঙ্গে উনি আবার মুখ খুললেন।—বেটা তুমকো নিদ নেহী আতি ?—প্রশ্ন করলেন বটে কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলতে শুরু করলেন, বুঝতে পারছি আমারই মত তোমার অভ্যেস, ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টে ঘুম আসতে চায় না, তাই না ? আমারও আসে না। ট্রেনের কামরায় একা জেগে থাকতেও ভাল লাগে না আবার ঘুমোতেও ইচ্ছে করে না। জার্ণির সময়কার রাত্রিগুলো বড়ই ক্লান্তিকর, তোমার কী মনে হয় ?—কথা শেষ করে আমার মুখের উপর দৃষ্টি ছাড়িয়ে রাখলেন।

বললাম, না, মোটেই নয় অন্তত আমার সে রকম মনে হয় না, বরং ভালই লাগে। ট্রেনের কামরা থেকে ভারতবর্ষের অনেকটা অংশ দেখে নিতে পারছি এটা কী কম লাভ ?—এরপর হয়ত বলতে পারতাম দু'চোখে আমার তৃষ্ণা, মন সব সময় জানাচ্ছে দু'চোখ খোলা রাখ, দু' চোখ ভরে দেখ পৃথিবীটাকে। মানুষের মনের গভীরে ডুব দাও, জীবন তরী ভাসিয়ে নিয়ে চল এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে। মানুষের মন-সমুদ্রে ডুব দিয়ে যা পাচ্ছ তা দিয়ে পূর্ণ কর এ তরী, কিন্তু ভরসা না হওয়ায় এত কথা জানাতে পারলাম না, যেটুকু জানালাম তাতেই ভদ্রমহিলা বিস্মিত হযে বললেন, বল কী এই মাঠ-ঘাট তোমাকে আকর্ষণ করে ! না তুমি আর দশজনের মত নও। সত্যি কথা বলবে—লেখ-টেখ ?

বললাম, একটু-আধটু, উল্লেখযোগ্য নয়।

তাহলে তো বেশ সতর্ক হয়ে কথা বলতে হবে।—গভীর দৃষ্টি আমার চোখের উপর রেখে উচ্চারণ করলেন কথাটা।

কেন ?—ভদ্রমহিলার এ কথা বলার কারণটা বুঝতে না পারার জন্য যেন ঠোঁট থেকে খসে পড়ল প্রশ্নটা।

লেখকদের কী ভরসা করা যায় ! বেহিসেবী কথা বললেই বিপদ, কখন কী লিখে বসবে তার কী ঠিক আছে আর তাছাড়া আমি তো লেখকদের কাছে একটা লোভনীয় চরিত্র। দাঁড়াও বাবা তোমার সঙ্গে কথা বলার আগে মনের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করি তারপর—দেখ অসতর্ক মুহূর্তে মনে সিঁদ দিতে শুরু

কর না যেন। দিনরাত্রি আমি মন আগলে বসে থাকতে পারব না বাপু। সুরেখা আর বিয়াসকেও সাবধান করে দিতে হবে।

ভদ্রমহিলার চোখ-মুখ এবং কথা বলার ধরন দেখে বুঝলাম রসিকতা করার অভ্যেস আছে।

আমাকে কী আপনি সেই দরের লেখক ভেবেছেন! হা হতোস্মি! আমার মত লেখক আপনি বাংলার ঘরে-ঘরে পাবেন। এক প্যাকেট সিগারেট আর দশ কাপ চা ধ্বংস করে এক-আধ পাতা লিখি আর তাতেই নিজেকে লেখক ভাবি। আসলে লেখক বলতে যা বোঝেন আপনারা সে রকম আমি মোটেই নই।

আমার কথা শেষ হতেই ভদ্রমহিলা শব্দ করে হাসতে থাকলেন। মনে হলো পিয়ানোর সব কটি রিড যেন বেজে উঠল। এই বয়সেও এত সুন্দরভাবে হাসা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

হাসি বন্ধ হওয়ার পর মুখ খুললেন, বাংলার ঘরে ঘরে দিলারী কাপুরের পদচিহ্ন এখনো মিলিয়ে যায়নি। তিরিশ বছর ধরে বাংলার জল মাটির সঙ্গে পরিচয়। শুধু বাংলা ভাষাটা ভাল মত বলতে শিখলাম না এটাই আফসোস রয়ে গেল। কিন্তু আমার দুই মেয়েকে আমার মত ভেবে বসো না, ওরা বাংলা মাতৃভাষার মত বলতে পারে। শুধু কী তাই চেহারা বাদ দিলে ওরা পুরোপুরি বাঙ্গালী। বাংলার ঘরে-ঘরে লেখক তো দূরের কথা শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা বলতে পারে এরকম লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়। —কথা বলতে দিলারী কাপুর একটা কৌটো খুলে পান বার করলেন। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, চলবে?

বললাম, ধন্যবাদ এ নেশার কবল থেকে এখনো আমি মুক্ত।

ভদ্রমহিলা পানটা নিজের মুখে পুরে দিয়ে বললেন, আমার এ নেশা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। মা খুব পান খেতেন, দিদিমাও খেতেন। শুনেছি দিদিমার মা'রও একই অভ্যেস ছিল। আমার মেয়েরা কিন্তু এ নেশার কবল থেকে শুধু মুক্তই নয় বরং এই একটি কারণে আমার উপর কিছুটা বিরক্তও। হবে না-ই বা কেন বল সারাদিন পান চিবোতে দেখলে কার না বিরক্তি আসে। যাক সে কথা তুমি বিরক্ত বোধ করছ না তো?

পান চিবোবার জন্য?

আমার কথা শুনে হেসে ফেললেন দিলারী কাপুর। —আরে না এত বকছি বলে বলছি।

আমি সোজাসুজি দিলারী কাপুরের মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললাম, আপনার কী আমার সঙ্গে কথা বলে তাই মনে হচ্ছে? যদি সেরকম মনে হয় তাহলে আমি আশ্চর্য হব, বলব মানুষের চরিত্র জানার ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ আপনি। সত্যি কথা বলতে কী আপনার কথা শুনতে ভাল লাগছে। একটা প্রশ্ন ছিল যদি অভয় দেন তাহলে ব্যক্ত করতে পারি।

এত সংকোচ কেন ? তুমি তো আমার ছেলের মত নিঃসংকোচে বল।—দিলারী কাপুরের দুটি কৌতূহলী চোখ আমার চোখের উপর স্থির হয়ে আছে।

একটু আগে বলেছেন লেখকদের কাছে আপনি লোভনীয় চরিত্র—আমার উপর নিশ্চয়ই আপনি নির্দয় হবেন না? —প্রশ্নটা করেই বুঝলাম আরো কিছুক্ষণ সময় দেয়া উচিত ছিল অর্থাৎ আরো কিছুক্ষণ কথা বিনিময়ের পর প্রশ্নটা করলে ঠিক হতো। যাই হোক যখন করেই ফেলেছি তখন উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তীর নিক্ষিপ্ত হবার পর তাকে তূণে ফিরিয়ে আনা যায় না।

দিলারী কাপুর প্রথমে আমার প্রশ্ন শুনে ঠোঁট টিপে হাসলেন তারপর আমার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললেন, তোমাকে কিন্তু আরো বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি এ প্রশ্ন করবে ভাবিনি। আমি লেখক নই তবু আমার মনে হয় গল্প লিখিয়েদের আরো ধৈর্যশীল হওয়া উচিত। অপেক্ষা করা উচিত তার জন্য যাকে তুমি বুঝতে চাইছ বা জানতে চাইছ অর্থাৎ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সে নিজেকে একটু একটু করে ব্যক্ত করবে আর তুমি থাকবে তার প্রতীক্ষায়, তারপর বিচার করবে সে তোমার গল্পের কোনো চরিত্র হতে পারে কিনা। এবার মনে হয় সত্যি তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে শুরু করেছি। —এতক্ষণ খুব সীরিয়াস ভাবে কথা বলছিলেন। হঠাৎ পূর্বের হাল্কা সুরটা ফিরিয়ে এনে বললেন, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়, এরই মধ্যে সিঁধকাঠি বার করতে শুরু করেছ!

এরপর দিলারী কাপুর একেবারে থেমে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। একটাও কথা বললেন না। আমিও নির্বাক হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বুঝতে পারছিলাম স্মৃতির অরণ্যের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রমহিলা। অতীতের ছেঁড়া পাতাগুলো একে একে জড়ো করছেন। মুখের রং একটু একটু করে পরিবর্তিত হচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল কোনো অশান্ত নদী পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে। চোখের ভাষা কিরকম যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। এতক্ষণ যার সাথে পরিচয় হয়েছে এ যেন সে নয় অন্য কেউ। উনি মুখ খোলার পর বুঝলাম আমার অনুমান মিথ্যে নয়। তাঁর প্রথম কথাতেই বুঝলাম এতক্ষণ যে উত্তরীয়টা গায়ে ছিল সেটা খসে পড়েছে। দিলারী কাপুর এখন অন্য মানুষ।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যেন একটা গোটা পৃথিবী আছে। পৃথিবীর যেমন বেশির ভাগটাই জল আর স্থল খুব সামান্য, সেরকম মানুষের জীবনের বেশির ভাগটাই দুঃখ কষ্ট, সুখ খুবই কম। শুধু তাই নয়, একটা গোটা বিশ্বে যত হিংস্র প্রাণী আছে, যত অরণ্য আছে, যত অন্ধকার আছে, যত জটিলতা আছে—একটা মানুষের মধ্যেও আছে ততখানি। এত কথা বলছি কেন জান?—প্রশ্ন করে নীরবতার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসলেন দিলারী কাপুর।

বুঝলাম প্রশ্ন করলেও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। উত্তরের প্রত্যাশা করে

এ প্রশ্ন করেননি। পরবর্তী বক্তব্যের পূর্বারম্ভে এ ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা প্রমাণিত হল অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানের পর।

অনেক কথা বললাম তোমাকে কিন্তু কেন বলতে হলো যে প্রসঙ্গের অবতারণা করতেই হয় তা একটা অপ্রস্ফুটিত মেয়ের কথা। অফুরন্ত সময় জেগে থাকতে হবে দুজনকেই, সুতরাং তুমি যদি বিরক্ত বোধ না কর তাহলে একজন সতের বছর বয়সের মেয়ের কিছু কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তার কথা বলতেই হতো তবে···

আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত বোধ করব না আপনি সবিস্তারে বলুন।

বেশ তাহলে একটু আগে থেকেই শুরু করি কী বল ?

নির্দ্বিধাঃ।

আমরা তখনো কলকাতায় আসিনি। কলকাতায় আসার অনেক পূর্বেকার ঘটনা। তখন আমরা থাকতাম অমৃতসরে। গেছ ?

আমি প্রথমে মাথাটা ডানদিক থেকে বাঁদিকে, তারপর বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিয়ে আসলাম। এইভাবে বার কয়েক মাথাটা দোলাবার পর বললাম, গেলে মনে হয় সুবিধা হতো—না ?

না, তা নয় এমনি জিজ্ঞেস করলাম। যাক যা বলছিলাম, একটা সতের বছরের মেয়ের ভাললাগার আঙিনায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন। এক দীর্ঘকায় যুবক। তার মধ্যে ছিল অনেকগুলো পৃথিবীর হিংস্রতা, প্রথম রিপুর অদম্য তাড়না আর অন্ধকার, যা ঐ সতের বছরের কিশোরীরই শুধু নয়, অনেকের জীবন তছনছ করে দিয়েছিল। তুমি শিল্পী বলেই এত কথা বলছি। শিল্পীর তো একটা তৃতীয় নয়ন আছে যে নয়ন দিয়ে সে যেভাবে দেখতে পারে আর দশজন সেভাবে দেখে না। এসো আগে তোমাকে সেই যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। ছেলেটার নাম রণবীর দত্ত। আমরা অমৃতসরে যেখানে থাকতাম অর্থাৎ যে পাড়াতে থাকতাম সে পাড়াতেই থাকত ও। রণবীরের বাইরের চেহারাটা ভাল, ভাল বললেই যে সব বলা হলো তা নয় আসলে ও ছিল সুপুরুষ ও বাকপটু। কথার অস্ত্র কত ধারালো হতে পারে তা ওর সঙ্গে কথা না বললে বোঝা যাবে না। ওর ঐ কথার অস্ত্রের আঘাতে মেয়েদের লজ্জার আবরণ অক্ষত থাকে না বিশেষত যারা যৌবনের চৌকাঠ ডিঙোবার জন্য হামাগুড়ি দিচ্ছে। এরা ভালবাসার অর্থ জানে না, ভাল লাগাকেই ভালবাসা বলে ভুল করে। এবার আসি আমার প্রসঙ্গে, ভগবান আমাকে এক অদৃশ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন বোধহয়। আমি মানুষের ভেতরের চেহারাটা সহজেই দেখতে পাই। রণবীরকে দেখেছিলাম এবং ওর মনের চারপাশে ঘিরে থাকা পাঁচটা বিপুল আকৃতির রিপুকেও দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। যা হবার তা হয়ে গেছে তখন। যদি আর কিছুদিন আগে ওকে দেখতাম তাহলে ঐ সতের বছরের কিশোরীকে বাঁচাতে পারতাম। একটা কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোটবার আগেই ঝরে গেল।

কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ওকে অকালে চলে যেতে হলো শুধুমাত্র ঐ মানুষের আকৃতিতে পশুটার জন্য। মেয়েটার কথা তো শুনলে এবার নিশ্চয়ই ওর পরিচয়টা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এত বড় বিশ্বে নিশ্চয়ই একাধিক রণবীর আছে এবং অনেক সতের বছরের মেয়েকেও কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। দিলারী কাপুর যে তাদের কাহিনী আমাকে শোনাবেন না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে যখন তখন নিশ্চয়ই তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তা। মর্মান্তিক এই ঘটনার উপর আমার কোনো কৌতূহল প্রকাশ করা অথবা মন্তব্য করা ঠিক হবে না মনে হওয়ায় নিরুত্তর থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

যার কথা বললাম সে আমার বোন। — আমার উত্তরের অপেক্ষায় দু'এক মুহূর্ত থেকেই পুনর্বার মুখ খুললেন দিলারী কাপুর। এ পর্যন্ত বলে উনি দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন কম্পার্টমেণ্টের বাইরে।

(বুঝলাম একটা কষ্ট তাকে গ্রাস করে ফেলল। মানুষের মনে যখন কষ্টের বিস্তার হয় তখন সে অন্ধকার খোঁজে। অন্ধকার তখন আপনজনের মত আশ্রয় দেয় তাকে। অন্ধকারের রূপ তখন সুন্দর। এই এক জায়গায় আলোর পরাজয়)

ঠিক কতক্ষণ বলতে পারব না হয়ত দশ কিম্বা পনের মিনিট ঐ ভাবে বসে থাকলেন ভদ্রমহিলা তারপর আবার আমার দিকে ঘুরে বসলেন। যে মেঘ দেখতে পেয়েছিলাম তার মুখে এখন আর তা নেই, সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর যেরকম ঝলমল করতে থাকে সেরকম নয় তবু আগের চেহারা দেখতে পেলাম না। ঘুরে বললেন, কী লেখ ?

বললাম, গল্প-উপন্যাস এই সব।

পাঠক আছে ?

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে হাসলাম।

আমাকে হাসতে দেখে অনুমান করলেন কিছু। বললেন, বুঝলাম অখ্যাত নও প্রতিষ্ঠা পেয়েছ, আমার মেয়েরা চিনবে তোমাকে।

এই ভাবে আমাদের আলাপ বেশ ঘন হতে থাকল। এ কথা সে কথা করে অনেক কথার মালা গাঁথতে থাকলাম আমরা। দিলারী কাপুর যেন আকশি দিয়ে কথার পর কথা নামিয়ে আনছেন। নিজের কথা যে খুব বেশি বলছেন তা নয় কিন্তু যা বলছেন তার মধ্যেই ভাললাগার উপকরণ আছে। অন্যের কথা বলতে পারব না তবে আমার ভাল লাগছে। প্রত্যেকটা কথার উপস্থাপনা বড় সুন্দর। আসলে বলার ধরনটাই এত ভাল যে হা করে তার কথা গিলে চলেছি।

অন্ধকারের বুক চিরে ভোরের আলো ঝরে পড়ছে গাছ-গাছালির মাথার উপর। যাত্রীরা দু'একজন করে জেগে উঠতে শুরু করেছে। দিলারী কাপুরের এক মেয়ে উঠে পড়ল। অন্যজন এখনো ঘুমচ্ছে। যার ঘুম ভাঙল তাকে আমি আগেই

দেখেছি। জাগ্রত অবস্থায় দু'জনকেই দেখেছি অর্থাৎ দিলারী কাপুরের দুই মেয়েকেই দেখেছি কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় শুধুমাত্র ওকেই দেখেছি। অন্যজন উপরের বাঙ্কে যেদিকে ফিরে শুয়ে আছে সেদিকে দৃষ্টি দেখার চেষ্টা না করলে পড়ার কথা নয়। জাগ্রত অবস্থায় যা দেখেছি তাতে বলতে পারি বিধাতা ওদের অকৃপণ হাতে গড়েছেন। যে ঘুমচ্ছে তার ক্ষেত্রে বিধাতা বড্ড বেশি অকৃপণ ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

মেয়েটি ঘুম থেকে উঠেই ওর মা'র সঙ্গে কথা বলল। ও মাতৃভাষায় কী বলল তা আমার বোঝার কথা নয়, তা সত্ত্বেও আমি ওদের কথোপকথন শুনছিলাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না বলেই হয়ত এভাবে ওদের মুখের উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে বসে থাকতে পারছিলাম। পারলে এভাবে তাকিয়ে থাকা মোটেও সুশোভন হতো না। মেয়েটি তার মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেভাবে ঘুরে আমার দিকে তাকাল তাতে একটা প্রচণ্ড অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করে ফেলল। অস্বস্তির বড় কারণ ওদের মুখের উপর থেকে যে দৃষ্টি সরিয়ে নেব সে সুযোগও পেলাম না। জানি না মেয়েটা কী ভাবছে, যদি ভেবে থাকে ওদের ভাষা আমি বুঝি তাহলে ও অভদ্র ভাবতে পারে, আর যদি ভেবে থাকে ওকে আমি দেখছিলাম তাহলে ব্যাপারটা কতটা খারাপ হতে পারে তা ভাবাই যায় না। ঘুরে আমাকে উদ্দেশ্য করে যা বলল তাতে অস্বস্তি কমল। পরিষ্কার বাংলায় বলল, মায়ের মুখে শুনলাম আপনি লেখক, নামটা জানতে পারি?

বললাম, বলব কিন্তু তার পূর্বে বলুন আমার সম্বন্ধে কী কী বলেছেন?

দিলারী কাপুর একবিন্দুও বাড়িয়ে বলেননি। সত্যি মেয়েটার বাংলা উচ্চারণ নিখুঁত। চেহারাতে কিছুটা অবাঙ্গলীত্বের ছাপ আছে ঠিকই কিন্তু তা বাদে আর যা কিছু চোখে পড়ছে তাতে বলা যায় বাঙ্গালীর সঙ্গে ওর প্রভেদ একেবারেই নেই।

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটি হাসল প্রথম তারপর বলল, ভয় নেই সুখ্যাতিই করছিলেন।

এবার আমাকে বলতেই হলো, না সেজন্য বলছি না। এখন সুখ্যাতি অখ্যাতি নিয়ে ভাবি না, ওগুলো বোধহয় আর বিশেষ স্পর্শ করে না আমাকে।

মিথ্যে কথা। ওগুলো যে জায়গায় গেলে মনকে স্পর্শ করে না সে জায়গায় আমরা কেউই পৌঁছতে পারিনি। যাঁরা পৌঁছেছেন তাঁদের লোকালয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা ডেডিকেটেড্। ঈশ্বরের উপাসনায় রত, তাদের যা কিছু তা পুরোটাই ঈশ্বরকে ঘিরে। একমাত্র তাঁদের জাগতিক কোনো কিছু স্পর্শ করতে পারে না। যদি প্রশ্ন করি আপনি লেখেন কেন কি উত্তর দেবেন?

যদি বলি ভাললাগে তাই লিখি তাহোলে?

তাহলে আবার আমাকে বলতে হবে একই কথা। একজন ভদ্রলোককে বার বার মিথ্যেবাদী বললে তার তা ভাল লাগার কথা নয়। যে বলে তারও নয়।

আপনি কোন্‌জন—সুরেখা না বিয়াস?

আমার প্রশ্ন শুনে মেয়েটাকে হাসতে দেখলাম। হাসিটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে মিলিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ নজর না রাখলে ধরা যেত না। বুঝলাম আমার প্রসঙ্গ থেকে সরে যাওয়ার কারণটা ধরে ফেলেছে বলেই হেসেছিল। বলল, কিছুক্ষণ কথা বললেই নিজেই অনুমান করতে পারতেন। বিয়াসের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ যেরকম অহোরাত্র শোনা যায় সেরকম আমিও অনর্গল কথা বলতে ভালবাসি। সুরেখা অন্য রকম, ওর চুলের ডগ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত হিম-শীতল, ওকে এড়িয়ে চলবেন, তা না হলেই বিপদ—উত্তাপ হারিয়ে ফেলবেন। আমার একটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এখনো পাইনি।

আমার নামটা জানতে চেয়েছিলেন তাই তো ?—এ পর্যন্ত বলার পর নামটা জানালাম।

শুনে ও বলল, প্রতিষ্ঠিত লেখক, অথচ মা'র কাছে আপনি যেভাবে বলেছেন তাতে মা আদৌ এতটা প্রতিষ্ঠিত ব'লে অনুমান করতে পারেনি।

আমার বোধহয় নিরুত্তর থাকাই ভাল।

ভয় পাচ্ছেন ?

নিঃসন্দেহে বলতে পারি পাচ্ছি।

তাহলে আপনার মত মানুষকে ভয় পাওয়াতে পারছি ?

কেন আমার কী ভয় পাওয়ার কথা নয় ?

কলমের যা জোর দেখি তাতে কি করে বলি সত্যি ভয় পাচ্ছেন।

কারণ মিথ্যেবাদী বদনামটা তো শুনতে হয়েছে আমাকেই এবং সেটা যে সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেননি।

দাঁড়ান আমাকে একটু সময় দিন তারপর ভেবে দেখব সত্যি আপনি নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন কি না।

বুঝলাম বিয়াস এখন আর কথা বাড়াতে চাইছে না। ও কম্পার্টমেণ্টের অন্য প্রান্তে চলে গেল।

ও চলে যেতেই আমি দৃষ্টি বিস্তার করলাম। তরল আলকাতরার মত অন্ধকার এখন আর নেই। হঠাৎ যেন রাতের বৃন্ত থেকে ফুটন্ত সকালকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে। ঝকঝকে ভোরের আলো জানালা ডিঙিয়ে কামরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন প্রায় বেশির ভাগ যাত্রী উঠে পড়েছে। ভোরের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়ে জন-কোলাহল যেন বার বার ছোট বড় ঢেউয়ের মত ভেসে বেড়াচ্ছে সমস্ত কম্পার্টমেণ্টে। একটু আগে পরে আলাপ করার ইচ্ছে জানিয়ে বিয়াস বগির শেষ প্রান্তের দিকে চলে গিয়েছিল। এরপর আমাদের আবার দেখা যখন হলো তখন সূর্যের রং স্বর্ণাভ। সোনালী রোদ ধানক্ষেত আর গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। লাঙ্গল কাঁধে চাষিরা এখন মাঠে। দূরে দিগন্তে সবুজের সমারোহ। কখনো দেখতে পাচ্ছি নরম রোদে গা ডুবিয়ে বসে আছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আবার কখনো চোখে পড়ছে জীর্ণ কুঠির, আটপৌরে গ্রাম। মেঠো রাস্তায় গরুর গাড়ি,

কলসী কাঁখে গ্রাম্যবধূ এবং রুগ্ন নদীর বুকে ছেলেদের মাছ ধরা দেখে মনে হচ্ছিল কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি।

কি ভাবছেন ?—আমার পাশে এসে বসল বিয়াস।

ওর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই সম্ভবত কারণ ঠিক ঐ প্রশ্নের উত্তর ও চাইছে বলে মনে হলো না, আসলে ওটা কথা পাড়ার সূত্র বলেই মনে হলো আমার তাই ওর প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে বললাম, আপনারা কলকাতায় থেকেই বড় হয়েছেন আর আপনার মা আপনাদের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকে কলকাতায় আছেন এটা গতরাত্রে তাঁর কাছ থেকে শুনেছি।

আর কী কী শুনেছেন ?

শুনেছি অনেক কিন্তু কোন্ কথাগুলো জানতে চাইছেন জানলে জানাতে পারি।

শুধু আমাদের প্রসঙ্গে, আমার আর সুরেখার।

চেহারা বাদ দিয়ে আপনারা পুরোপরি বাঙ্গালী এর বাইরে আর একটি কথাও বলেননি।

মা'র সম্বন্ধে ?

খুব উল্লেখযোগ্য কিছু বলেননি।

মা অমৃতসরে পড়াশোনা করেছেন। শেষ করেছেন কলকাতায়। শেষ করে একটা কলেজে চাকরি নিয়েছিলেন, এখনো সেখানেই।

কি কাজ করেন ?

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

আপনি ?

আমি অতদূর পৌঁছতে পারিনি। বিশ্বভারতী থেকে কলা বিভাগে স্নাতক হবার পর আর পড়িনি। যদিও অনার্স ছিল ইতিহাসে তবু আর পড়ার ইচ্ছে নেই।

কেন ?

ভাল লাগছে না।

সুরেখা ?

ও বাংলায় এম-এ। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। ভাবছেন একজন অবাঙ্গালী বাংলা নিয়ে পড়ল কেন। আসলে কী জানেন বাংলাদেশের ভাষা এবং বাংলার কালচার আমাদের রক্তের অণুপরমাণুর সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু তাই নয় এখন আমরা নামে আর চেহারায় অবাঙ্গালী। একটা গোপন কথা জানিয়ে দি ভবিষ্যতে আমার কিন্তু অবাঙ্গালী পদবীটা বর্জন করার ইচ্ছে আছে।

এই পঞ্চনদীর দেশের দুহিতাটির সহজ স্বীকারোক্তি বিশেষ করে একজন অপরিচিত পুরুষের কাছে অস্বাভাবিক, কিন্তু ওর বলার ধরনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা শুনলে অস্বাভাবিক মনে হয় না। ওর সঙ্গে কথা বলার সময়ে একজনের চেহারা ভেসে উঠেছিল মনের দর্পণে। অনীতা রাহা, প্রবাসী বাঙ্গালী। কন্যা-কুমারিতে পরিচয় হয় তার সঙ্গে। ভারতবর্ষকে জানতে একাই বেরিয়ে পড়েছিল।

ট্র্যাভেলিং এজেন্টদের সঙ্গে মেয়েদের একা বেরনো যথেষ্ট নিরাপদ। অনেক মেয়েই একা যায় তবে অনীতার মত বয়সের মেয়েদের একা যেতে এর আগে দেখিনি। না দেখার কারণ একটাই, বাড়ির লোকরা একা ছেড়ে দিতে চায় না। অনীতার ক্ষেত্রে সে সম্ভবনা ছিল না, ওর একমাত্র আত্মীয় বলতে জেঠা এবং সেই জেঠার বর্তমান বাসস্থান সানফ্রানসিস্কোতে। মাঝে মাঝে সেই সুদূর শহর থেকে অনীতা একা ভারতবর্ষে আসে। এক-দেড় মাস কাটিয়ে আবার ফিরে যায়, ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর জেনেছিলাম। শুধু ঐ টুকুই নয় অনেক কিছু ও জানিয়েছিল।

সেবারও প্রায় সমসংখ্যক যাত্রী নিয়ে একটা ট্র্যাভেলিং এজেন্ট বেরিয়েছিল দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এই অধমও সৌভাগ্যক্রমে যাত্রীদের একজন হতে পেরেছিল। অনীতার সঙ্গে পরিচয়ও সেই সময়। বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতা না থাকলে ঠিক ঐভাবে পরিচিত হবার জন্য ও এগিয়ে আসত কিনা সন্দেহ। অন্তত ভারতবর্ষে যাদের বাস তারা কোনো পুরুষের সাথে ঐভাবে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে না। কন্যাকুমারিতে পৌঁছনর পর, বিকেলে রোদ ছোট হতে শুরু করার সাথে সাথে যাত্রীরা একে একে বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। এক সময় আমি আবিষ্কার করলাম গেষ্টহাউসে আমরা তিনজন মাত্র অবশিষ্ট। আমি, অনীতা এবং এক বৃদ্ধ। আমি গেষ্টহাউসের বারান্দায় একটা চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে ভাবছি রোদ উৎসে ফিরে যাওয়ার পর বেরোব। যদিও চার দেয়ালের মধ্যে থাকার মানুষ আমি নই তবু প্রতীক্ষা করছিলাম শরীরের কথা ভেবে, একটু বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা যদি কিছুটা ঝরঝরে হয় তাহলে সতেজ দেহমন নিয়ে প্রকৃতির রাজ্য থেকে যতটা পারব সৌন্দর্য লুঠে করে আনব। ট্রেন জার্নিতে আমি কখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ি না ; এবারের ক্লান্তির কারণ, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের প্রাক্কালে সামান্য জ্বর ছিল। যাক সে কথা, যে কথা বলার জন্য এত কথার অবতারণা সেই কথাই এখনো বলা হয়নি। আসলে অনীতার কথা বলাই আমার মূল উদ্দেশ্য, এখন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। আমি গেষ্ট হাউসের বারান্দায় যখন বসে আছি তখন হঠাৎ অনীতা আমার কাছে এসে বলল, কী আপনি বেরোবেন না ?

আমার দেরি করে বেরোবার কারণ ওর কাছে ব্যক্ত করলাম।

শুনে বলল, যখন বেরোবেন আমাকে সঙ্গে নেবেন, আপনার অপেক্ষায় থাকলাম।—বলে আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ওর ঘরে ফিরে গেল।

ওর কথার পর যে কিছু বলব সে সুযোগই পেলাম না। ওর কথা শুনে এতই বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম যে তা কাটিয়ে উঠতেই বেশ দেরি হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার সঙ্গে ওর একটিও কথা হয়নি। একজন তরুণী বিনা পরিচয়েই এক অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে বেরোবার কথা ভাবতে পারে তা ভাবাই যায় না। জীবন-তরী তো অনেক ঘাটেই ভেসে গিয়েছে, অনেক চরিত্র মনের দর্পণে আজও ভেসে ওঠে। আমার এ তরী অনেক বিচিত্র অনুভূতি, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতায়

পূর্ণ, তবু ঐ অভিজ্ঞতা যেন স্বতন্ত্র। তবে সেই চির পুরাতন সত্য তো রয়েছেই—স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা নঃ জানন্তি কুত মনুষ্যাঃ !

সূর্যাস্তের একটু আগেই অনীতা আমি বেরিয়েছিলাম। ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে যেন সে দৃশ্য আজও দেখতে পাই, তিন সমুদ্রের সঙ্গমস্থল কন্যাকুমারি। অশান্ত জলরাশির মধ্যে বিবেকানন্দশিলা। সেই শিলার উপর আমি আর অনীতা দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্ত দেখছি। রক্তের মত লাল সূর্যকে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে দেখছি সীমাহীন জলরাশির মধ্যে। সমস্ত আকাশ জুড়ে লালের আভা।

সেদিন অনীতার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটিয়েছি। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার কথা ও নির্দ্বিধায় জানিয়েছে। সে সব অভিজ্ঞতা খুব কম মহিলার জীবনেই ঘটে। আমি ওকে প্রশ্ন করেছিলাম, আমার একটা প্রশ্নের সদুত্তর দেবে অনীতা ?

কী প্রশ্ন ?—আমার প্রশ্নের পর ও প্রশ্ন করল।

ওর চোখের তারায় কৌতূহল দেখতে পেলাম। অস্বস্তি হলো। না চোখের তারায় কৌতূহল দেখতে পেলাম বলে নয়, অস্বস্তির কারণ অন্য। ও এত ঘন হয়ে আমার শরীরের সঙ্গে আছে বলে। ওর চুল আমার মুখের উপর আছড়ে পড়ছিল দুরন্ত শিশুর মত। ওর শরীর থেকে ভেসে আসছিল বিদেশী সেন্টের অচেনা গন্ধ। এছাড়া ও যখনই আমার দিকে ঘুরছিল তখনই ওর মুখ আমার মুখের এত কাছে চলে আসছিল যে বুকের ভেতরটায় রীতিমত কাঁপুনি অনুভব করছিলাম। সব থেকে বেশি বিব্রত বোধ করছিলাম ওর উদ্ধত যৌবনের প্রতি উদাসীনতা দেখে। যখনই অনীতা ডাইনে কিম্বা বাঁ দিকে ঝুঁকে কিছু দেখবার চেষ্টা করছিল তখনই আমার শরীরের সাথে এমনই মাখামাখি হচ্ছিল যে ওর অন্তর্বাসের শাসনেও শরীর সংযত থাকছিল না। রক্ষে তখনও এই অধম মানুষের মনের দেউলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, পারলে কী হতো কে জানে! হয়ত অলীক লাম্পট্যের সাক্ষী হয়ে থাকত বিশ-পঞ্চাশ জন।

আমার প্রশ্নটা রাখলাম ওর কাছে। প্রশ্নের উত্তর পরে জানাবে বলে ও তখন আর কিছু বলল না। শুধু কথা সমাপ্তির পর মুখ টিপে হাসল। পরের দিন প্রত্যূষেও ওর সঙ্গী হতে হলো আমাকে। তিনের মিলন যে জায়গায় সেখানে আদিত্য কত রং ছড়িয়ে দৃষ্টির মধ্যে আবির্ভূত হয় তা অবলোকন করার অদম্য বাসনা ছিলই তার উপর যখন উর্বশীর আমন্ত্রণ পেলাম তখন উষ্ণ শয্যার উত্তাপের লোভ অন্তর্হিত হলো।

আমরা যখন এসে দাঁড়ালাম বালুকাবেলায়, তখন অনেকে এসে হাজির হয়েছে সেখানে। আসার সময় অনীতার সঙ্গে কথা বিনিময় হচ্ছিল। মনে মনে গতদিনের আমার মুখ নিঃসৃত প্রশ্নটার কথা ভাবছিলাম। ভেবেছিলাম গতদিন যে কোনো মুহূর্তে প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। অথচ গতকাল থেকে এ পর্যন্ত উত্তর দেওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি না। আমি পুনর্বার প্রশ্নটা করব কিনা ঠিক

করে উঠতে পারছিলাম না। সৈকতে পদার্পণের পর আমার প্রশ্নের উত্তর পেলাম। অনীতা বলল, দাঁড়ান কালকের আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে নি। সিগমণ্ড ফ্রয়েডের নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তা আপনি জানেন বলেই আমার ধারণা। এর কারণ আপনি আপনার যে পরিচয়টা দেননি তা আমার অজ্ঞাত নয়, লেখেন তা আমি জানি। আরো বলতে হবে? কেন আপনার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম তা কি এখনো আপনার বোধগম্য হচ্ছে না?

এবার হচ্ছে।

দেখুন আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সামনে প্রসারিত করলাম। একটা বিরাট গোলাকার বৃত্ত ক্রমশই জলের মধ্য থেকে উঠে আসছে। বৃত্তের পরিধি যেভাবে কাঁপছে তাতে মনে হয় না একটু পরেই সূর্যকেই দেখব নিখুঁত বৃত্তাকার থালার মত। জন্মলগ্নে দিবাকরের যে রূপ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অন্তত আমার মত ভাষার দীনতা নিয়ে সে চেষ্টা করা নেহাতই বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। উষাকালে প্রকৃতি যখন সপ্তদশী তরুণীর মত যৌবনবতী, শিশিরের মত স্নিগ্ধ, অরণ্যের মত শান্ত, তখন হঠাৎ যদি সারমেয়র আর্তনাদ ভেসে আসে তাহলে যেরকম মনে হয় আমার দ্বারা সদ্যজাত ভাস্করের সেই রূপ বর্ণনার চেষ্টা পাঠকের কাছে অনুরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। তবু বলি, আহা কী দেখিলাম—জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না। এই রূপ দেখে নয় ঠিক কিন্তু তপন তোমাকে দেখেই এক কুমারীর বুকের গভীরে কী হয়েছিল আমি জানি না! খুব জানি; কুমারী-মাতার বুক দুরু দুরু কিন্তু সে তো অনেক পরে, তার আগে দু'চোখ ভরে দেখেনি তোমাকে!

কী ভাবছেন?

অনীতার প্রশ্ন শুনে যেন অনেক কিছু পেরিয়ে এসে বলতে পারলাম, অপূর্ব না?

হ্যাঁ অপূর্ব তবে আমার সৌভাগ্য যে এরকম দৃশ্য এর আগেও একাধিক বার দেখতে পেয়েছি।

আচ্ছা অনীতা আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন।

আমাকে আপনি চিনলেন কি করে? আসলে বলতে চাইছি আমি যে লিখি এটা জানলেন কি করে?

লেখকদের পাঠকরা খুঁজে নিতে পারে না?

পারে তবে আমাদের মত কোনো অখ্যাত লেখককে কেউ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে বলে জানা নেই। বিশেষ করে যে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে থাকে তার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ভুল ধারণা। বরং আমি বলব চার্চের পাশে যার বাসস্থান তারই চার্চে যাওয়া হয় না।

তবু…

বলছি। বিদেশে থাকাকালীনই আপনার একটা উপন্যাস হস্তগত হয় আমার। কিভাবে কার মারফৎ সেটা পেয়েছিলাম বলতে পারব না। পড়ার পর মনে হয়েছিল ভাবতবর্ষে আসলে লেখকের সাথে পরিচিত হব। ভারতবর্ষে এসে খোঁজ করি এবং পাবলিশার্সের মারফৎ জানতে পারি আপনার সম্বন্ধে।

বুঝলাম কিন্তু এত কিছুর পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

আপনিই যে সেই লেখক বুঝলাম কি করে এই তো ?

অনুমান অভ্রান্ত।

প্যাসেঞ্জার লিস্টে আপনার নাম দেখে। ভেবেছিলাম ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন কারণ ঐ রকম নাম কারো থাকে না বলে মনে হয়েছিল। পরে ঐ নামটা যখন লিস্টে দেখলাম তখন বুঝলাম ওটা আপনার ছদ্মনাম নয়।

ফিরবেন এখন ?

কেন ভয় পাচ্ছেন ?

কিসের ভয় !

এই আমাকে জড়িয়ে যদি আপনার বদনাম রটে—ভারতবর্ষে কলঙ্ক বড় তাড়াতাড়ি স্পর্শ করে।

কলঙ্ক আমি অঙ্গে মেখে যদি কিছু লোকের ঠোঁটে আশ্রয় পাই তাহলে তো সুখের কথা। ওতে আমার ভয় নেই।

ওঃ কী বচন! বচন শুনে ওদেশ হলে এক্ষুনি আপনার ঠোঁটকে আমার ঠোঁটে আশ্রয় দিতাম।

অনীতার কথা শুনে এবার সত্যি আমি ভয় পেলাম। এ মেয়েকে কতটা বিশ্বাস করব ভেবে মরছি যখন, তখন ও আবার মুখ খুলল।—আপনার পালস্‌বিট দেখার প্রয়োজন আছে ? ভয় পাবেন না বিদেশে থাকার জন্য ঐ রকম মুখের লাগাম একটু আলগা করে রাখতেই হয়। তবে ঐ পর্যন্তই, চরিত্রটা আমার নতুন বাসনের মত ঝকঝকে। একটা অনুরোধ করব ? বালির উপর একটু হাঁটার ইচ্ছে—হাঁটবেন ?

বিদেশে যদি কোন সুন্দরী এরকম ইচ্ছে প্রকাশ করে আর তা যদি কোনো অর্বাচীন প্রত্যাখ্যান করে তাহলে কী শাস্তি তার প্রাপ্য জানতে পারি ?

এই এক জায়গায় এ-দেশ ও-দেশ দুই সমান। কিচ্ছু হয় না, আপনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

প্রত্যাখ্যান করার প্রশ্নই ওঠে না পা আমি বাড়িয়েই রেখেছি, শুধু জানতে চেয়েছিলাম !

করলে কী হতো জানেন, প্রথমে অপমানে সমস্ত মুখ আরক্ত হতো তারপর আস্তানায় ফিরেই আয়নার সামনে গিয়ে দেখতাম নিজেকে।

ব্যস্‌ ?

না ব্যস্ নয়, প্রসাধন সামগ্রীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার প্রসাধনের সাজ-সরঞ্জাম আনতাম।

আমরা কথা বলতে বলতে বালির উপর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। সূর্য যতক্ষণ না গলিত সোনা ঢেলে দিল সমস্ত অঞ্চলটার উপর, ততক্ষণ পর্যন্ত পদচারণা চলতে থাকল।

বিকেলে আবার অনীতার সঙ্গে আমাকে বেরোতে হলো। গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে বললাম, করেছেন কী!

অনীতা বুঝতে না পেরে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, কী করলাম রে বাবা, কী ব্যাপার বলুন তো?

যা পোশাক পরেছেন তাতে চরিত্রটা নিষ্কলঙ্ক থাকবে তো!

আঁটো একটা পেন্টের উপর হলুদ রংয়ের নাইলনের গেঞ্জি পরেছে অনীতা। যা পরেছে তা শরীরের সাথে যে ভাবে চেপে বসে আছে তাতে দেহের বাঁক বড় বেশি স্পষ্ট।

এক মিনিট দাঁড়ান।

আমি ওর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ও আমার চোখে চোখ রেখে কী দেখল বলতে পারব না। মিনিট খানেক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বলল, না আপনাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, একেবারেই নির্ভেজাল ভদ্রলোক আপনি।

কি করে বুঝলেন?

পুরুষের চোখের দর্পণে মেয়েরা নিজেদের দেখে পুরুষদেরও দেখে। ঠিক মত দৃষ্টি রাখতে পারলে চোখের তারায় পুরুষদের মনের সবটাই দেখা যায়। বিশ্বাস করুন আপনাদের খারাপ ভাল যাই থাক তা লুকোবার জায়গার বড় অভাব। এতো গেল আপনাদের কথা, এবার আমাদেরটা শুনুন। আমাদের নিজেদের দাম বুঝে নি আপনাদের চোখের দর্পণে নিজেদের দেখে।

অনীতা আর আমি কথা বিনিময় করতে করতে এসলাম সমুদ্রের ধারে। যখন এসে পৌঁছলাম তখন আকাশ থেকে চুঁইয়ে অন্ধকার নামছে। আমি দেখেছি অন্ধকার এক এক জায়গায় এক এক ভাবে নামে। অরণ্যে অন্ধকার যেন ওত পেতে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়, হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত অঞ্চলের উপর, আর শহরে অনেকটা গজেন্দ্রগমনে আসে। পাহাড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে।

আরো কয়েক দিন পর অনীতা বলেছিল, একটা সত্যি কথা শুনবেন? আমার মনের ভেতর ঝড় উঠেছে। মনে হচ্ছে এই ঝড় আমাকে নিঃস্ব করে দেবে। কেন এমন হলো বলুন তো?

এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। চুপ করে থাকলাম।

অনীতা উত্তর আসছে না দেখে বলল, আমি জানি আপনি নিরুত্তর থাকবেন। যা বলতে চাইছি তা শুনতেই হবে আপনাকে। আপনাকে আমার ভাল লাগে আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় আমি হারিয়ে যেতে চাই আপনার মধ্যে,

কিন্তু এরকম ইচ্ছাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলা ছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই, কেন জানেন ?

এবারও আমি মুখ খুলতে পারলাম না।

অনীতা নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেয়। বলে, আমি অনেক ছেলের সাথে অনেক দিন ধরে মিশছি কিন্তু ভাল কাউকেই বাসতে পারিনি। আপনার সঙ্গে আলাপ অনেক কম দিনের এত অল্প সময়ে ভালবাসা যায় কিনা জানি না, কিন্তু আমি বেসেছি। জানি আপনি কাউকে ভালবাসতে পারেন না, আপনার ভালবাসা বিশ্বময় ছড়িয়ে রাখতে চান, একজনকে আলাদা করে কিছু দিতে পারবেন না।

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ করে হেসে উঠলাম। তারপর হাসি থামিয়ে বললাম, আসলে তা নয়। আমি ছন্নছাড়া জীব, আমাকে ভালবাসলে কষ্ট পাবেন।

ও আমার কথার প্রতিবাদ করেনি, শুধু গভীর দৃষ্টি আমার চোখের উপর রেখে দাঁড়িয়েছিল। স্মৃতির দর্পণে সে দৃষ্টি আজও মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। বিয়াসের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হচ্ছিল ওর সঙ্গে অনীতার কোথায় যেন মিল আছে।

কি ভাবছেন বলুন তো ?—প্রশ্ন করল বিয়াস।

বিয়াসের কণ্ঠস্বর শুনতেই অতীতের পাটাতন থেকে গড়িয়ে পড়লাম বর্তমানের মধ্যে। বললাম, একটা মেয়ের কথা। আপনার মত ওর সাথে পথেই আলাপ, ওর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে আপনার।

আমার কথার মধ্যে ও একটা গল্পের খুট পেয়ে নড়েচড়ে বসল। বলল, আমার সঙ্গে যখন বলছেন কোথাও একটা মিল আছে তখন না শুনে ছাড়ছি না।

ওকে অনীতার কথা বিস্তারিত ভাবে জানালাম।

শোনার পর বিয়াস বলল, আশ্চর্য মেয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে মিলটা কোথায় ?

ওর মধ্যে কৃত্রিম কিছু নেই, যা মনে আসে তা খোলাখুলি ভাবে বলে। আপনাকেও অনেকটা সেরকম মনে হচ্ছে।

ঝরণার মত হেসে উঠল বিয়াস। মনে হলো অনেকগুলো শুভ্র বিহঙ্গ পাখা মেলে দিয়ে উড়ে গেল। এমনিতেই তিলোত্তমা, তার উপর যখন হাসে তখন মনে মনে বলি, ওহে রূপবতী, এ রূপের নৈবেদ্য সাজিয়ে কার পুজো করবে! শুনলাম তো কোনো বঙ্গ-সন্তানের প্রশস্ত ললাটে বিধিলিপি—বিয়াসের জলোচ্ছ্বাস চিরতরে বন্দী হবে। প্রশস্ত ললাটের মানুষটার প্রতি ঈর্ষা হয় না ঠিকই কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে কে সেই জন।

ওর হাসির শব্দে কয়েকজন যাত্রী একসঙ্গে চোখ ফিরিয়ে আমাদের দেখল। এরপর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে বলাবলি করতে থাকল। বিয়াস আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, বেশ কয়েক জোড়া চোখ আমাদের দেখছে, হায় বঙ্গ সন্তানরা! একটা যুবতী যদি কোন যুবকের সঙ্গে কথা বলে তাহলেই সেই সন্দেহের কাঁটা বিঁধতে থাকে। অথচ দেখুন এ নিয়ে মা একটি

কারও প্রশ্ন করবে না, এমন কি আমি যদি সম্পূর্ণ দিনটা আপনার সঙ্গে কথা বলি তাহলেও।

সূর্য এখন মধ্য গগনে। সোনালী রোদ মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। রবি অকৃপণ। বিশ্বের প্রতিটি প্রাণী আজও সমস্ত অন্তর দিয়ে ভাস্করের এই নিঃস্বার্থ দান গ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, তবু কতজন অন্ধকূপের মধ্যেই বাস করছে, এরজন্য কি সূর্যকে দোষারোপ করা চলে! বিয়াসকে জানালাম সে কথা। এরপরই রসিকতা করে বললাম, আমাদের অন্ধকার দিকটা দেখাচ্ছেন?

বিশ্বাস করুন মাঝে মাঝে আমার মনেই থাকে না যে আমি অবাঙ্গালী।

দুরন্ত গতিতে মাঠ-ঘাট, নদীনালা ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে সিক্সটিওয়ান আপ। কখনো দমকা বাতাস আমাদের কিছু কথা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো ট্রেনের একটানা হুইসেলের শব্দে চাপা পড়ে যাচ্ছে অনেক কথা।

আমার বিপরীত দিকে বসে তিন-চারজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একজন উঠে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে গলার স্বর নামিয়ে বলল, একটা কথা বলব অবশ্য কিছু যদি মনে না করেন?

আগন্তুকের কথা সমাপ্তির পর বিয়াস প্রথমে আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর আমার মুখ খোলার আগেই বলল, বলুন।

দু'দিনের এ্যাট-এ-স্ট্রেচ্ ট্রেন জার্নি খুব বিরক্তিকর—যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তাসের আসর বসানো যায়।

এবার আমি বললাম, কি খেলবেন?

তিন তাস হলেই ভাল হয়, তবে আপত্তি যদি থাকে তাহলে অন্য খেলাও খেলা যেতে পারে।

তিন তাস তো জুয়া—ট্রেনের কামরায় জুয়া। আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে আঁৎকে উঠলাম।

ভদ্রলোক হাসলেন তারপর বক্তৃতার ঢঙে বললেন, মহাভারত আমাদের ধর্মগ্রন্থ আর জুয়া হচ্ছে এ গ্রন্থের মূল ব্যাপার। জুয়াটা বাদ দিলে পুরো গ্রন্থটাই বাদ হয়ে যাবে।

যুক্তি অকাট্য কিন্তু অতদূর পর্যন্ত যেতে রাজী নই। ব্রীজ যদি হয় তাহলে আমার আপত্তি নেই।—বিয়াস জানালো কথাটা।

আমি বললাম, যদি একজন হলে চলে যায় তাহলে ও খেলুক।

একজন নয়, ব্রীজ খেলতে হলে দু'জনেরই প্রয়োজন। সুতরাং আপনাদের দু'জনকেই খেলতে হবে।

ভদ্রলোক কথা সমাপ্তির পর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। সেখান থেকে তাস এবং এক সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে আসলেন আমাদের কাছে। দুপুরের অন্ন গ্রহণের কিছুক্ষণ আগে খেলা শেষ হলো। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর আবার আমরা বসে পড়লাম। বিয়াস প্রশংসা পাওয়ার মত খেলে, সেই তুলনায় আমি অনেক

অপরিণত খেলোয়াড়। ওর জন্যই এখন পর্যন্ত আমরা জিতছি। দু'বার ভুল 'কল' দিয়েও বেঁচে গেলাম বিয়াসের জন্য।

বিয়াস তাস সাফল করতে করতে বলল, আপনি আমাকে ডোবাবেন দেখছি।

যে ভদ্রলোক আমাদের কাছে তাস খেলবার জন্য এ্যাপ্রোচ করেছিলেন তিনি এবার বললেন, আমরা কিন্তু আপনাদের সাথে পরিচিত হইনি এখনো। আমার পরিচয়টাই আগে জানাই। আমার নাম পরিতোষ সান্যাল।—এরপর তার সঙ্গের ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আমার ভায়রা রঞ্জিত গুপ্ত। এবার আপনাদের পরিচিত হবার পালা।

আমি আমার পরিচয় দিলাম। তারপর বিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার পরিচয়টা আমি দেব?

দিন-না ক্ষতি কী।

ওদের জানালাম বিয়াসের পরিচয়।

পরিতোষবাবু শোনার পর বললেন, মিস কাপুর আপনার পরিচয় পেয়ে ভাল লাগছে। আপনি অবাঙ্গালী হয়েও পুরোমাত্রায় বাঙ্গালী—আমরা গর্বিত।

বিয়াস বাধা দিয়ে বলল, আমার জন্য গর্ব বোধ করছেন? আমার পার্টনারের আসল পরিচয়টা শুনলে বোঝা যেত কার জন্য গর্ববোধ করেন। নাম শুনেও যে এতক্ষণ তাকে চিনতে পারেননি কেন সেটা সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার, ইনি সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্য যদি পড়ার অভ্যেস থাকে তাহলে একে চেনা উচিত।

রঞ্জিতবাবু বললেন, ওনার কয়েকটি লেখা আমি পড়েছি, নামটা শুনেই বোঝা উচিত ছিল।

চলার পথে কতজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কত চরিত্র ভিড় করে আছে মনের আঙিনায়; মানুষের মনের অলিগলিতে নিঃশব্দে বিচরণ করেছি কখনো আবার, কখনো কোনো চরিত্র আমার মনে ঝড় তুলেছে। এক এক সময় এরকমও হয়েছে যে এক একটা মানুষের গভীরে ডুব দিয়েছি কিন্তু তাদের গভীরতা এত বেশি যে তল খুঁজে পাইনি।

কথার পিঞ্জরে বিয়াস, পরিতোষ সান্যাল, রঞ্জিত গুপ্ত, দিলারী কাপুর, সুরেখা এবং আরো অন্য চরিত্রগুলোকে বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে আমার আস্তানায়, তারপর কথার পর কথা সাজিয়ে চরিত্রগুলোতে করতে হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ব্যর্থ শিল্পীর যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে লোভী একটা মন নিয়ে চোরের মতন নিঃশব্দে ঢুকতে চাই মানুষের মনের গহনে।

বিশ্ব-নাট্যমঞ্চে অনেক চরিত্র, নাট্যকার বিধাতা, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার বাইরে কোনো গল্প নেই, কোনো সংলাপ নেই। কেউ যদি কোনো চরিত্র নিজের মতন গড়তে চায় কিম্বা দিতে চায় তার মুখে সংলাপ, তাহলেই ঘটবে বিপর্যয়। হাজার হাজার জনতা তাকে ঠেলে দেবে অন্ধ বিবরে। এটা আমার উপলব্ধি।

একটা বাচ্চা ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের মধ্যে বসে পড়ল। পরিতোষবাবুর গা ঘেঁষে বসে বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

পরিতোষবাবু অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে ফেরৎ পাঠাতে সক্ষম হলেন। এরপর নিজেই যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন এমন ভাবে কৈফিয়তের সুরে বলতে থাকলেন, আমার ছেলে বাবলু, বড় জেদী আর দুষ্টু, কিন্তু তার জন্য ওকে দায়ী করা চলে না। আগে এরকম ছিল না। ওর মা'র স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবার পর থেকে ও একটু একটু করে রুক্ষ হয়ে উঠছে। বড্ড স্টাবরুন্।

মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত বললেন কিন্তু এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন থেকে যায় সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না। বঞ্চিত কেন এ প্রশ্নের অনেকগুলো সম্ভাব্য কারণ থাকতে পারে। যেহেতু ঐ ব্যাপারে কিছু বললেন না, সেহেতু কৌতূহলের উদ্রেক হলেও প্রশ্ন করতে পারলাম না। ভদ্রলোকের সংজ্ঞায় এরকম কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করা চলে না।

এরপর খেলা আর জমল না। বিয়াস উঠে পড়ল প্রথম, বলল, লেখকদের সাথে কথা বলতে ভাল লাগে কিন্তু খেলা! নৈব নৈবচ।

আমি বেশ বিরত বোধ করলাম। বিয়াস যদি এভাবে লেখক লেখক বলে ঢাক পেটাতে থাকে তাহলে আমাকে সকলে মিলে ঠেলে দেবে অন্য জগতে। আমার এত কাঠ খড় পুড়িয়ে আসা যে জন্য সেটাই ব্যাহত হবে অনেক অংশে। মনে মনে সংকল্প করলাম যে করেই হোক ওকে থামাতে হবে।

দু'চারটে সৌজন্যমূলক কথা বিনিময়ের পর পরিতোষবাবু আর রঞ্জিতবাবু ফিরে গেলেন তাঁদের সংরক্ষিত জায়গায়। বিয়াস আগেই চলে এসেছিল। আমাকেও ফিরতে হলো স্বস্থানে। ফিরে এয়ার পিলোটা ঘাড়ের নিচে নিয়ে শুয়ে চোখের পাতা নামালাম। চোখ বন্ধ করেই বুঝলাম রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি শরীরকে গ্রাস করে ফেলেছে। চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠছে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেলের এক টুকরো রোদ জানালা ধরে ঝুলে আছে। বুঝতে অসুবিধা হলো না রোদ উৎসে ফিরে যাবার সময় হয়েছে। অভিসারিকা রাত্রি তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ। রাত্রির আগমনের সাথে সাথে নির্মল আকাশের বুকে ভেসে উঠবে লক্ষ হীরার দ্যুতি আর তারই সাথে শুরু হবে অন্ধকারকে নিঃশেষ করার জোনাকিদের ব্যর্থ চেষ্টা।

সত্যি একটু পরে অন্ধকার আকাশের গা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসল অবনীর বক্ষস্থলকে যেন কালো মসিতে সিক্ত করতে। কালো কিন্তু এই কালোর মধ্যে দেহ-দেউলের দ্বার হয় উন্মুক্ত, চলে সৃষ্টির কর্মকাণ্ড নিভৃতে, গোপনে। প্রমীলার শ্বীৎকারে দাবানলের স্পর্শ ছড়ায় পুরুষের অণুপরমাণুতে। মদন উন্মত্ততায় রতিকে করে প্রেমালিঙ্গন। এরই মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের নব জাতকের আগমনের প্রতীক্ষা। অন্য দিকে বেদুইন কন্যা দু'চোখে আশার দীপ জেবলে খোঁজে গুল্ম-তরুলতা। প্রত্যূষে বেরিয়ে পড়তে হবে বশীকরণের সামগ্রী নিয়ে। এই আঁধারে

পুত্রহারা মাতা পয়োধর উম্মোচন করে লবণাক্ত জলে চোয়াল সিক্ত করে বিলাপ করে, হে বিধি বল কার অধরে ঢালব সুধা। মনের জানালা খুলে দেখেছি আঁধারের রূপ। সে রূপ খারাপ ভালর জড়াজড়ি। সুখ আর অ-সুখের স্তবক।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিয়াস ফিরে এলো, সঙ্গে সুরেখা।

সুরেখা কাপুরের সাথে তো আপনার পরিচয় হয়নি—এক রকম জোর করেই ধরে আনলাম ওকে।

এবার আমার অবাক হবার পালা। এই মেয়েই আজ সকালে সুরেখা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল। সকালের সে কথা তুললাম।

যা বলেছি সত্যি কিন্তু আমার মনে হয় সুরেখার যেটুকু উত্তাপ আছে আপনার তাও নেই।

বিয়াস যেভাবে আমার কথার জবাব দিল তাতে না হেসে পারলাম না। আমি সরে ওদের বসার জায়গা করে দিয়ে বিয়াসকে বললাম, এ কথা বলছেন কেন?

বুঝতে পারছেন না কেন বলছি?

না, সত্যি বোধগম্য হচ্ছে না।

আপনার সঙ্গে কতক্ষণ সময় আমি অতিবাহিত করেছি মনে করতে পারবেন, না তাও পারবেন না?

অনেকক্ষণ কিন্তু ঘড়ি ধরে সময়ের হিসেব বলতে বললে এবারও আমাকে অক্ষমতা প্রকাশ করতে হবে।

এতক্ষণ সময় একজন সুন্দরী যুবতী আপনার সঙ্গে কাটাল অথচ আপনার মধ্যে দেখলাম নিরাসক্ত ভাব। ডেমিগড-এর মত আচার-আচরণ।

সুরেখা প্রায় ধমকে উঠল বিয়াসকে।—তোর এই লাগাম ছাড়া কথাবার্তার জন্য বিপদে পড়বি কোনোদিন।

সুরেখা কাপুর অসাধারণ সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। এক কথায় তিলোত্তমা সরস্বতী। এটা তো পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এরপরও আরো একটা বিশেষণ ওকে না দিলে মনে হয় অবিচার করা হবে। ও যথেষ্ট বুদ্ধিমতীও তবে একটু ইনট্রোভার্ট। এসব তথ্য কিছু কথা বিনিময়ের পর অবগত হলো এই অধমের। বিয়াস অন্য রকম। খুব দ্রুত নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা আছে ওর। আমার মনে হয় সুরেখা আর বিয়াসের মধ্যে বৈষম্য অনেক জায়গায়। আরো একটা ব্যাপার আমার মনে হয়েছে সুরেখা নিজেও চায় না তাড়াতাড়ি নিজেকে মেলে ধরতে।

॥ দুই ॥

সুরেখা যেন আদি-অন্তহীন একটা বৃত্ত। শুরু কিম্বা শেষ কোনোটাই আবিষ্কার করা যায় না। খুব ছোট করে কথা বলার অভ্যেস ওর। কিন্তু সেই কথা যেন দু'শ ওয়াটের বাল্বের নিচে এক একটা ইস্পাতের ফলা। অনেক সময় অনেককে বাকচাতুর্যে মল্লভূমিতে নামিয়ে এনেছি। তারপর ধারাল কথার

অস্ত্রে ঘায়েল করেছি। জয়ের আনন্দে মনের আকাশে উড়িয়েছি ফানুস। এতেই আমার সুখ। সুখের পায়রাটা ডানা মেলে উড়তে থাকে ফর্ ফর্ করে। কিন্তু ভুল করলাম সুরেখাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হলো।

ব্যূহ রচনা করেছি এমন ভাবে যাতে কোনো আঘাতই না লাগে আমার। মনে মনে বলেছি, সুরেখা তুমি বুদ্ধিমতী, এই ব্যূহ ভেদ করার শক্তি তোমার আছে হয়ত কিন্তু তারপর! ওকে আমি অভিমন্যু ভেবে বসে আছি। এটাই আমার প্রচণ্ড ভুল।

এখন মনে হচ্ছে কী লিখলাম, কাদের নিয়ে লিখলাম, পাঠককে কী দিলাম! একটা সুরেখাই যেন বুঝিয়ে দিল তুমিও সেই দলের, কী লিখছ? সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড! আমার মত চরিত্র কী সৃষ্টি করেছ একটাও!

না করিনি, এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। সত্যি কথা বলতে কী তোমাকে বিশ্লেষণ আমি করতে পারব না কারণ তুমি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তোমাকে জানার জন্য সমান্তরালভাবে তোমার সঙ্গে এগিয়ে গেছি, মনে আশা বাক-পিঞ্জরে আবদ্ধ করব কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছি যে সে আশা আমার কোনোদিনই সফল হবে না। সমান্তরাল রেখা তো কখনো মেলে না। দূরে শঙ্কুটা দেখা যায়। সেটা দেখে যারা ছোটে তাদের বোকা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। আমিও তো সেই দলেই নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেললাম। বোকার মত নিজেকে ছুটিয়ে পরিশ্রান্ত করেছি।

বিয়াস দীর্ঘ সময় নীরব ছিল। নীরবে আমার আর সুরেখার কথা শুনেছে। মাঝে মাঝে মুখ টিপে হেসেছে। আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি অবস্থার সুযোগ নিয়েছে। আমার দুর্দশা দেখে ও হেসেছে। ভেতরে ভেতবে তেতে উঠছিলাম। সুরেখা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কিছু বলতে পারিনি, চলে যেতেই বললাম, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জানেন তো—এক মাঘে শীত যায় না।

সে তো যায়ই না, কিন্তু এ-কথা বলার অর্থ?

বুঝতে পারছেন না?

সুরেখা খাপের মধ্যে থাকলে ভয় পাওয়ার কারণ থাকে না, দোষটা আপনার। ওকে খাপ থেকে বার করে এনে ধার পরীক্ষা করতে গেলেন ফলে কিছুটা ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো আমার এল্ডার সিস্টারকে কী রকম বুঝলেন?

আপনাকে যদি একটা বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করি কিরকম মনে হচ্ছে তাহলে কী জবাব দেবেন?

সুরেখা কী এতই ভয়ঙ্কর। না-না ওর সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করা মোটেই উচিত নয় আপনার।—বলে ঠিক আগের মতই ঠোঁট টিপে হাসতে থাকল।

বললাম, সুরেখা ভয়ঙ্কর একথা এখনি বলব না তবে আমার দম্ভের মিনারটা

ভেঙে দিয়ে গেছে। মনে মনে ভাবতাম আমার বুদ্ধির প্রাঙ্গণটা খুব অপ্রশস্ত নয়, এখন কী মনে হচ্ছে জানেন ?

কী ?

আমি একজন নির্ভেজাল নির্বোধ। আপনিও তাই ভাবছেন।

কী করে ভাবলেন আমিও তাই ভাবছি ?

যেভাবে হাসছিলেন তাতে তাই মনে হয়।

বাংলাদেশের মানুষ যাকে মাথায় করে রেখেছে তাকে নির্বোধ ভেবে নিজেকে কী প্রতিপন্ন করব বলুন তো ?

তাহলে আপনার হাসির কী অর্থ দাঁড় করাব ?

যে বিষয়ের উপর আলোচনা হচ্ছিল তাতে সুরেখাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। ঐ এক জায়গায় ও বোধহয় অপরাজেয়। আপনি যদি বুঝে প্রসঙ্গ থেকে সরে আসতেন তাহলে ভাল করতেন। সরে আসছিলেন না বলে হাসছিলাম।

বিয়াসের কথার পর আমি বলতে যাচ্ছিলাম, সুরেখাকে আমি কতটা বুঝেছি বলতে পারব না, আরো একটু সতর্ক হয়ে কথা বলে দেখব। ওর মনের দরজায় এক ঘণ্টা যাবৎ কড়া নাড়াই সার হলো। নিঃসন্দেহে বলতে পারি পর্যুদস্ত যেরকম হয়েছি সেরকম হতাশও হয়েছি। তবু বলব ভয় যেরকম আছে সেরকম ওকে জানার আকর্ষণও শতগুণ বেড়ে গেছে। এ যেন পদে পদে মৃত্যুর হাতছানি জেনেও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া। এ তো গেল সুরেখার কথা, বিয়াসকেও যে আমি বুঝেছি তা বলতে পারব না। বলতে গিয়েও কথাগুলো বলতে পারলাম না কারণ বলার আগেই বাবলু ছুটতে ছুটতে এসে আমার গা ঘেঁষে বসে বলল, গল্প-কাকু, একটা গল্প বলবে আমাকে ?

বিয়াস বলল, আপনার নামটা তো ভালই দিয়েছে বাবলু।

বললাম, সে তো আপনারই দৌলতে।

কী রকম ?

যে হারে আমার প্রচারে নেমেছেন তাতে ভয় হয় সবাই আমার নামটাই না শেষ পর্যন্ত বাদ দিয়ে লেখক লেখক বলে ডাকতে আরম্ভ করে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ, এ পরিচয়টা আর কাউকে জানাবেন না।

বাবলু একবার আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এবং একবার বিয়াসের মুখের উপর। এই ভাবে বার কয়েক বিয়াস আর আমার মুখের উপর দৃষ্টি আনার পর বিরক্ত হয়ে বলল, তোমরা এত বাজে কথা বল কেন ? গল্প বল-না।

আমি গল্প বলতে পারি এ কথা তোমাকে কে বলল ?

বাবা মাসিকে বলছিল তুমি গল্প লেখ। আচ্ছ গল্পকাকু, তুমি খুব বড় একটা আঁকশি বানাতে পারবে ?

কেন আঁকশি দিয়ে কী হবে ?

চাঁদটা পাড়বো।

তোমার প্রচার মাসি পারতে পারে।

বাবলু দু'এক মুহূর্ত আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে উঠে পড়ে, তারপর যেভাবে ছুটতে ছুটতে এসেছিল সেভাবেই চলে যায়।

বিয়াস আমার কথা শুনে হেসে ফেলে। বলে, আমার নামটা ভালই রেখেছেন। আপনি যে বেশ চটেছেন বোঝা গেল।

কী করব বলুন হাতের কাছে ঐ একটাই পাথর ছিল।

দিলেন তো ছেলেটাকে রাগিয়ে।—বিয়াস কথা বলতে বলতে উঠে পড়ল।

আপনাকেও কি রাগিয়ে দিলাম?

রাত তো কম হলো না তাছাড়া এখন বোধহয় আর থাকা উচিত নয়। আমার কথার সত্যতা যাচাই যদি করতে চান তাহলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখুন। কিছু দেখতে পাচ্ছেন?

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বই পড়ছেন।—আমি সামান্য ঘাড় ঘুরিয়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখে বললাম।

বই পড়ছেন! বইয়ের ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখছেন।

সেইজন্যই উঠে পড়লেন? ভয় পাচ্ছেন?

না। তা নয়—রাত হয়েছে।

বিয়াস চলে যেতেই আমি জানালার শার্শিটা তুলে দিলাম। দস্যি হাওয়া হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল কামরায়। আজ সম্ভবত পূর্ণিমা। সমস্ত আকাশে ছিটিয়ে আছে শ্বেত-শুভ্র মেঘ। তারই মধ্যে কখনো হারিয়ে যাচ্ছে রুপোলী চাঁদটা। এবপর যখনই আবার মেঘের আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করছে তখনই যেন মাঠে পাকা ধানেব উপর ঝরে পড়ছে রুপো। কখনো মনে হচ্ছে ধু-ধু মাঠে অশ্বত্থ কিম্বা বট গাছের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে অশরীরী আত্মা, আবার কখনো শুনতে পাচ্ছি সেই সব অশরীরী আত্মাদের কান্না। জানি না বাতাস গাছের পাতার ফাঁক ফোকবে ঢোকার জন্য যে শব্দের সৃষ্টি হচ্ছে তা অশরীরীর কান্না হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কিনা বাতাসে এবং জ্যোৎস্না ও অন্ধকার মিলেমিশে অশরীরীর আত্মার আকৃতি পাচ্ছে কি না।

হাজার হাজার ঝিঁ ঝিঁ পোকা তারস্বরে চিৎকার করে নিশাচরদের ডাকছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে দু' একটা শ্মশান, নিষ্প্রাণ দেহ কয়েকটা, কোনো রমণীর বুক-ফাটা আর্তনাদ, আবার কখনো দেখতে পাচ্ছিলাম জ্বলন্ত চিতার সামনে স্থবির দু'চারজন।

ছোট একটা স্টেশনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। জানালার শিকে গাল ঠেকিয়ে যতখানি সম্ভব ঘাড় ঘুরিয়ে স্টেশনের নামটা পড়বার চেষ্টা করলাম। পড়া গেল না। প্লাটফর্মে একটিও যাত্রী নেই, কুলিও নেই, এমনকি একটা ফেরিওয়ালাও নেই। এ স্টেশনে ট্রেন থামার কথা নয়। সম্ভবত কোনো দূরপাল্লার গাড়িই এখানে থামে না। স্টেশনের সামনে ঝোপ-জঙ্গল। অনেকখানি জঙ্গল উঠে এসেছে

প্লাটফর্মে। দিলারী কাপুর গলা চড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। জানতে চাইলেন ট্রেন থামার কারণ।

আপনি যেখানে আমিও সেখানে, কিছু বুঝতে পারছি না। নেমে দেখছি কী ব্যাপার।—বলে ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। ট্রেনের সামনের কম্পার্টমেণ্ট থেকে যাত্রীরা নেমে এক জায়গায় ভিড় করে আছে। দ্রুত পা ফেলে সেখানে যেতেই নজরে পড়ল একটা বীভৎস দৃশ্য। গলা কাটা এক মহিলার দেহ পড়ে আছে লাইনের উপর।

যখন ফিরে আসলাম কামরায় তখন অনেকেই উদগ্রীব হয়ে আছে জানার জন্য। ঘটনাটা জানিয়েই ফিরে আসলাম আমার আসনে। বিয়াসও আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসল।

মানুষ কেন নিজেকে এভাবে শেষ করে দেয় বলতে পারেন?—বিয়াসের কণ্ঠস্বর বেশ ভারী।

যখন মানুষ দুঃখের পাহাড় কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলে তখনই সে এভাবে নিজেকে শেষ করার কথা ভাবে।—আমি কথাটা শেষ করে সরে ওর বসার জায়গা করে দিলাম, সেই সঙ্গে চোখের ইশারায় বসতে অনুরোধ জানালাম।

পরাজিত হয়ে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, আপনার কী মনে হয় এটা ঠিক?—ও কথা বলতে বলতে আমার অনুরোধ রক্ষা করল।

ঠিক নয়, কিন্তু মানুষ একটা বিশেষ জায়গায় আসার পরই আত্মহত্যা করে, তখন সে কিছুই ভাবতে পারে না, পেছনে সামনে সর্বত্র অন্ধকার দেখে, তার জীবনে কখনো আলো আসবে এ বিশ্বাস আর থাকে না।

এই মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে একজনের কথা আজ ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে। সুনন্দাবৌদির কথা হয়ত কোনোদিনই ভুলতে পারব না। সুনন্দাবৌদি আজ আর বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছিল। তার আত্মহত্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আমি দায়ী। অথচ আমার কী-ই বা করার ছিল! বিবেকের সীমানা অতিক্রম করে কিছু করার মত সাহস আমার ছিল না। সুনন্দাবৌদি আজ নেই, তার অনেক কথাই আজ কালস্রোতে মুছে গেছে স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কিন্তু তার চলে যাবার আগের দিনের কথা কী ভুলতে পারছি আজও! বাঁচতে চেয়েছিল সুনন্দাবৌদি। মৃত্যুর আগের দিন আমাকে বলেছিল, একক আমি বাঁচতে চাই। তুমি পার আমাকে বাঁচাতে।

সুনন্দা বৌদির একটা যন্ত্রণা ছিল। বুকের মধ্যে একটা দুঃখের পাহাড় ছিল। হাহাকারের আগুন রাবণের চিতার মত সব সময় জ্বলত তার অন্তরে। আমি জানতাম। বুঝতাম তার ব্যথা কোথায়। বুঝত না তার স্বামী, তার থেকে অবুঝ ছিল তার শাশুড়ী। দু'জনে মিলে অত্যাচার করত বৌদির উপর। প্রথম প্রথম বাক্যবাণে জর্জরিত করত। চার-পাঁচ বছর যাবার পর অত্যাচারের ধরন পরিবর্তিত হলো। তখন আর তারা জিভের ধারাল অস্ত্রের আঘাতের উপর

সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। জিভের সঙ্গে হাতও চলতে শুরু করেছিল। সুনন্দা বৌদির অপরাধ একটাই—সে মা হতে পারেনি। আমাকে বলত বৌদি, একক তুমি বিশ্বাস কর আমি বন্ধ্যা? আমি যে বন্ধ্যা তার কী কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই!—আরো অনেক কথাই বলত কিন্তু আমি শুনতে চাইতাম না। আসলে শুনতে চাইতাম না আমার কিছু করণীয় নেই বলে। এই ঘুন ধরা সমাজে সুনন্দা বৌদিরা এইভাবে যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত হবে।

আমি এবং সুনন্দাবৌদিরা থাকতাম একই ছাদের নিচে। দোতালায় চার ঘরের একটা ফ্ল্যাট। এরই একটা ঘর আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। পাশাপাশি থাকতাম বলেই হয়ত তিনজনের পরিবারটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি। বিশেষ করে বৌদির সঙ্গে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার। এমনিতে সে ছিল প্রাণবন্ত, প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। আমি ছাড়া আর ক'জন জানত বলতে পারব না তার হাসিখুশির আড়ালে অসম্ভব শূন্যতা ছিল। আমি যখনই তাকে দেখতাম তখনই মনে হতো যেন একটা জীবন্ত লাশকে দেখছি। যতই হাসিখুশির উত্তরীয়টা গায়ে চড়িয়ে রাখুক-না কেন একটা নৈরাশ্য যে তাকে গ্রাস করতে আরম্ভ করেছে তা বুঝতে আমার অসুবিধা হতো না। ঐ নৈরাশ্যের কারণ আমার কাছে অজানা ছিল না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিলে হয়ত এই নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পেতে পারত, কিন্তু সুনন্দা বৌদির স্বামী এবং শাশুড়ী তখনো যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনটাকে এগিয়ে আনতে পারেনি। হাজার বছর আগের সেই অন্ধকার যুগেই যেন তাদের জন্ম।

সুনন্দাবৌদি আমাকে নিয়ে হাল্কা রসিকতা করত। সে রসিকতার সামান্যতম শেকড় তার মনের মধ্যে থাকত না! আসলে মূলহীন ছিল সেই সব রসিকতা। এ কথা সেও জানত আমিও জানতাম। যেমন একদিন বলেছিল, তোমার তো বিয়ে-থা করার ইচ্ছে আমি দেখিই না, কী ব্যাপার বল তো আমার প্রেমে পড়নি তো?

আমি হেসে বলেছিলাম, যদি বলি পড়েছি, তাহলে?

পরকীয়া প্রেমের প্রতি খুব যে লোভ, দাঁড়াও তোমার দাদা আসুক আজই বাড়িছাড়া করব তোমাকে।

আমি তো বলেছি যদি পড়েছি বলি তাতেই এই, সত্যি পড়লে কী হতো!

তাহলে পড়নি তাই তো?

আমি স্বীকার অস্বীকার কোনোটাই করিনি। তোমার কথা জানতে চাই।

এক এক সময় লোভ যে না হয় তা নয় কিন্তু ভরসা হয় না।

কেন?

চোখ দিয়েই তো গিলে খাচ্ছ, তার উপর যদি জানতে পার সত্যি তোমার প্রেমে পড়েছি তাহলে কী আস্ত রাখবে?

আমি কম রসিক লোক নই। সঙ্গে সঙ্গে বলি, আস্ত আছ! দাদাকে দেখে মনে

হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না, তবু পুরুষমানুষ তো, এতদিন তোমাকে আস্ত রেখেছে বলে মনে হয় না।

পেটে-পেটে এত, পাজী-বদমাইশ বেরোও বাড়ি থেকে।

একা ?

তবে কী আমাকে নিয়ে পালাবার মতলব ! দুশ্চরিত্র।

ঠিক এই ধরনের রসিকতা চলত আমাদের মধ্যে। পদ্ম পাতার উপর জল যতক্ষণ টলমল করে ততক্ষণই তার অস্তিত্ব,, জল গড়িয়ে পড়ার পর বোঝা যেমন যায় না যে সেখানে জল ছিল, সেরকম রসিকতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বোঝাই যেত না আমরা কী কী কথা বিনিময় করেছি। সব থেকে বড় কথা ঐ সব রসিকতা কোনোদিনের জন্য বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি মনকে।

মৃত্যুর আগের দিন সুনন্দাবৌদিকে অন্য রকম মনে হয়েছিল। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে। কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝেছিলাম প্রতিদিনের কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে সেই কণ্ঠস্বরের মিল নেই। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, একক, আমি বাঁচতে চাই, আমি মা হতে চাই, তুমি তো পার আমাকে বাঁচাতে।—বলতে বলতে ভেঙে পড়েছিল আমার বুকের উপর। বুঝেছিলাম কী বলতে চাইছে সুনন্দাবৌদি। আঁৎকে উঠেছিলাম। তার কথা শুনে বলেছিলাম, একি বলছ বৌদি !

অগ্নিশিখা যেভাবে হাওয়ার ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে ওঠে সে ভাবে সুনন্দা-বৌদির কণ্ঠস্বরও কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ঐ ভাবেই বললেন, পাণ্ডবদের জন্মের মধ্যেও তো এ ধরনের রহস্য আছে। শুধু পাণ্ডব কেন ? পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র এবং বিদুরের জন্মের মধ্যেও আছে একই ধরনের রহস্য। তাহলে অন্যায়টা কোথায় ? প্লীজ একক আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

সুনন্দাবৌদি আমার কাছে বাঁচতে চেয়েছিল, পারিনি তাকে বাঁচাতে। বিয়াসকে জানালাম সে কথা। শুনতে শুনতে ঠোঁট টিপে হাসছিল। আমার কথার সমাপ্তির পর বলল, তার মানে আপনাকে দেবত্বের বেদী থেকে নামিয়ে আনতে পারেননি উনি। আপনার প্রচণ্ড লোভ, দেবতা হয়ে সকলের পুজো কুড়িয়ে বেড়াবেন তাই না ?

বিয়াসের কথার উত্তরে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমি দেবতা হতে চাইনি, দেবতা হতে চাই না, আসলে আমি এক অভিশপ্ত মানুষ। পার্থিব দেহ আমার কিছু পেতে পারে না। শুধু যেন দুটো চোখ দিয়ে গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছেন স্রষ্টা। দু'চোখে আমার তৃষ্ণা। সে তৃষ্ণা মেটাতে ঘুরে বেড়িয়েছি হাটে, গঞ্জে। বিয়াস তুমি তো জান না কেন আমি খোলস-মুক্ত হতে পারি না— ভয় হয়, হারাবার ভয়। ভয় হয় অভিশাপের আগুনে না নিজেকে পুড়িয়ে ফেলি। সত্যি কথা বলতে কি আমি উটের মত। উট কাঁটা গাছ খায়, মুখ কেটে রক্ত ঝরে, তবু খায়, না খেয়ে উপায় নেই, বিধির বিধান। আমার অবস্থাও তাই। ভাল কিছু

গ্রহণ করার অধিকার নেই। এ কথা বলা চলে না তাই বলতে পারলাম না। বিয়াস তার মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েই চলে গিয়েছিল। থাকলে বলতে পারতাম, বিবেক অষ্টপ্রহর দোর আগলে বসে থাকলে আমি কী করতে পারি। আমি জানি ও যা বলেছে তারপর তার থাকা চলে না। থাকলে অনেক কথা উঠবে। সদ্য পরিচিতা কোনো মহিলার সে সব কথার সম্মুখীন না হওয়াই কাম্য। হলে বিড়ম্বনার একশেষ। যে কথা বিয়াস বলে গেল সে কথার পর যদি আমি প্রশ্ন করে বসি, আপনি যদি পুরুষ মানুষ হতেন আর আমার জায়গায় থাকতেন তাহোলে কী করতেন? এরকম প্রশ্ন শুনে যে কোনো মেয়ের মুখে রক্ত উঠে আসবে। কানে বিভাবসু আশ্রয় নেবে। তখন মনের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া বোধহয় আর কোনো উপায় থাকবে না। আর এই সব সম্ভাবনার কথা বিয়াসের মত বুদ্ধিমতীর মনে না আসার কোনো কারণ নেই। এই ভয়েই তূণ থেকে বাণটা বার করে ছুঁড়ে দিয়ে এক মুহূর্ত বিলম্ব করেনি, সঙ্গে সঙ্গেই পিঠ প্রদর্শন করেছে।

ও চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কম্পার্টমেণ্টের বাইরে চোখ ডুবিয়ে বসে থাকলাম। মনের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে আজকের এবং গতকালের কিছু ঘটনা। এক কথায় এই অবাঙ্গালী পরিবারটা আমার মনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। বৈচিত্র আছেই সেই সঙ্গে বৈষম্যও আছে। এরকম তিনটি চরিত্র যা দেখছি তাতে মনে হয় যেন একটা অসম ত্রিভুজের তিনটে কোণ দিলারী কাপুর, সুরেখা আর বিয়াস। যেন অপরিচিত তিনটি কোণ—এক্‌স্‌, ওয়াই, জেড। তাদের কৌণিক পরিমাপ করার জন্য কিছু সূত্র রেখে গেছে এক এক করে তিনজনই। এবার একক অন্ধকারের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে মগজের মধ্যে অঙ্ক কষে সমাধান করার চেষ্টা কর। আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাক।

রাত দশটার পর যাত্রীরা একে একে শুয়ে পড়ল। এরও ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট পর দিলারী কাপুরের কাছে গিয়ে বসলাম।

আমি জানতাম তুমি আসবে।—বললেন দিলারী কাপুর।

এরপর কী বলেন তারজন্য অপেক্ষা করে থাকলাম। গাড়িটা একটা জাংশনে লাইন পরিবর্তন করতে থাকল। যান্ত্রিক শব্দ উৎপন্ন করে লাইন পরিবর্তিত হলো। শুধু ঐ সময়টুকু নীরব থাকলেন দিলারী কাপুর। শব্দের জাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীরবতা যখন সম্পূর্ণভাবে নেমে আসল তখন উনি আবার মুখ খুললেন, আজকের এই আত্মহত্যার ঘটনা আমার বোনের কথা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে। এক একজনের মৃত্যুতে এক একটা সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। আমার বোনের ঐ ঘটনার পর বাবার মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিল। প্রথমে খুব অল্প ছিল কিন্তু যতদিন যাচ্ছিল ততই বাড়তে থাকল। ঐভাবে বাড়তে বাড়তে এক সময় পুরোপুরি ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। আমি ছিলাম ভাই-বোনদের মধ্যে সকলের বড়, সুতরাং সংসারটাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লাগামটা আমাকেই

ধরতে হলো। দাঁতে দাঁত চেপে সাহসের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সংগ্রাম যদি না করতে পারতাম সেদিন তাহলে হয়ত রক্ষা করতে পারতাম না সংসারটাকে। আজ ভাই-বোনেরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত। সেদিন যে ঝড় উঠেছিল সে ঝড়ের দাপটে সংসারটা ভেসে যেতে বসেছিল তার থেকে রক্ষা পেতে তিনটি প্রাণীকে বুকে আগলে কি ভাবে লড়াই করেছি তা তোমাকে কি বলব, যখনই সে কথা মনে হয় তখনই ভগবানকে বলি এরকম আর কারো না হয় যেন।

আমি সে সময় দ্বিতীয় বৎসরের ছাত্রী। সকালে সংসার দেখি তারপর কলেজ করি। বিকেল থেকে শুরু হতো টিউশনি, চলত রাত্রি পর্যন্ত। এরপর শুরু হতো সারা দিনের অগোছাল সংসারটাকে গুছিয়ে রাখার পালা। বাবা মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারাবার সাথে সাথে চাকরিটাও হারায়। সুতরাং দাঁত বার করা অভাব আমাদের তাড়া করে বেড়াতে থাকে দিবারাত্রি। আমার অবস্থা তখন তাড়া খাওয়া জন্তুর মত। শুধু ছুটছি তো ছুটছি, শ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত পাইনি। ঐ সময়েই আলাপ হয় গুরুজীর সাথে। আজ বলতে বাধা নেই গুরুজীর জন্যই আমি পেরেছি ডিভাস্টেটেড ফেমিলিটাকে বাঁচাতে। গুরুজী বলতেন, তাঁর উপর ভরসা রাখ সব ঠিক হয়ে যাবে। মানুষের জীবন সৈনিকের জীবন। জন্মলগ্ন থেকেই তাকে সংগ্রাম করতে হয়। একটা শিশুও হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে জানায় তার খিদে পেয়েছে, তবেই সে খেতে পায়। জীবন যুদ্ধে পবাজিত যারা তাদের নিয়ে কেউ ভাবে না, তারা অবাঞ্ছিত এই পৃথিবীতে। এমন কী ভগবানের করুণা পেতে গেলেও সংগ্রাম করতে হয়। সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়তে হবে কঠিন বাস্তবের সঙ্গে।—আমি যখনই ক্লান্ত বোধ করতাম তখনই ছুটে যেতাম গরুজীর কাছে। ওনার মধ্যে যে কী ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব না, তবে এমন কিছু একটা ছিল যা আমি আর কোনো লোকের মধ্যে দেখিনি। অশান্ত মন তাঁর কাছে আসলে শান্ত হয়ে যেত।

আমার বাবা একদিন কোথায় চলে গেলেন, হারিযে গেলেন জন-সমুদ্রের মধ্যে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরও তাঁকে পাওয়া গেল না। ভাই বোনেরা ততদিনে বড় হয়ে উঠেছে। ভাই একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। সংসারের বোঝাটা অনেকখানি নেমে গেল আমার ঘাড় থেকে। মনে মনে ভাবলাম বাকি জীবনটা ঈশ্বরের সেবা করে কাটিয়ে দেব। ছুটে গেলাম গুরুজীর কাছে, জানালাম মনের বাসনা। গুরুজী সব শুনে বললেন, না, এখনো তোমার সময় হয়নি। বিয়ে কর, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ কর, সংসার ধর্ম পালন কর। ঈশ্বরের সেবার জন্য দরকার ত্যাগ, অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করা মানে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। ভোগের পর আসে ত্যাগ। ভোগ ছাড়া ত্যাগ হয় না। সময় হলে আমি তোমাকে ডাকব, তখন এসো।—আমি বলেছিলাম, গুরুজী তখন আপনি কোথায় থাকবেন তা আমি জানব কি ভাবে?—উনি আমার প্রশ্ন শুনে হাসলেন, বললেন, তুমি যেখানেই থাক আমার ডাক শুনতে পাবে। আমি

এখানেই থাকব চলে এসো।—সত্যি কথা বলতে কী মনে মনে ভাবতাম গুরুজী আমাকে ডাকবেন কি ভাবে, উনি থাকেন অমৃতসরে আর আমি তখন কলকাতায়। একটা চাকরি পেয়ে চলে এসেছিলাম বাংলাদেশে। একটা লেডিস-হোস্টেলে থেকে চাকরি করি আর সেই সঙ্গে এম-এ পড়ি। যাই হোক যে কথা বলছিলাম, যখন ভাবছি গুরুজী ডাকবেন কি ভাবে, তখনই মনে হলো তাঁর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেলাম, আমাকে সন্দেহ করছ দিলারী? তোমার এখনো সময় আসেনি, আমার নির্দেশের কথা মনে আছে? সমস্ত শরীরের রোম দাঁড়িয়ে গেল। মনে হলো শিরদাঁড়া বেয়ে কী যেন নেমে গেল। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। ইতিমধ্যে আমার জীবনে আসে আনন্দ। তখন আমি আমার আগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা কো-এডুকেশন কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপিকা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি। একই কলেজে আনন্দ ইকোনমিক্সের অধ্যাপক ছিল। আমরা কখন দু'জন দু'জনার কাছে চলে এসেছিলাম তা আর মনে নেই। ও এসেছিল আমার জীবনে ঝড়ের মত আবার চলেও গিয়েছিল একই ভাবে।

এ পর্যন্ত বলে দিলারী কাপুর থামলেন। আসলে ওনার কণ্ঠস্বর থেমে গেছিল, একটা কষ্ট সম্ভবত কণ্ঠকে চেপে ধরেছিল সাময়িক ভাবে। কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ভেজা ভেজা কণ্ঠস্বরে বললেন, নিয়তি বড় নিষ্ঠুর, এই দীর্ঘ জীবনে মাত্র পাঁচটা বছর ওকে কাছে পেয়েছি। দুটি শিশুকে নিয়ে গুরুজীর কাছে গিয়ে বলেছি, আপনার আদেশ আমি পালন করেছি গুরুজী, কিন্তু কী পেলাম! মাত্র পাঁচটা বছর স্বামীকে কাছে পেয়েছি। বৈধব্যের জ্বালা সহ্য করার শক্তি নেই আমার।

গুরুজী সব শুনলেন। চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর চোখ খুললেন। ওনার দৃষ্টি তখন অনেক দূরে। যে ঘরটায় উনি ছিলেন সেখানে আলো নেই বললেই চলে। দূরে এক কোণে একটা প্রদীপ, শিখাটা হাওয়ার ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছুটা আলো এসে পড়েছে গুরুজীর চোখে-মুখে। আবার যখনই শিখাটা সরে যাচ্ছে তখনই গুরুজীর মুখটা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। আলো আর আঁধারের খেলা যেভাবে গুরুজীর মুখের উপর চলছিল তাতে তাকে অন্য রকম মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুক্ষণ পর উনি মুখ খুললেন। দিলারী, তোমার কানে যে মুক্ত দুটো আছে তা অপূর্ব কিন্তু সেই মুক্ত কোথা থেকে এসেছে, কি ভাবে তার জন্ম তা জান? মুক্ত হচ্ছে ঝিনুকের বেদনা, ঝিনুকের শরীরের মধ্যে যখন বালির কণা ঢুকে যায় এবং তার জন্য তার যে কষ্ট হয় তা থেকে জন্ম নেয় মুক্ত। এক একটা ঝিনুক সমুদ্রের কোন্ অতলে দুঃখে কুঁকড়ে কাঁদে সে খবর কেউ রাখে না। কিন্তু যখনই তার মধ্যে জন্ম নেয় মুক্ত, তখন কতজনকে সুখী করে বল ত! ধূপ নিজে জ্বলে শেষ হয়ে যায় কিন্তু সৌরভ বিলিয়ে যেতে কার্পণ্য থাকে না। ফুলের আয়ু কতটুকু, অথচ সেই ছোট্ট জীবনে সে তার হাসিকে হারিয়ে ফেলে না। তাঁর উপর বিশ্বাস রাখ সব ঠিক

হয়ে যাবে। তুমি তোমার কর্তব্য কর, তাঁকে খুঁজতে হবে না সে তোমার মধ্যে বিরাজমান। এ্যমপেডোক্লেসের সেই বাণীটা জানা আছে? গড ইস এ সারকেল হুজ সেণ্টার ইস এভরিহোয়ার এণ্ড্ ইট্স্ সারকামফারেন্স নোহোয়ার। তোমার মেয়ে দুটোকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালবাস, জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর, তাহলেই পাবে সুখ। এরপরও যদি সুখ না পাও এসো আমার কাছে আমি দেখাব সুখের রাস্তা।

সেদিন ফিরে আসার পর মনের অনেকটা অশান্তি হ্রাস পেল। বিয়াস এবং সুরেখাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লেগে পড়লাম। এরপর কি ভাবে যে জলের মত বছরগুলো গড়িয়ে গেল তা বুঝতেই পারিনি। আজ আর কোনো কষ্ট নেই। ওরা প্রতিষ্ঠিত, ওরা আমার গর্ব। ছোটকাল থেকে আমার দম্ভ ছিল আমি আর দশজনের মত নয়, স্বতন্ত্র। নিজেকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আছে, খারাপ ভালোর মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা যত সূক্ষ্মই হোক সহজেই বুঝতে পারি। আমার মেয়েরা তারও ঊর্ধ্বে। আজ আর আমার কোনো দুঃখ নেই কোনো দুর্ভাবনা নেই ওদের নিয়ে। আমি সুখের সন্ধান পেয়েছি বলে গুরুজীর ডাক আজও শুনতে পাইনি। জানি গুরুজীর ডাক শুনতে পাব না আর। এবার অমৃতসরে পৌঁছেই তাঁর সাথে দেখা করব, তুমি যাবে?

বললাম, আপনি না বললেও আপনার গুরুজীর সাথে দেখা করার ইচ্ছে জানাতাম।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

বলুন।

তুমি আমার দু'মেয়ের সঙ্গেই তো কথা বলেছ, বিয়াসের সম্বন্ধে কিছু বলব না, ওকে বোঝা অসম্ভব নয়। কিন্তু সুরেখা সম্বন্ধে তোমার কী উপলব্ধি? সত্যি কথা বলতে কী আমি মা হয়েও ওকে বুঝে উঠতে পারিনি। অনেক সময় ওকে দুর্বোধ্য মনে হয়। তুমি লেখক বলেই জানতে চাইছি।

উপলব্ধির কথা যদি বলেন তাহলে বলব ছোট্ট একটা নৌকো নিয়ে মহাসমুদ্র পার হবার দুঃসাহস আমার নেই। সুরেখা সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যায় কিন্তু সে কথা বলতে গেলে নিজেকে বড় দীন মনে হবে। ওর ফিলসফি এত ব্যাপক যে তা বোঝাতে গেলে অনেক কথার অবতারণা করতে হবে। বিজ্ঞান সব কিছু সঠিক সংখ্যা দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেয় তবু তা আমাদের কাছে অকল্পনীয়, ধোঁয়াটে, যেমন তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ অথবা এরকমই কোনো সংখ্যা তত্ত্ব যা দুর্বোধ্য ঠেকে আমাদের কাছে। এক একটা স্ফিয়ারের মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ। এর বাইরে আমরা কিছু জানি না। সুরেখার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে ওর স্ফিয়ারের কেন্দ্রবিন্দুটাই যেন আমাদের বৃত্তের থেকে বড়।

আমি প্রায়ই স্বপ্নের মধ্যে দুটো ঘোড়াকে দেখতে পাই। একটা কালো আর অন্যটার রং সাদা, দুটোই অক্লান্ত ভাবে ছুটতে থাকে। কালো ঘোড়াটা যত

ছোটে ততই বড় হয়, অথচ সাদাটা একই রকম থাকে। এই স্বপ্নের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি অনেকের কাছে, সঠিক উত্তর পাইনি। দু'একজন যা বলেছে তা অর্থহীন বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। আজ হঠাৎ মনে হওয়াতে কথা প্রসঙ্গে জানাই সুরেখাকে। ও শোনার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক উত্তরটা খুঁজে পায়। বলে, ঘোড়া দুটো কী জানেন—দুটো দিক। সাফল্য এবং ব্যর্থতা। কালো ঘোড়াটা ব্যর্থতার প্রতীক এবং সাদা সাফল্যের। শুনতে ভাল লাগবে না জানি, ভাবছেন একক গুপ্তের ব্যর্থতা কতটুকু! সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে যার খ্যাতি তার ব্যর্থতা এত বড় হয় কি করে! আপনার থেকেও যারা বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ কোনো মানুষের সাফল্য তার ব্যর্থতার থেকে বড় হতে পারে না। —মনে মনে বলি, একক গুপ্ত তুমি কতটুকু জানলে এই পৃথিবীর, কতটুকু বোঝ, কতটুকু তোমার রিয়েলাইজেসন্! একটা সুরেখাকে জানতে ব্যয় করতে হবে ক'যুগ কে জানে! তোমার অবস্থা সেই কুয়োর ব্যাঙের মত। কুয়োর বাইরে যে জন্ম থেকে বেরোয়নি সে জানবে কি করে পৃথিবীটা কত বড়!

আমার মনের দরজা পুরোপুরি হাট করে খুলে দিতে পারলাম না দিলারী কাপুরের কাছে। কত নিঃস্ব আমি এটা জানাবার মত ঔদার্য নেই আমার। তবু যেটুকু জানালাম তাঁকে তাতে কিছুটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। বুদ্ধিমতী মহিলা উনি সীতা দেখে চতুষ্পদদ্বয়ের শারীরিক শক্তি নিয়ে ভাববেন, না জমি বীজ বপনের উপযুক্ত কিনা তা নিয়ে ভাববেন, সেটা এই অধমের মস্তিষ্ককে পীড়িত করে না। আমার চোখ দিয়ে সুরেখার উত্তরণটা যদি দেখেন তাহলে আমাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করতে চাইবেন না এটা আশা করা যায়।

কী ভাবছ বলত? তুমি নিজের মধ্যে বড্ড বেশি হারিয়ে থাক, লেখক মাত্রই কী এরকম হয়?

আপনার সঙ্গে ক'জন লেখকের পরিচয় আছে?

একজনের।

আমার কথা বলছেন তো। কিন্তু আমাকে দিয়ে যদি হাঁড়ির ভাত টিপে পরখ করতে যাওয়ার কথা ভাবেন, তাহলে ভুল করবেন। আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন। একজন আমার সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করেছিল—কদলী বৃক্ষ, অবশ্য মন্তব্যটা আমার উদ্দেশ্যে হলেও সরাসরি আমাকে বলেনি, আমার এক বন্ধুর কাছে বলেছিল।

তুমি বলতে চাইছ তোমার সঙ্গে অন্যান্য লেখকদের কোনো মিল খুঁজে পাব না?

কী করে পাবেন আমি তো আগেই বলেছি আমার ব্যাপারটা অন্য রকম, পাঠককে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি, তার থেকে বড় কথা চাই-ই নি শুধু ভাল লাগে বলে লিখি। স্বার্থপরের মত নিজের কথা ভাবি, নিজের ভাল লাগার জন্য সাহিত্যের বাগানের মালাকার আমি, পরিচর্যার ফলে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে যদি রংয়ের বৈচিত্র্য আনে মালঞ্চে এবং তাতে যদি আকৃষ্ট হয় কেউ তাহলে মালাকারের

ভাগ্যে কিছু প্রশংসা জুটেই যায়, সত্যি যদি পাঠক মালাকারের মনের ভেতরটা দেখতে পেত তাহলে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হতো। ফুলের সৌন্দর্য যে নিজের লোচনকে তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে ফোটাতে চায় তার উপর কী কারো বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকা উচিত! তার সঙ্গে তো অন্য কোনো লেখকের মিল খুঁজে পাবেন না।

বুঝলাম, শুধু একটা ব্যাপার এখনো আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে তোমাকে কদলী বৃক্ষ বলল তার এরকম মন্তব্য করার কি কারণ থাকতে পারে!

কদলী বৃক্ষ একবারই ফল দেয়। আমার তখন একটা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে, সেই ভদ্রলোকের হয়ত মনে হয়েছিল ঐ একটির বেশি আর কোনো উপন্যাস রচনা আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না।

এখন সে মানুষটা মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হয়। সে যাক, এবার আমার প্রশ্নের জবাবটা দাও তো।

কোন্ প্রশ্নটার ?

এত অন্যমনস্ক হয়ে পড় কেন ? কী এত ভাব বলত ?

সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবেন ? মানুষের কথা। আপনাদেব কথা। প্রতি মুহূর্তে ভাবনার ঢেউ আছড়ে এসে পড়ে মনের তটে, কত চরিত্রই তো দেখলাম কিন্তু কী আশ্চর্য অমিল একটা চরিত্রর সঙ্গে আরেকটা চরিত্রের। এই সব চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলি, হারিয়ে থাকি তাদের মধ্যে।

একটু আগে নিজেকে স্বার্থপর প্রতিপন্ন করার যথেষ্ট প্রয়াস তোমার মধ্যে দেখেছি কিন্তু এই মুহূর্তে যা বললে তাতে স্বার্থান্বেষী বলে কিছুতেই চিহ্নিত করাতে পারবে না আমার কাছে। ইভান ভ্লাদিমিরভিচ মিচুরিণের নাম শুনেছ ?

বললাম, শোনা তো দূরের কথা উচ্চারণ করতে বললে বত্রিশটা দাঁত অটুট রাখতে পারব কিনা সন্দেহ।

মানুষটা বলত, মানুষ আমাকে কিছু দেয়নি সুতরাং মানুষের সংস্পর্শে আমি থাকতে চাই না, বড় স্বার্থপর মানুষ, আমিও স্বার্থপরের মত ব্যবহার করব তাদের সাথে। মজার ব্যাপার কী জান, তার মত নিঃস্বার্থ সেবা মানুষের জন্য ক'জন করেছে বলতে পারব না। গ্রীন রেভলিউশনের শুরু বা সবুজ বিপ্লবের সূত্রপাত বলতে গেলে মিচুরিণের কাছ থেকে। প্রকৃতির সাম্রাজ্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করেছিল মিচুরিণ। কথায় ও কাজে তারই প্রতিধ্বনি তোমার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।

জতুগৃহের মত কোনো গৃহের মধ্যে যদি আমি থাকতাম তাহলে বিদুরের মত কেউ সেই গৃহ থেকে আমাকে বার করে আনার প্রয়াস চালালেও আমি বেরিয়ে আসতে চাইতাম না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও সেই গৃহের বাইরে এক পাও বাড়াতাম না। অমন শিল্প কর্মকে দু'চোখ ভরে না দেখে পা বাড়াতাম এমন মানুষ আমি নই। কাগজ-কলম নিয়ে বসে যেতাম, লিপিবদ্ধ করতাম। মনো-মুগ্ধকর সৌন্দর্যকে নামিয়ে আনতাম কাগজের পাতায়। হয়ত আমার সাথে সমস্ত

কিছু 'কেলসাইন' হতো, হয়ত আমি এবং সেই সঙ্গে পুরো পাণ্ডুলিপিটাই ভস্মীভূত হতো। কেউ জানত না সে সংবাদ। এটা কী স্বার্থপরতা নয়! যে মানুষটা শুধু নিজের ভাললাগার কথা ভাবে সে স্বার্থপর নয়! বোধহয় এমনই রূপ-তাপস আমি!

দিলারী কাপুর আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে বলে, আবার তুমি নিজের মধ্যে হারিয়ে থাকছ। এভাবে থাকার অর্থ কী জান? তুমি চাইছ না আমি তোমার সঙ্গে বকবক করি। বিরক্ত বোধ করলে ভদ্রতা রক্ষা করার কথা না ভেবে বল আমি বিন্দুমাত্র কথা খরচ করব না এবং তুমি নিশ্চিত থাকতে পার তোমাকে অভদ্র ভাবব না।

আমি প্রতিবাদ করে উঠি, এ আপনি কী বলছেন আপনার কথার জন্য বিরক্ত বোধ করছি! বিশ্বাস করুন আপনাব প্রতিটি কথা আমার ভাল লাগছে।

দিলাবী কাপুবের সাথে কথা বিনিময় করতে করতে ভোর হয়ে গেল। উনি এখন আর আমার কাছে দিলারী কাপুর নয় - চাচিজী। যাত্রীবা সকলেই উঠে পড়েছে, সকলেই ব্যস্ত। আর মাত্র ঘণ্টাখানেক, তারপরই আমরা পৌঁছে যাব হরিদ্বাবে। দুটো রাত্রির ট্রেন জার্নির ক্লান্তি সকলের চোখে-মুখে। তা সত্ত্বেও কর্ম-ব্যস্ততার অভাব নেই। জিনিসপত্র টানা হ্যাচড়া করার ঝামেলা পোহাতে হবে না কোনো যাত্রীকেই। রিজার্ভ করা কম্পার্টমেণ্টে এই একটা সুবিধা। বগি সাণ্টিং করে সাইডিং-এ রাখা হবে। সারা দিনের পর আবার ফিরে আসব এই বগিতে। বগি রিজার্ভেশনের সুবিধাটুকু এখানেই—কখনো বাড়ি কখনো গাড়ি।

ঘণ্টাখানেক ট্রেন চলার মধ্যে সকলেই গোছগাছ করে ট্রেন স্টেশনে 'ইন' করার অপেক্ষায় বসে থাকল। ট্রেন স্টেশনে 'ইন' করতেই যাত্রীরা একে একে নেমে পড়ল।

পাহাড়-ঘেরা এই স্টেশনটায় নামতেই মনে মনে হাততালি দিলাম। দু'চোখে আমার খুশির ঝিলিক। ভাল লাগার এত উপকরণের নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি যে তা দু'চার কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে হয় কোনো অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডারের দরজা হঠাৎ খুলে দিয়ে সমস্ত জন-কোলাহলকে থামিয়ে দিয়েছে বিধাতা, যেন বনানীর মধ্যে কোন পাখির নীড়ের মতই নিস্তব্ধ। সমীরণও প্রণাম জানাচ্ছে যেন মাথা নত করে। এখনো যেন দক্ষযজ্ঞের পর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে এখানে।

চাচিজী ট্রেন থেকে নেমে আমার নাম ধরে বেশ জোরে ডেকে উঠলেন। সেই ডাক শুনে বেশ কয়েকজন আমার দিকে ঘুরে তাকাল। তাদের চোখে কৌতূহল। পরিচিত নাম কিন্তু সনাক্ত করে উঠতে পারছে না বলে সন্দেহের অবসান হচ্ছে না। এটাই সম্ভবত কৌতূহলের কারণ। আমার নামটার মধ্যে বিশেষত্ব আছে, এরকম নাম বোধহয় ভূ-ভারতে আর একটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই কারণেই বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আত্মগোপনের সুযোগ থাকে না। যাত্রীদের মধ্য থেকে এক কিশোরী দ্রুত পা ফেলে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনিই কী লেখক একক গুপ্ত?

আমি বললাম, তুমি একক গুপ্তর লেখা পড়েছ ?

হ্যাঁ, লুকিয়ে দু' একটা পড়েছি। মা দেখলে বকেন, বলেন, আরো বড় হয়ে এসব বই পড়বি।

তোমার নাম কী ?

চন্দ্রা সরকার।

চন্দ্রার সঙ্গে বেশি কথা বলার সুযোগ পেলাম না, বেশ কয়েকজন আমার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে অনেক কথা ভেসে আসতে থাকল। অনেক প্রশ্ন, সব কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তাই বললাম, আমি তো আপনাদের সহযাত্রী পরে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ হবে। চলুন শহরটাকে ঘুরে দেখি।

চন্দ্রা আমার প্রায় গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথায় সকলের মুখ বন্ধ হতেই ও বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে আসলেন এটা এই দীর্ঘ দু'দিনের ট্রেন জার্নি'র সময়ের মধ্যে জানতেই পারলাম না!

আমি চলার গতি অব্যাহত রেখে বললাম, জানলে কী করতে ?

ভাল লাগত, খুব মজা হোত। আমার জানা একজন লেখক আছে. লেখক বলতে একটু-আধটু লেখে, দু' একটা লেখা লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছে তাতেই মাটিতে পা পড়ে না। অথচ আপনি কত বড় লেখক কিন্তু কত সাধারণ, ঠিক আমাদের মতন। দেখে বোঝাই যায় না বঙ্গ জোড়া নামডাকের মানুষটাই আপনি।

খ্যাতি পাওয়া আর খ্যাতি না পাওয়ার মাঝখানে যে জায়গাটা আছে সেখানে অনেক কিছু থাকতে পারে, যেমন সুযোগ না পাওয়ার স্ফুরণের অভাব ঘটতে পারে এবং এটাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পড়ে পড়ে মার খায়। এছাড়াও অনেক সমস্যা থাকে, অনেকে সেই সব সমস্যাকে অতিক্রম করে আসতে পারে না বিভিন্ন কারণে, ফলে যথেষ্ট প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও মনের ভেতর হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

আমরা কথা বলতে বলতে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। আমাদের ট্র্যাভেলিং-এজেন্টের ম্যানেজার বিকাশবাবু জানিয়ে দিলেন টাঙা ভাড়া করে শহরটা দেখে নিতে পারি। এরপর নিজেই টাঙাওয়ালাদের সঙ্গে দর-দাম করে টাঙায় তুলে দিলেন আমাদের। আমি যে টাঙায় উঠলাম তাতে চন্দ্রা, সুরেখা, বাবলু, বাবলুর মাসি এবং রঞ্জিতবাবু উঠলেন। বিয়াসকে অন্য টাঙায় উঠতে হলো, বুঝতে পারছিলাম মনে মনে অপ্রসন্ন ও। চাচিজী ওর সঙ্গেই ছিলেন। ওখান থেকেই আমার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাকে তখন ডেকে বুঝতে পারলাম তুমি বেশ নামি লেখক। আমি তো বাংলা জানি না তাই বুঝতে পারিনি। অবশ্য বিয়াস বলেছিল, তা সত্ত্বেও অনুমান করতে পারিনি।

আমি কিছু বলতে গিয়েও বললাম না কারণ আমাদের টাঙা দুটোর দূরত্ব এত বেড়ে গেল যে এখন আমার বক্তব্য ব্যক্ত করতে গেলেই গলা সপ্তমে চড়াতে হবে।

চন্দ্রা এতক্ষণ দু'চোখ মেলে পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত দেখছিল। হঠাৎ আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, আচ্ছা এই পাহাড় আর আমাদের নিয়ে গল্প বানাতে পারবেন ?

ওর ফ্রকে সবুজ ফ্রক বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল, চুল উড়ছিল ফিতের শাসনকে উপেক্ষা করে, সেই সঙ্গে ও নিজেও শরীরটাকে দোলাচ্ছিল একটু একটু, দেখে মনে হচ্ছিল একটা প্রজাপতি ডানা মেলে দিয়ে সুখের রেণু গায়ে মাখছে।

কী হলো কিছু বললেন না তো ?—ওর কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর স্পষ্ট।

বললাম, তা হয়ত পারি কিন্তু এখন তোমার গল্প শুনব।

আমার কোনো গল্প নেই। —বলেই চন্দ্রা একটা পায়ের উরুর উপর দিয়ে অন্য পা-টা ঝুলিয়ে বসল প্রথম, তারপর ঝুলন্ত পা-টা দোলাতে শুরু করল।

প্রত্যেকের গল্প থাকে তোমার থাকবে না তা কখনো হতে পারে!

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, আমার নেই।

আমি ওর কথা শুনে হাসলাম।

চন্দ্রাই আবার কথা বলল, আচ্ছা একক গুপ্ত কি আপনার ছদ্ম নাম ?

ওটাই আমার একমাত্র নাম, একম্ অদ্বিতীয়ম্। —জানালাম ওকে। তারপরই বললাম, আচ্ছা চন্দ্রা, আমি যে সেই লেখক একক গুপ্ত তা জানলে কি করে ?

চন্দ্রা আমার কথা শুনে বেশ মজা পেল বলে মনে হলো, বলল, ও রকম অদ্ভূত নাম আর কারো নেই জানা কথা। খুব জোর বেঁচে গেছেন, আপনার ভাগ্য ভালো লিখে-টিখে নাম করতে পেরেছেন।

তা না হলে ?

আপনার নাম নিয়ে কোনো কিছু বলেনি কেউ ?

অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, বলেছে, এরকম নাম কারো হয় ?

ভাগ্যিস নামটাম করার আগে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি আপনার।

হলে ?

বলতাম, একক মানে ইউনিট, আপনি কিসের ইউনিট ?

সে প্রশ্ন তো এখনো করতে পার ?

অসম্ভব, এত বড় মানুষের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হচ্ছে এই আমার ভাগ্য, তার উপর এরকম প্রশ্ন করব এটা ভাবলেন কী করে ?

সাতটা টাঙা পিচের রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে। অশ্বক্ষুরের অনেকগুলো শব্দে পথচারীরা ঘাড় ফিরিয়ে আমাদের দেখছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন গৃহত্যাগী। তৈলহীন মস্তিষ্কের রুক্ষ চুলে অসংখ্য জট, পরনে গেরুয়া বস্ত্র এবং শরীরের খুব সামান্য অংশ আবৃত। পথচারীরা আমাদের দেখছিল বটে কিন্তু খুব একটা কৌতূহল আছে বলে মনে হলো না। আসলে পিলগ্রীমদের আসা যাওয়া প্রায় সারা বছর ধরে তাই নবাগতদের নিয়ে কৌতূহল কম, শুধুমাত্র সহজাত কৌতূহলের জন্যই দেখা।

আমার দৃষ্টি পথচারীদের উপর নিবদ্ধ ছিল। অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানের পর হঠাৎ মনে পড়ল চন্দ্রার প্রশ্নের জবাবটা দেওয়া হয়নি। মনে পড়তেই বললাম, তোমাকে একটা কথা বলব চন্দ্রা কথাটা মনে রেখ—আমি নামি কী অনামী সে কথা মনে না রেখে কথা বলবে, অন্যদের সঙ্গে যেভাবে কথা বল সেভাবে কথা বললে আমি বেশি খুশি হব।

তা কী করে হবে? আপনাকে যে আমার এককদা বলে ডাকার ইচ্ছে।—চন্দ্রা তখনো একই ভাবে পা দোলাতে দোলাতে আমার কথার উত্তর দিল।

বললাম, ঠিক আছে তাই বলো। কিন্তু এখন আমার নির্দেশ মানতে হবে, তোমার পা দোলানি বন্ধ কর তা না হলে পড়ে যাবে। এখানকার রাস্তা-ঘাট উঁচু-নিচু।

আরো একটা কথা বলতে চাই—বলব? —চন্দ্রার পা দোলানি বন্ধ হলো।

বললাম, বল।

এককদা ডাকার অধিকার তো পেলাম কিন্তু এরপর যে কথা বলব তাতে আপনি কী মনে করবেন কে জানে?

কিছু মনে করব না তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পার।

আপনাকে যদি তুমি বলি বিরক্ত হবেন—না?

কখখন নয়, বরং খুশিই হব শুধু একটা কথা জানতে চাইব এত কম সময়ের আলাপে তুমি নিশ্চয়ই সকলকে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে আনতে চাও না, আমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম কেন?

আমার যাকে ভাল লাগে তাকে আপনি বলতে ইচ্ছে করে না। তুমি কথাটা বড় কাছে টানে। তাছাড়া আপনার কাছে আসার সুযোগ তো আপনি আমাকে করে দিয়েছেন তবে আপনার একটা কথা আমি রাখতে পারিনি।

কী কথা বল ত?

অন্যদের সঙ্গে এক আসনে বসাতে পারিনি। আপনি সুযোগ দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমি কাজে লাগিয়েছি, কাছে টানতে চেয়েছি আপনাকে। —কথা বলতে বলতে চন্দ্রা দু' ঠোঁটের মাঝে হাসি ভাসাল।

আমি ওর মাথার উপর আমার দক্ষিণ হস্তটা স্থাপিত করে বললাম, তুমি খুব মিষ্টি মেয়ে।

না, আমি টমবয়, বাবা বলেন।

টমবয় মানে আমার জানা নেই।

গেছুরে মেয়ে।

মোটেও তুমি টমবয় নও খুব ভাল মেয়ে। তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লাগছে, আমাদের পরিচয়ের ক্ষণটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমি তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই, কী নেবে বল?

চন্দ্রা দু' এক মুহূর্ত ভাবল তারপর বলল, আমি যা চাইব দেবে তো?

চেয়েই দেখ-না পাও কি না।

আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবে?

তুমি যে বললে তোমার কোনো গল্প নেই!

এমনি বলেছিলাম, গল্প তো সবারই থাকে।

এবার আমি না হেসে পারলাম না, বললাম, তোমার বাবা ঠিকই বলেন, তুমি একটা টমবয়।

ঠিক আছে টমবয় তো টমবয়। তুমি আমাকে নিয়ে লিখবে কি না বল?

লিখব।

আমাদের টাঙাগুলো একটা মন্দিরের কাছে এসে পর পর দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্দিরের নাম সপ্তর্ষির আশ্রম। সুন্দর শান্ত পরিবেশ, অরণ্যের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে যেন এখানে। মন্দিরের অভ্যন্তরে কৃষ্ণচূড়া যেন ডালে-ডালে গনগনে আঁচের মত আগুন জেবলে রেখেছে। এরই পাশে পাশে কয়েকটা রাধাচূড়া গাছ, গাছের ডালে জ্যোৎস্নার বর্ণ যেন স্পর্শ করে আছে। উত্তর দিকের আকাশে কোনো মায়াবীর শুভ্র চিকুর যেন বাতাসের ঝাপটায় উড়ছে।

অপূর্ব। এরকম একটা পরিবেশের কথা কলকাতায় বসে ভাবাই যায় না—না? —সুরেখা বলল কথাটা। আমাকে উদ্দেশ্য করেই যে বলল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং কথার জবাবে আমাকেও কিছু বলতে হয়, বললাম, এত কষ্ট স্বীকার করে আসা তো এই জন্যই কলকাতায় থেকে পুরো আকাশ দেখার কথাই ভাবা যায় না। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশ অন্ধকার।

শুনেছি আপনি প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন, আমাদের বেরোনো হয়ই না—এত সমস্যা যে হুট করে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই পারি না। কলকাতার বাইরে পা বাড়ালেই মনে হয় ভাল লাগার সমস্ত উপকরণ যেন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র, ভীষণ ভাল লাগে সব কিছু।

ঠিকই আমার পায়ের নিচে সর্ষে আছে ঘরে আমি থাকতে পারি না বেশিদিন, এক ঘাটে পানসী বেঁধে রাখতে পারি না ভাসিয়ে দি অল্প সময়ের ব্যবধানের পর। এত যে ঘুরে বেড়াই তবু ভাল লাগার বাঁশিটা যেন প্রতিবারই নতুন নতুন সুরে বাজে।

একটা প্রশ্ন করতে চাই সঠিক উত্তরের প্রত্যাশা নিয়ে—করব?

আমাকে প্রশ্ন করা উচিত নয় একথা আপনাকে কী কেউ বলেছে?

না, প্রশ্ন প্রত্যেককেই করা চলে তা আমি জানি, আমার প্রশ্নটা আরো একবার মনে করার চেষ্টা করুন।

ও সঠিক উত্তরের প্রত্যাশা নিয়ে—আপনার কী ধারণা সঠিক উত্তর আমি দেব না?

দেবেন না এ কথা আমি বলিনি, হয়ত দেবেন কিন্তু আমি আমার তরফ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে নিতে চাইছি।

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েই প্রশ্নটা করতে পারেন।

শুধু ভাল লাগার জন্য ঘুরে বেড়ানো আপনার, নাকি কালির আঁচর টেনে সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্যের নির্যাস ছড়াতে চান পাঠকের মনে নিজের মসনদটা সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ?

এ প্রশ্নের উত্তর যদি আমি না দি তাহলে কতটা অভদ্র ভাববেন আমাকে ?

সুরেখা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে দু'এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল তারপর দৃষ্টি সরিয়ে বলল, অভদ্র ভাবব না কিছুটা বিস্মিত হব। এরপর থেকে একক গুপ্তর কোনো বই পড়ার ইচ্ছে থাকবে কি না তা বলা শক্ত।

এতটা বিরূপ হবেন না, আসলে একপ্রস্ত মিথ্যেবাদী বদনাম কপালে জুটেছে মাত্র কয়েকে ঘণ্টা পূর্বে ; ভয় হয় সত্যি কথা বলতে গিয়ে আবার না মিথ্যেবাদী বদনামটা শুনতে হয়।

খুলে বলুন।

বিয়াস কাপুরকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন।

বিয়াস আর সুরেখা একই গর্ভজাত হলেও দু'জনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। দু'জনের ফিলসফি এক নয়, কোন কিছুকে এক দৃষ্টিকোণ থেকে যে দেখে দু'জন তাও নয়, এত কথার পরও যদি আপনার সন্দেহের অবসান না ঘটাতে পারি তাহলে আর কিছু বলার থাকবে না আমার।

এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর না দে'য়াটা অন্যায় হবে। পাঠকের কথা ভাবি নিশ্চয়ই কিন্তু তাদের কথা ভেবে আমার ঘরের বাইরে পা রাখা নয়।

আমার কথা শুনে সুরেখা মিটমিট করে হাসতে থাকে। ওর হাসি দেখে আমার অস্বস্তি হয়, বলি, হাসছেন ?

আপনার কথা শুনে ।

আমার অস্বস্তি বাড়ে সেই সঙ্গে রাগ হয় সুরেখার উপর। বলি, সত্যি যা তাই বললাম বিশ্বাস যোগ্য না হলে আমার কিছু করার নেই।

বিশ্বাসযোগ্য নয় একথা কী আপনাকে বলেছি ?

তাহলে ?

আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। আমি আপনার কথা জানতে চেয়েছিলাম।

আমি সুরেখার প্রশ্নটা মনে করে বুঝলাম সত্যি ওর প্রশ্নের উত্তর দে'য়া হয়নি। বললাম, বিশ্বাস করুন আমি শুধুমাত্র দু'চোখের তৃষ্ণা মেটাতে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়াই। চোখের ক্যামেরায় প্রকৃতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করি। অসংখ্য চরিত্র মনের আঙিনা ভরিয়ে রাখে, এতেই আমার সুখ। যা পাচ্ছি তা নিয়ে লিখি, লিখেই আমার সুখের স্যাম্রাজ্যকে ভরিয়ে তুলতে চাই। পাঠকের কাছে সে লেখা পৌছবে এবং সেই লেখার দৌলতে তাদের মনে আমার অমরত্ব পাওয়ার লোভ নেই। সত্যি বলতে কী আমি ভাবিই না পাঠককে নিয়ে, না-না ঠিক বললাম না ভাবি তবে শুধু নিজে কতটা প্রতিষ্ঠিত তাদের মনে তা ভাবি না।

সুরেখা হাসল, বলল, ফুলের মত। নিজের তাগিদে ফোটা, পাপড়িতে পাপড়িতে রং ছড়ানো, গন্ধে বাতাসকে ভরিয়ে তোলা সবই নিজের তাগিদে। কার ভাল লাগবে কী লাগবে না তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা নেই। অথচ কারো যদি ভাল লাগে এবং কেউ যদি তার রূপ-রস-গন্ধ প্রাণ ভরে নিতে চায় তাতে তার আপত্তি নেই, এই তো ?

আমি প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু বলার সুযোগ পেলাম না, বিয়াস এসে উপস্থিত হল আমাদের মধ্যে। এসেই আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল এবার কিন্তু আপনার টাঙায় আমি উঠছি, সুরেখা মা'র সঙ্গে যাবে। কথা না বলতে পারলে আমার ভাল লাগে না।

আপনি যাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই কী কর্ণের ত্রুটি আছে ?

কান্ত্রিক গোলযোগ আছে কিনা জানি না তবে আপনার মত শ্রোতা একজনও নয়।

কান্ত্রিক কথাটার অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না।

যন্ত্র থেকে যান্ত্রিক যেমন সেরকম কর্ণ থেকে কান্ত্রিক। অভিধানে এটা খুঁজে দেখবেন না—বলে বিয়াস হেসে ফেলল।

ঠিক আছে আপনাব মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলাম বিয়াসের কথায়। আসলে আমি মনে মনে অন্য কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। এখানে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার বাধ্য-বাধকতা নেই, রুটিন বাঁধা জীবন থেকে কিছুদিনের অব্যাহতিতে আমরা সকলেই খুশি। এ ক'টা দিনে আমরা অনুভব করতে পারি বহেমিয়া জীবনের মুক্তির আনন্দ। এ যেন মুক্তির আনন্দে বিহঙ্গের ডানা মেলে দেওয়া অসীম অন্তরীক্ষে। এরকম আনন্দ তালপাতার ভেঁপুর শব্দে শিশুর অন্তরে।

ওখান থেকে আমরা ভীম-গোডাকুণ্ডে আসলাম। স্থান মাহাত্ম্যের জন্য আমার মনের সানাই বাজতে শুরু করল। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই মন্দির। বন্দী সলিলের পাহারায় গিরিরাজ। বিগ্রহ কাঁদে আঁধারে। দেউল দেখে কী তপন! এ প্রশ্নের উত্তরে সন্দেহ প্রকাশ করা ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় নেই—কে জানে দেখে কিনা! বন্দী সলিলে কখনো মুখ লুকোয় ভাস্কর আর গিরিরাজ হাসে রবির অধর স্পর্শে। মসৃণ পাথরের গায়ে রোদ অসম্ভব রকম উজ্জ্বল, ঝিক্‌মিক্‌ করতে থাকে। গলিত সোনার মত রোদ্দুর কিছুটা ক্রেস্ট থেকে গড়িয়ে নেমেছে, খুব বেশি নয় সামান্য কয়েক গজ তারপর ধূপছায়া। দু'চোখের দীপশিখা দিয়ে এই সৌন্দর্যকে আরতি করতে থাকি আমি।

ভীম-গোডাকুণ্ড থেকে আমরা অজয়ধাম হয়ে আসলাম দক্ষ-মন্দিরে।

চন্দ্রা এতক্ষণ ওর বাবা মা'র সঙ্গে ছিল। দক্ষ-মন্দিরে প্রবেশ করার পর ও আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ও আসতেই বললাম, এই যে চন্দ্রা তোমাকে খুঁজছিলাম, দক্ষরাজা কে জান ?

আমার কথার জবাব না দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল ও।

বললাম, কী হলো বললে না ?

আমি কোন্ ক্লাসে পড়ি জান ? নাইনে, নাইনের মেয়ে দক্ষের পরিচয় জানে না এটা ভাবলে কী করে ? উমার বাবা দক্ষ। দক্ষ যজ্ঞ করেছিল এইখানে। সব দেবতাদের নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকার জন্য, শুধু নিজের কন্যা উমা আর জামাতা মহাদেবকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। এরপর আরো বলব ?

চন্দ্রা ভুরুতে ঢেউ তুলে আমার দিকে তাকাল যার অর্থ এ কাহিনীটা তার ভালই জানা আছে।

দেবাদিদেব মহাদেব নেমে এসেছিল কৈলাস পর্বত থেকে হরিদ্বারের দক্ষরাজার বাসভবনে, অর্থাৎ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে। অন্যান্য দেবতারাও এসেছিল দক্ষযজ্ঞে, নিমন্ত্রিত হয়ে। প্রত্যেকের পদধূলি এখনো মিশে আছে ধুলো বালির সঙ্গে। ধর্মান্ধ মানুষ আজও বিশ্বাস করে এ কথা, তাই তারা ভূমি থেকে ধুলো নিয়ে মাথায় ছোঁয়াচ্ছে। চন্দ্রাও কিছুটা ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে প্রশ্ন করল, আচ্ছা এককদা, অনেকেই এখানকার ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছে কেন ?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললাম, তোমার প্রশ্নটা আগেই করা উচিত ছিল অন্যের অনুকরণ করাটা ভাল নয় বিশেষ করে না জেনে।

চন্দ্রা লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

দক্ষ দেউল থেকে ফিরবার সময় বিয়াস জানতে চাইল হরিদ্বারের গঙ্গা খরস্রোতা অথচ কলকাতার গঙ্গা সেই তুলনায় অনেক ধীর-স্থির এটা ভৌগোলিক কারণে। এ ছাড়া একটা পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে হরিদ্বারের গঙ্গার সাথে, যে কাহিনীতে বর্ণনা করা হয়েছে গঙ্গা রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিলেন হরিদ্বারে এসে। বিশেষ এক কারণে গঙ্গা রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণটা আমার জানা আছে কিনা জানতে চাইল বিয়াস।

বললাম, আছে, সে কাহিনী অন্য সময় বলব, তবে গঙ্গা কেন সব নদীর ক্ষেত্রেই তো একই ব্যাপার—পাহাড় থেকে যখন নেমে আসে তখন খরস্রোতা। তারপর সমতল ভূমিতে আসার পর হয় শান্ত। তখন তার আগের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেকটা মহিলাদের মত।

মহিলাদের মত কেন ?—প্রশ্ন করল বিয়াস।

বললাম, পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে আসে যখন জলপ্রবাহ তখন খরস্রোতা, দুর্বার, তার গতি অপ্রতিরোধ্য। এই জলপ্রবাহ যে পথ সামনে পায় সেই পথ ধরেই চলতে থাকে। তারপর এক সময় সমতল ভূমিতে এসে হয় শান্ত এবং অবশেষে মিলিত হয় সাগরের সাথে। মেয়েরা তো তাই, কৈশোরে সে খরস্রোতা পাহাড়ি ঝরণার মত দুর্বার। সেই সময় সে কোন্ পথ ধরে যাবে তা তার অজানা। এরপর যৌবন। সমতল ভূমিতে নদীর যে রূপ এসময় মেয়েদের চেহারা থাকে সেরকম—শান্ত, গভীরতা বেশি। এরপর সমুদ্রের সাথে নদী মিলিত হবার জন্য যেমন তার চলা

অথবা অন্যভাবে বলা যায় সমুদ্র যেভাবে নদীকে আকর্ষণ করে সেরকম মেয়েরা তার জীবনে একজন পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করে এবং পুরুষও একটি মেয়ের প্রতীক্ষায় থাকে উম্মুখ।

বিয়াস গলার স্বর নামিয়ে বলল, আপনিও প্রতীক্ষায় আছেন?

জানি না। আজও পর্যন্ত নিজেকে বুঝে উঠতে পারিনি। তবে যদি সত্যি নিজেকে বুঝতে পারি কখনো এবং যদি মনে হয় কোনো একজনকে আমার জীবনে প্রয়োজন অথবা…

বিয়াস আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে কথা বললেন একটু আগে তার ব্যতিক্রম আপনি!

না তা নয়, আসলে আমার প্রতীক্ষার বাগানে আশার বৃক্ষগুলি আজও নিষ্ফলা। সত্যি কথা বলতে কী কোনো কিছু পাবার অধিকার আমার নেই। অমৃত যার হাতে আসলে গরল হয়ে যায় তার কী কিছু চাইবার অধিকার আছে!

ইণ্টালেকচুয়ালরা একটু বেশি মাত্রায় ফ্রাসটেটেড। এটা শুনে এসেছি এতদিন যাবৎ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি, আজ করলাম। আপনি তো প্রতিষ্ঠিত লেখক না-পাওয়ার যন্ত্রণা আপনার তো থাকার কথা নয়!

আপনাকে বোঝাতে পারব না অনেক কথা আসলে· আমি নিজেও ঠিক বুঝি না সব কিছু, মনে হয় ভাগ্য সব সময় সুখ আর আমার মধ্যে একটা দেয়াল নির্মাণ করে চলেছে, যতবার কোনো কিছু পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছি ততবারই সেই দেয়ালে হাত ঠেকেছে।

বিয়াস আমার চোখে চোখ রাখল। গাম্ভীর্যের একটা শক্ত মুখোশ এঁটে বসল ওর মুখের উপর। সামান্য দু'এক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নামল আমাদের মধ্যে। বিয়াস ঐ সময়ের মধ্যে আমার চোখে চোখ রেখে কী দেখল বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ যেন একরাশ কাঁচের বাসন ভেঙ্গে পড়ল, বিয়াস যেভাবে নীরবতা ভঙ্গ করল তাতে তাই মনে হলো, বলল, আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারছি কিনা বলতে পারব না তবে যেভাবে আমি চিনেছি তা যদি ঠিক হয় তাহলে বলব আপনি বড় স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক।

সবে তো সন্ধ্যে এরই মধ্যে তিন-তিনটে বিশেষণ জুটল কপালে, এরপর দীর্ঘ-দিনের জার্ণিতে না জানি আর কত জুটবে। এ ধরনের বিশেষণের মালা নিয়ে ফিরতে হবে জানলে……

আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইতেন না তাই তো?

না, সে কথা নয় আসলে এরকম নির্মম সত্যি কথা তো শুনিনি কখনো তাই·····

অপ্রিয় সত্যি কথা বলার অভ্যেস আমাদের তিনজনেরই। সে যাক্ একটা সত্যি কথা শুনবেন? আপনার কথার প্রতিধ্বনির মত শোনাবে কিছুটা তবু শুনুন। একজন পুরুষের কাছে নারী এবং নারীর কাছে পুরুষ বাতাসের মত,

শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বাতাসের প্রয়োজন যে রকম সে রকম নারীর কাছে পুরুষ এবং পুরুষের কাছে নারীর প্রয়োজন। বাতাসের প্রয়োজনীয়তা আমি অস্বীকার করতে চাই না আবার বাতাসকেই ভয় বেশি আমার, কখন ঝড় হয়ে সব কিছু ভেঙে দেবে তার ঠিক নেই। তবু আপনার মত বাতাসের ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে চাই না।

আমি বিয়াসের কথা শুনে হাসলাম, বললাম, নারী তো প্রকৃতি, প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষ অসম্পূর্ণ এ কথা আমার অজানা নয়, আরো বড় কথা নারী শক্তির উৎস, আমি বামা বিবর্জিত হয়ে থাকতে চাই এ কথা বলতে চাইনি। বাতাসের ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে চাই না। আসলে সাত পাকের বন্ধনে বাঁধা পড়ার কথা এখনো ভাবিনি। এখনো বুঝে উঠতে পারিনি এ বিশ্ব-সংসারে আমার জন্য বিধাতা কোন গৃহকোণ বরাদ্দ করে রেখেছেন কি না।

বিয়াস আমার কথা শুনে কিছু বলতে গিয়েও বলল না শুধু দু'ঠোঁটের মাঝে হাসির একটা রেখা বিদ্যুতের মত ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। বুঝে উঠতে পারলাম না ঐ হাসির মধ্যে কোনো বক্তব্য আছে কিনা। কী ছিল ঐ হাসির মধ্যে! অবিশ্বাস, বিদ্রূপ নাকি অন্য কিছু!

চন্দ্রা এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল। আমার কথা শেষ হবার পর বিয়াস কিছু বলবে বুঝতে পেরে বলল, এককদা তোমাদের এই সব কথাগুলো পরে বলবে। বড্ড বোর ফিল করছি।

চন্দ্রা যে আমার পাশে বসে আছে তা ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্ভবত বিয়াসেরও ওর উপস্থিতির কথা মনে ছিল না। ওর কথা শুনে আমাদের দু'জনেরই কথা বন্ধ হল। চন্দ্রাই আবার মুখ খুলল, এবার আমরা কোথায় যাব?

ওর প্রশ্নে আমরা দু'জনই অস্বস্তি থেকে অব্যাহতি পেলাম। বুঝতে পারলাম চন্দ্রার মন জুড়ে এখনো হরিদ্বারের পথ-ঘাট-পাহাড়-পর্বত। বললাম, এখন আস্তানায়, সন্ধ্যায় যাব হরকীপ্যারিতে। গঙ্গার পুজো হয় ঐ সময়। অবশ্য তার পূর্বে আরো এক জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে—মনসা পাহাড়ে, জানি না আজই যাওয়া হবে কিনা। যদি হয় তাহলে রোপওয়েতে পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছবার সৌভাগ্য হবে।—আমি চন্দ্রার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় নিজের ভেতরের অস্বস্তিটা পুরোপুরি অন্তর্হিত হয়নি বুঝতে পারলাম। গলার স্বর কেঁপে উঠল একবার। নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ওর কাঁধের উপর আমার একটা হাত বাড়িয়ে দিলাম।

চন্দ্রা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমার সঙ্গে কত অল্প সময়ের আলাপ অথচ মনে হচ্ছে তোমাকে যেন অনেক দিন আগে থেকেই চিনি।

ওর বক্তব্যকে সমর্থন করে বিয়াস বলল, সত্যি তাই মানুষ বাইরে বেরোলে খুব তাড়াতাড়ি আপন হয়ে যায়।

আমি বললাম, আমরা চল্লিশজন যাত্রী একসঙ্গে বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়াব

আরো কয়েকদিন পর মনে হবে আমরা একই পরিবারের মানুষ, তখন নিজেদের অনাত্মীয় ভাবতেই কষ্ট হবে।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সীট থেকে এক বিবাহিতা মহিলা বলে উঠলেন, আপনার পরিচয় পাওয়ার পূর্বে আমি তো আপনাকে ওনাদের আত্মীয়ই ভেবে বসেছিলাম।

ওনাদের বলতে বিয়াসদের কথা বলছেন তা তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝলাম। বললাম, সেকি সোনাবৌদি, আমাকে কী পাঞ্জাবী বলে মনে হয়? নাকি বিয়াসদের বাঙালী বলে মনে হয়!

আপনাকে তো কখনই পাঞ্জাবী বলে মনে যে হতে পারে না তা আপনি ভাল করেই জানেন বরং বিয়াসদেবীদের বাঙালী ভাবা যায়। প্রথমে আমি তাই ভেবেছিলাম। চেহারায় যদিও অবাঙালীত্ব ছাপটা বর্তমান, তবু বাংলা উচ্চারণ এমন নিখুঁত যে সন্দেহ হতে পারে ওরা অবাঙালী চেহারার আড়ালে বাঙালী কি না। বিশেষ করে সুরেখাদেবীকে দেখলে অবাঙালী মনেই হয় না। যাক সে কথা। আমার একটা প্রশ্ন আছে তার আগে বলুন আমার নাম জানলেন কী করে?

একটা কোথায় আপনার প্রশ্ন তো দুটো দেখছি।

আপনারা সাহিত্যিকরা বড্ড কথার ভুল ধরেন—বেশ দুটো, এবার বলুন।

আপনার আংটিতে নাম লেখা আছে,—দ্বিতীয় প্রশ্ন?

আপনি শুধুমাত্র বেড়াতে এসেছেন নাকি গল্পের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করতে বেরিয়েছেন?

দুটো উদ্দেশ্যেই বলতে পারেন।

অর্থাৎ রথ দেখা এবং সেই সঙ্গে কলা বেচা।

ঠিক তাই।

আশা করছি আপনার আগামী উপন্যাসে আমরা অনেকেই স্থান পাব, যদি আমি ইনক্লুড হই তাহলে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বলুন।

আমার নামটা অক্ষত রাখবেন এটা আমার অনুরোধ।

মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা নেই তো?

না, প্রয়োজন হলে আমি লিখে দিতে পারি।

লিখে দিতে হবে না যদি লিখি তাহলে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে যে ভাবে আপনাকে দেখব সে ভাবেই লিখব—আপত্তি নেই ত'!

না।

এরপর আমরা বেশি কথা বিনিময় করার সুযোগ পেলাম না। সোনাবৌদির পাশে বসে থাকা একটা ছেলে বয়স সম্ভবত বাইশ-তেইশের বেশি নয়, আমার একটা উপন্যাসের একটা বিশেষ চরিত্র মনে হয় তার পছন্দ হয়নি তাই ঐ চরিত্রটা সম্বন্ধে কয়েকটা মন্তব্য করল। আসলে একরাশ অভিযোগ জানাল। অভিযোগগুলো

যে ভিত্তিহীন তা নয় বরং ছেলেটা যে ভাবে যুক্তিগুলো দাঁড় করাল তাতে মনে হল প্রতিটি বক্তব্যই যুক্তিগ্রাহ্য। বুঝলাম অভিযোগগুলো মাথা পেতে নে'য়া ছাড়া বিকল্প কোন উপায় নেই। যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নীরব শ্রোতা হয়ে ছেলেটার বক্তব্য শুনতে শুনতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম।

দুপুরের অন্ন গ্রহণের পর আমরা এক সঙ্গে অনেকে বসে গল্প শুরু করলাম। বিকাশবাবু জানিয়ে গেলেন বিকেল সাতটা পর্যন্ত আমাদের আর কোথাও যাবার পোগ্রাম নেই অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময় আমরা শুয়ে-বসে গল্প করে কাটাতে পারি। যারা আমাদের গল্পের আসরে যোগ দিল না তারা ঘুমোবার জন্য তোড়জোর শুরু করল। এর মধ্যে অবশ্য পরিতোষবাবু একবার তাস খেলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন কিন্তু আমার যা পুঁজি তা নিয়ে খেলতে ভরসা হয়নি, তাছাড়া বিয়াসের মুখ দেখে মনে হল সে আদৌ আমাকে নিয়ে খেলতে উৎসাহী নয়। অবশ্য আমি খেলতে রাজী হলেও খেলা হত না কারণ চন্দ্রা এবং সুরজিৎ দু'জনে এক সঙ্গেই ঐ প্রস্তাব শোনায় সাথে সাথে বলে উঠল, না-না খেলা-টেলা হবে না। চন্দ্রা বলল, এখন আমরা গল্প করব।

বিয়াস চন্দ্রার প্রস্তাব সমর্থন করে বলল, সেই ভাল।

সোনাবৌদি মুখে কিছু বললেন না কিন্তু মুখ দেখে মনে হোল পরিতোষবাবুর প্রস্তাব একেবারেই তার মনঃপুত নয়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হোল গল্প হবে। সোনাবৌদি বললেন, আমরা খোদ সাহিত্যিকের মুখ থেকে গল্প শুনতে চাই।

এবং স্বরচিত।—চন্দ্রা সোনাবৌদির কথার সঙ্গে কথাটা জুড়ে দিল।

গল্পটা অমুদ্রিত হোলে ভাল হয়।—এবারের কথাটা সুরজিতের।

এরপর আমাদের মধ্যের সর্বকনিষ্ঠ মানুষটাও একটা প্রস্তাব পেশ করল, বলল, ভূতের গল্প।

বাবলুর কথা সমাপ্তির পর সুরেখা বলল, যদি সম্ভব হয় আমাদের নিয়ে গল্পটা তৈরি করুন। আমি বলতে চাইছি আমাদের যেটুকু জেনেছেন সেটুকুকে সম্বল করেই কতকগুলো চরিত্র সৃষ্টি করুন যাতে লেখকের চোখ দিয়ে আমরা আমাদের দেখতে পাই।

আমি সুরেখার কথা শুনে হেসে ফেললাম।

কী হোল হাসছেন ?—প্রশ্ন করল সুরেখা।

বললাম, আপনি আমাকে বিপদে ফেলার তালে আছেন এটা বোঝা গেল।

আপনাকে বিপদে ফেলতে যাব কেন! এর আগে কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি, এত কাছাকাছি একজন লেখককে পেয়েছি বলেই আমার একটা ইচ্ছের কথা জানালাম, প্রস্তাব মেনে না নে'য়ার স্বাধীনতা আপনার অক্ষতই আছে। যারা খ্যাতির শীর্ষে উঠে যান তারা সকলের সব প্রস্তাব মেনে না নিলেও বলার কিছু নেই। বিশেষ করে সুরেখা কাপুরের মত লক্ষজনের একজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাটা কোনো ব্যাপারই নয়।

সুরেখার কথায় আমি রীতিমত তেতে উঠলাম। বললাম, আপনার তূণে এ ধরনের বাণ কতগুলো আছে জানাবেন? একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখি আমার গাত্রচর্ম খুব যে পুরু এরকম সুনাম আছে বলে মনে করবেন না, অনেক কথাই আমাকে বিদ্ধ করে।

চন্দ্রা রেগে গিয়ে বলে উঠল, এককদা তুমি কিন্তু চালাকি শুরু করেছ, গল্প না বলার ফন্দি, ভাবছ এভাবে কথা বলে সময় কাটিয়ে দেবে তা হবে না।

আমি চন্দ্রার কথার উত্তরে বললাম, না না চালাকি করার ব্যাপার নয় আসলে ভূতদের কথা ভাবছি, কোন ভূতদের নিয়ে গল্প শুরু করব, পশ্চিমের ভূতদের নিয়ে গল্প বলা কী ঠিক হবে!

বাবলু বলে উঠল, কেন ঠিক হবে না?

ওরা যে সবাইকে খেয়ে ফেলে।

তাহোলে শুনব না অন্য ভূতদের গল্প বল।—কথা বলতে বলতে বাবলু আমার কাছে সরে এসে আরো ঘন হয়ে বসল।

দক্ষিণের ভূতদের নিয়ে যে বলব সে উপায়ও নেই ওরা সবাই পাগল।

আমার কথা শুনে চন্দ্রা আরো রেগে গেল, বলল, আমাদের ঠকাচ্ছ কেন তার থেকে বল-না, বলব না।

ঠিক আছে বলছি তবে ভূতের গল্প নয় অন্য গল্প।

আমি গল্প আরম্ভ করতে যাব এমন সময় আমাদের এক সহযাত্রী হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। ওনার কাছে যেতেই বললেন, আমার নাম প্রশান্ত চ্যাটার্জী, ইন্সপেক্টর অব্ ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। আমি একটা রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আপনার সাহায্য চাই।—এ পর্যন্ত বলার পর গলার স্বর নামিয়ে যে কথা বললেন তাতে আঁৎকে উঠলাম। যা শুনলাম তা বিশ্বাস করাই শক্ত। অনেক কিছু দেখেছি, বিচিত্র অনেক ঘটনার সাক্ষী আমার দু'লোচন। কর্ণকুহরেও অনেক ঘটনা আশ্রয় পেয়েছে। কর্ণ থেকে মনের মণি-কোঠায় কত যে ঘটনা জমাট বেঁধে আছে তা ভাষায় কোনোদিনও প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। কিন্তু যা শুনলাম তা অনেক বেশি ভয়ংকর, ইতিপূর্বে এ ধরনের সত্য কাহিনী শুনেছি বলে মনে পড়ে না। যাই হোক সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি জানালাম প্রশান্ত চ্যাটার্জীকে। এই ভদ্রলোককে আমি অনেক পূর্বেই দেখেছিলাম, দেখেছিলাম সমস্ত সহযাত্রীকেই কিন্তু প্রশান্ত চ্যাটার্জীকে দেখেছিলাম একটু অন্যভাবে। হাওড়া থেকেই কেন জানি না ভদ্রলোকের উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। যাত্রার সময়ের মধ্যেও অনেকবার আমার চোখ তার আপাদমস্তক ছুঁয়ে গেছে। ট্রেনের কম্পার্টমেন্টের করিডোরের একপাশে উপরে নিচে একটি করে শয়নের জন্য যে সংরক্ষিত আসন আছে তার একটি ঐ মানুষটার জন্য বরাদ্দ ছিল। করিডোরের অন্য পাশটা দিলারী কাপুর, বিয়াস, সুরেখা, পরিতোষ সান্যাল এবং রঞ্জিত গুপ্তর স্ত্রী ও আমি দখল করে রেখেছিলাম। রঞ্জিতবাবু যে আমাদের

কাছ থেকে খুব দূরে ছিলেন তা নয়, করিডোরের ব্যবধানের পর নিচের আসনটাতে ছিলেন রঞ্জিতবাবু আর উপরের ব্যাংকে প্রশান্ত চ্যাটার্জী। হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে প্রশান্ত চ্যাটার্জী সেই যে উপরের বাংকে উঠে একটা বই খুলে শুয়ে পড়েছিলেন তারপর সমস্ত দিন এক মুহূর্তের জন্য বইয়ের উপর থেকে চোখ সরাননি। আমি বিস্মিত হয়েছি, এক নাগাড়ে এভাবে কাউকে বইয়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রাখতে দেখিনি। তখনো জানতাম না আরো বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। রাত দুটো আড়াইটের সময় ভদ্রলোক এ্যাটাচি খুলে বেশ কিছু কাগজ আর একটা বিভলবার বার করে বাংকের একপাশে রাখলেন। কিছুক্ষণ কাগজগুলোর উপর চোখ বোলালেন তারপর আবার সব তুলে রাখলেন এ্যাটাচিতে। এরপর শুয়ে পড়লেন। সেই থেকে ভদ্রলোক আমার মস্তিষ্কে আশ্রয় নিলেন, অনেক কিছু ভাবলাম মানুষটাকে নিয়ে। একটা ভয় ছায়া ফেলেছিল মনের মধ্যে, ভেবেছিলাম বিকাশবাবুকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখব কিন্তু কেন জানি না কথাটা বলব মনে করেও বলিনি। তবে সেই থেকে সজাগ থেকেছি, দু' চোখের দৃষ্টির মধ্যে মানুষটাকে রাখবার চেষ্টা করেছি যদিও জানি আমার যা পলকা শরীর তাতে কিছু যদি ঘটে তাহলে কিছুই করতে পাবব না। মসি ছেড়ে আমি কোনোদিন অসি ধরবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। বন্ধু-বান্ধবরা রসিকতা করে শরীর নিয়ে। কেউ বলে, যা শরীর তোর ঝড় উঠলে ল্যাম্প পোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়াবি। —আরো অনেক রকম মন্তব্য শুনেছি তাদের কাছ থেকে। এসব সত্ত্বেও সজাগ থেকেছি কণ্ঠস্বরের কথা ভেবে। কণ্ঠস্বরের উপর ভরসা আমার যথেষ্ট।

আজ ভদ্রলোকের পরিচয় পেয়ে মনে মনে লজ্জিত হলাম। কত কী-না ভেবেছিলাম মানুষটার সম্বন্ধে! প্রশান্তবাবুর বক্তব্য শোনার পর মনে মনে বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম। নিজের মনেই বললাম, ওহে গুপ্ত মশাই এবার পানসী ভাসাও দেখি ছোট্ট একটা মানুষের মনের সাগরে। সত্যকে খুঁজে বার করে আন।

আমি ফিরে আসলাম পূর্বের স্থানটিতে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে আমার মুখ খোলার অপেক্ষায়। শুরু করলাম আমার গল্প।

ধরে নেওয়া যাক আমরা একটা পাহাড়ি জায়গায় আটকে পড়েছি। হঠাৎ ধস নামার জন্য বেশ কিছুদিন কলকাতায় ফেরা যাবে না। আমাদের অবস্থান কালে এখানে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না। আমরা যেখানে আছি তার কিছুটা দূরে একটা খাদ। সেই খাদের ধারে আমাদেরই একজন বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিল। কাকে দিয়ে শুরু করব ?—প্রশ্নটা রাখলাম সবার কাছে।

আপনার যাকে ইচ্ছে তাকে দিয়েই শুরু করুন, গল্পের মাঝখানে প্রশ্ন করবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তরটা আসল বিন্নাসের কাছ থেকে।

বেশ তাহলে পরিতোষবাবুকে দিয়েই শুরু করছি। পরিতোষবাবু খাদের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন এমন সময় ভুঁই ফুঁড়ে যেন একজন উঠে এসে দাঁড়ল তার সামনে। ওকে দেখে পরিতোষবাবু এমন চমকে উঠলেন যে ঠোঁটের জ্বলন্ত

সিগারেটটা খসে পড়ল খাদের মধ্যে। আর একটু হলে উনি নিজেই পড়ে যাচ্ছিলেন।

ভয় পাবেন না আমার নাম পরিতোষ সান্ন্যাল।—ভুঁইফোড় মানুষটার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো কথাটা।

পরিতোষবাবু বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।—সেকি! আমার নামও পরিতোষ সান্ন্যাল!—ভয় আর বিস্ময়ের সংমিশ্রণে গলাটা প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল কথাটা বলার সময়। একই নাম এবং একই সারনেমের অধিকারী আরেকজন তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এটা বিশ্বাস করাই যেন শক্ত। শুধু তাই নয় তিনি অনুভব করলেন একরাশ হীমেল হাওয়া কোথা থেকে যেন ছুটে এসে তার হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। দ্বিতীয় পরিতোষ সান্ন্যাল বলে উঠল, বাড়ি যান এখানে থাকা নিরাপদ নয়।—পরিতোষবাবুর মনে হলো বহুদূর থেকে যেন কথাটা ভেসে এলো। এরপর দ্রুত পা চালিয়ে চলে আসলেন হোটেলে।

ওনাকে এভাবে আসতে দেখে আমি প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার পরিতোষবাবু এভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছেন কেন?

উনি সবিস্তারে জানালেন সমস্ত ঘটনা।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমি যাব ঠিক করলাম। পরিতোষবাবু বারণ করলেন, বললেন, খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। একই নামের আরেকজন থাকতে পারে না তা নয়। কিন্তু কেন জানি মনে হলো ও আমাদের মত রক্ত মাংসের মানুষ নয়। তাছাড়া ঐ কণ্ঠস্বর একেবারেই অস্বাভাবিক। বলতে পারেন মাত্র দু'হাত দূরের একটা লোকেব কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে ভেসে আসল বলে মনে হলো কেন?

আমি হেসে জবাব দিলাম, ভয় পাবেন না মশাই ভূতই হোক আর মানুষই হোক আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কেন? —অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন উনি।

বললাম, অনেকদিন পূর্বে এক জ্যোতিষ আমার হাত দেখে বলেছিল গুরুবল অত্যন্ত প্রবল তাছাড়া গার্ডলাইন খুবই প্রশস্ত, কেউ চেষ্টা করেও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমার।

জ্যোতিষশাস্ত্র আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি সরাসরি পরিতোষবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাসলাম। ঐ হাসির মধ্য দিয়ে আমার উত্তরটা দে'য়ার চেষ্টা করলাম। আসলে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর আমার যে খুব একটা আস্থা আছে এমন নয় কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে স্বীকার করতে পারব না বলে ঐভাবে হাসা ছাড়া উপায় ছিল না।

সে না হয় মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু বিদেহীর ক্ষেত্রে ত' তা প্রযোজ্য নয় তাছাড়া শুধুমাত্র জ্যোতিষের কথার উপর ভিত্তি করে কী এত বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে!—আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে পরিতোষবাবু পুনর্বার মুখ খুললেন।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস আমার নেই। কাইন্ডলি আমাকে বাধা দেবেন না, কথার পাহাড় ঠেলে সরাবার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু একটা কথা বলতে পারি আমাকে যেতেই হবে, আই মাস্ট হ্যাভ টু গো দেয়ার।

এবার পরিতোষবাবু নয় অন্যান্যরা একই সঙ্গে অনুরোধ জানাল না যাবার জন্য কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজী হলাম না। একমাত্র বিয়াস বলল, ভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের—আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

বললাম, বেশ ত' চলুন-না।

ঠিক হোল পরের দিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়ব। এরপর যেন ঘড়ির কাঁটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইলাম। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা ধরে কৌতূহল আমার মনের মধ্যে নেচে বেড়াল। পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে আমি আর বিয়াস বেরিয়ে পড়লাম। আমরা নির্দিষ্ট স্থানটাতে পৌঁছবার একটু পরেই পাহাড় চুঁইয়ে অন্ধকার নামতে শুরু করল। আগন্তুকের অপেক্ষায় ঐ খাদের ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের নিরাশ হোতে হোল। যার প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম তার ত' দেখা পেলাম নাই বরং উল্টে ঠাণ্ডা কণ্ঠনালী চেপে ধরল। বাধ্য হয়ে একসময় আমাদের ফিরে আসতে হোল। আমাদের ফেরার অপেক্ষায় সকলেই উদগ্রীব হয়ে ছিল। বিয়াস কোনো কথা না বলে শুধু মুখভঙ্গী করেই যেন ওদের কৌতূহলের বেলুনে পিন ফুটিয়ে দিল।

এককদা তোমরা কাউকেই দেখতে পেলে না !—চন্দ্রা প্রশ্ন করল, ওর কথা শুনে মনে হোল অনেক উপর থেকে যেন আশা পতনের সময় কিছু একটা আঁকড়ে ধরার প্রয়াস।

আমাকে বলতেই হোল, না নিষ্প্রাণ পাহাড় আর গভীর একটা খাদ ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনি।

আমার উত্তর যে চন্দ্রার আশার ক্ষীণ আলোটুকুও নিভিয়ে দিল তা বেশ বুঝতে পারলাম।

সুরজিৎ বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনারা দু'জন একসঙ্গে না গিয়ে একা যদি যেতেন তাহোলে হয়ত নিরাশ হোতে হোত না।

সুরজিতের কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়াতে পরের দিন আমি একা গেলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসলাম আস্তানায়। আমি যখন ফিরলাম তখন আমার জামার অনেকখানি অংশ ভেজা। ঠাণ্ডার দাপট তখন কম নয় অথচ ঐ ঠাণ্ডায় আমি ভিজে গিয়েছি দেখে সবাই অনুমান করতে পারছিল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে পারছিল না কেউ যেন প্রশ্ন করার সাহসটা হারিয়ে ফেলেছে, শুধু কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে রাখল আমার মুখের উপর।

অবিশ্বাস্য, এরকম অভিজ্ঞতা যেন কাউকে সঞ্চয় না করতে হয়।—কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম আমি।

কী হয়েছে ?—বিয়াস প্রথম প্রশ্ন করল।

বিন্নাস প্রশ্ন করার পূর্বমুহূর্তে পর্যন্ত যেন সকলেই সাহসের খুঁটটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওর প্রশ্নের পরই এক এক করে অনেক প্রশ্নের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ল।

বললাম, আমি পৌঁছনর পর সত্যি একটা লোক যেন ভুঁই ফুঁড়ে বেরিয়ে আসল। তাকে দেখেই আঁৎকে উঠলাম, সেই সঙ্গে মুখ থেকে কম্পিত একটা শব্দ শুধু নির্গত হোল—কে ?

আমি একক গুপ্ত।

একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠ থেকে আমার নামটাই উচ্চারিত হোল। কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে বললাম, তা কী করে হয় আমার নাম একক গুপ্ত। সুতরাং ঐ নাম আপনার কিছুতেই হতে পারে না।

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথে একটা ভয়ঙ্কর অট্টহাসিতে ভরে উঠল সেই এলাকা। এরপর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হারিয়ে ফেললাম, একরকম প্রায় ছুটে চলে এলাম এখানে।

সুরজিৎ বলল, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না আমি নিজের চোখে দেখতে চাই, দেখতে হবে ব্যাপারটা কী। আমার মনে হয় কেউ একজন আমাদের প্রত্যেককে চেনে সে, হয়ত ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

আমি বললাম, তর্ক করে কারো মধ্যে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তুমি ঘুরে এসো তারপর দেখব তোমার ধারণা কতটা দৃঢ়।

না, তোমার যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, বিদেশে এসে ওসব ভুতুড়ে ব্যাপারের সঙ্গে তোমাকে জড়াতে হবে না।—সোনা বৌদি ভাইকে ঐ ব্যাপারে নিরুৎসাহী হওয়ার জন্য ধমকের সুরে বললেন।

তুই যাই বলিস দিদি ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে।—সুরজিৎ এক নাগাড়ে বার দুয়েক শেষ তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল।

অনেক বুঝিয়ে এবং অনুরোধ করেও সোনা বৌদি সুরজিৎকে থামাতে পারলেন না। শেষে উপায় না দেখে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এককবাবু ওর যদি কিছু একটা হয়ে যায়—আপনি একবার বারণ করুন-না।

বললাম, ভয় পাবেন না সোনা বৌদি ওর কিছু হবে না।

এত জোর দিয়ে বলছেন কী করে ?

আমার মনে হচ্ছে ওটা ভুতুড়ে ব্যাপার নয় একটা রহস্য কোথাও লুকিয়ে আছে, সেটা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।

সুরজিৎ বলল, আমি ত' সে কথাই বলেছিলাম কিন্তু তখন আপনি আমার কথার প্রতিবাদ করলেন কেন ?

তুমি তা বলনি, তুমি যা বলেছ তা ঠিক নয় বলে আমার ধারণা, অকারণে কেউ আমাদের ভয় দেখাতে যাবে কেন। ভয় দেখিয়ে কী লাভ তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না তাছাড়া আমরা এখানে এসেছি মাত্র দু'দিন পূর্বে এরমধ্যে আমাদের নাম-ধাম জানা কী করে সম্ভব বল।

বলব তবে এখন নয় আগে ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখি তারপর।

এরপর তর্কের ঝড় উঠল এবং শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে সোনা বৌদি মত দিলেন। যেহেতু সুরজিতকে তার সংকল্প থেকে সরিয়ে আনার বিন্দুমাত্র চেষ্টা ত' করিইনি বরং উৎসাহিত করেছি সেহেতু অনেকখানি দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাল অর্থাৎ কোনো অঘটন ঘটলে তার জন্য সম্পূর্ণ দোষের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপবে। পরে বিয়াস জানাল কাজটা ঠিক হয়নি, এতটা দায়িত্ব নেওয়া মোটেও উচিত হয়নি। চাচিজী সব শোনার পর প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করলেন, বিয়াস ঠিকই বলেছে তোমার এতটা ঝুঁকি নে'য়া ঠিক হয়নি।

সুরেখা দু'জনকেই আশ্বস্ত করল, ভয়ের কিছু নেই এ নিয়ে তোমরা ভেব না।

কী করে বুঝলি ভয়ের কিছু নেই?—চাচিজী দৃষ্টিটা সরিয়ে আনলেন সুরেখার মুখের উপর।

থাকলে এককবাবু এত নিশ্চিন্ত হয়ে সুরজিতের যাবার জন্য সম্মতি জানাতে পারতেন না। আমার ধারণা ওনার বিশ্বাসের দুর্গটা সুরক্ষিত না হোলে কখনই উনি কোনো কথা বলেন না।

আমি সুরেখার কথার উত্তরে যেটা বলব ভাবলাম সেটা বলার সুযোগ পেলাম না, চাচিজী ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না-না একক কাজটা তুমি ঠিক করনি, বিদেশ-বিভুঁইয়ে যদি কিছু একটা হয়ে যায় ছেলেটার!

আমি চাচিজীর কথার কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না বলে মুখ খুলতে পারলাম না। চাচিজীও যে এরপর ঐ প্রসঙ্গে খুব বেশি কিছু বললেন তা নয় দু'চার কথার পর অন্য প্রসঙ্গে চলে আসলেন।

পরের দিন সুরজিৎ ওখান থেকে ঘুরে এসে জানল একই ঘটনা অর্থাৎ সেদিনও একজন অদ্ভুত আকৃতির লোকের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সে নিজেকে সুরজিৎ রায় বলে পরিচয় দেয়। সুরজিৎ আরো একটা ঘটনা জানতে পারে, একজন বিবাহিতা মহিলাকে বছরখানেক আগে ধাক্কা দিয়ে ঐ খাদের মধ্যে ফেলে দে'য়া হয়। আজও তার কঙ্কালটা ঐ খাদের মধ্যে পড়ে আছে এবং সেটা ও দেখেছে। দ্বিতীয় সুরজিৎ দেখিয়েছে, সেই সঙ্গে বলেছে, তোমাদের মধ্যেই একজন ওকে খুন করেছে। আমি জানি কে খুন করেছে, নিজের চোখে দেখেছি। সে ভাবছে কোনো সাক্ষী নেই সুতরাং সম্পূর্ণ নিরাপদ কিন্তু সে জানে না কী ভাবে একটা অদৃশ্য হাত শাস্তি দিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে আসামীর কাঠগড়ায়।

গল্পটা ঐ পর্যন্ত বলে প্রত্যেকের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম, বুঝলাম প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে অধীর আগ্রহে প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে পরবর্তী অংশের জন্য। সকলকে নিরাশ করে আমাকে উঠে পড়তে হলো। পরবর্তী ঘটনা এখন জানানো সম্ভব নয়। (পাঠকের উদ্দেশ্যে) এ গল্পের শেষটা এখনই বলতে গেলে রহস্যের স্বাদ ব্যাহত হবে।

কী হোল এককদা উঠে পড়লে কেন?—আমাকে উঠে পড়তে দেখে চন্দ্রা প্রশ্ন করল।

বললাম, এ গল্পের শেষ পরিণতি কী হবে তা আমার জানা নেই। আজকের দিনটা ভাববার সময় দাও।

॥ চার ॥

উত্তরে রোদের আয়ু অনেক দীর্ঘ। আমরা যখন বেরোলাম তখন ছ'টা বেজে গেছে। এখনো রোদ ঝলমল করছে। রাস্তায় অনেক লোকের ভিড়। বেশির ভাগই ট্যুরিস্ট। আমরা সকলেই একই উদ্দেশ্যে চলেছি গঙ্গার ঘাটে। শুধু পরিতোষবাবু এবং বাবলু আসেনি। বিকেল থেকেই পরিতোষবাবুর শরীর খারাপ।

আমরা যখন হর-কী-প্যোরিতে পৌঁছলাম তখন অনেক লোকের সমাগম সেখানে। গঙ্গার উপর প্রশস্ত সেতু, সেই সেতু অতিক্রম করে আমরা এসে বসলাম বাঁধানো এক চত্বরে। গঙ্গার ঠিক বুকের উপর এই চত্বর। ক্ষুদ্র একটা দ্বীপের মত এই জায়গাটায় অসংখ্য মানুষের অধীর প্রতীক্ষা, কখন গঙ্গারতি শুরু হয় তাবজন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সকলেই। অনেকে পুজো দেবে বলে পুজোর নৈবেদ্য সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। যারা জায়গা পায়নি তারা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে আছে।

গঙ্গা এখানে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে। অবাধ্য শিশুর মত যেন দাপিয়ে চলেছে, শৈশবের অস্থিরতা নিয়ে যেন অপেক্ষা করে আছে যা কিছু পাবে তা দুমরে-মুচরে ভেঙে ফেলবে। বিরামহীন জলপ্রবাহ হীম-শীতল। যেখানে আমরা বসে আছি সেখান থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে। জলে পা ডুবিয়ে সিঁড়ির উপর বসে আছি আমরা অনেকেই। আমার পাশে চাচিজী। যতক্ষণ না রোদ আর ছায়ার খেলা শেষ হয় ততক্ষণ আমি চাচিজীব সাথে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলে যাচ্ছিলাম। অন্ধকার যখন স্বচ্ছ একটা কালো আবরণের মত সমস্ত অঞ্চলটাব উপর ছড়িয়ে পড়ল তখন গঙ্গার যেন আরেক রূপ দেখতে পেলাম। তখন গঙ্গাকে কিছুতেই মনে হলো না শুধু নদী মাত্র, মনে হলো দেবী গঙ্গা যেন নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে।

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে উঠল এক এক করে। ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসলেন পুরোহিত। হাতে বিশাল পঞ্চপ্রদীপ। শঙ্খ-ধ্বনি তারই সাথে কাঁসর ঘণ্টা বাজতেই পুরোহিত গঙ্গাকে আরতি করতে শুরু করলেন।

অসংখ্য প্রদীপের অস্থির প্রতিফলন গঙ্গার জলে আর তারই বুকে ভেসে চলেছে পুষ্প-বিল্বপত্র আর ছোট ছোট প্রদীপে বিভাবসুর দীপশিখা। মনে হয় দেবী গঙ্গা আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হোলেন।

অবিস্মরণীয়! এ দৃশ্য ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি—অপূর্ব না? —চাচিজী প্রশ্নটা নিজেকে না আমাকে করলেন তা বুঝে উঠতে পারলাম না প্রথমে। পরে মনে হলো আমাকেই করেছেন, কারণ উনি আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা আমার দিকে ফেরালেন। বুঝতে পেরেই বললাম, এরকম দৃশ্য ভারতবর্ষের আর কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না।

এ সময় হঠাৎ এক বৃদ্ধ আমার প্রায় ঘাড় টপকে জলে নেমে সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। তার ভারী কণ্ঠস্বর সামনের পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ভরিয়ে তুলল সমস্ত চত্বর।

রঞ্জিতবাবুর স্ত্রী আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনারা এখানে! প্রায় দশ-পনের মিনিট ধরে আপনাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি; পরিতোষদার শরীর খারাপ দেখে এসেছি—আমি কর্তাকে নিয়ে হোটেলে ফিরছি। কথাটা জানিয়ে না গেলে তো আপনারা হয়ত খুঁজে বেড়াবেন আমাদের তাই জানিয়ে গেলাম।—কথাটা শেষ করে আর দাঁড়ালেন না হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন ব্রিজের উপরে উঠে যাবার উদ্দেশ্যে। রঞ্জিতবাবু ব্রিজের উপর থেকে নামেননি ঐখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন অর্ধাঙ্গীর ফিরে আসার জন্য। রঞ্জিতবাবুর স্ত্রী সিঁড়ি অতিক্রম করে ব্রিজের উপর উঠে আসতেই রঞ্জিতবাবু এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ভিড় ঠেলে হাঁটতে শুরু করলেন। ওরা সেতুর উপর দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন আর আমি ওদের উপর দৃষ্টি চাড়িয়ে রেখে একটা আশু নাটকের দৃশ্য যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। এই সময় চাচিজী কথা বলে উঠলেন ফলে আমাকে তার দিকে চোখ ফেরাতে হোল।

একক তুমি আমাদের নিয়ে একটা গল্প তৈরি করেছ শুনলাম। গল্পটা বিয়াসের মুখ থেকে শুনেছি। এর শেষ কীভাবে করবে?

সুরেখা আমাদের থেকে খুব দূরে ছিল না চাচিজীর পাশে বসে থাকা আমাদেরই দু'জন সহযাত্রী ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিল। চাচিজীর কথা কানে যেতেই উঠে এসে আমার পাশে বসে বলল, সত্যি আমিও ভেবেছি অনেকবার কিন্তু কীভাবে যে এর শেষ হোতে পারে ভেবে পাইনি। গল্প আরম্ভ করার পূর্বে যদি এটা ভূতের গল্প নয় একথা না জানাতেন তাহোলে বোঝা যেত। কিন্তু যে ভাবে শুরু করেছেন গল্পটা তাতে এর পরিণতি কী হোতে পারে তা কিছুতেই ভেবে বার করতে পারছি না।

বললাম, গল্প যখন শুরু করেছি তখন শেষ করব নিশ্চয়ই কিন্তু এ মুহূর্তে বলতে বললে অসুবিধায় পড়ব কারণ শেষ পরিণতিটা এখনো আমার জানা নেই,. শেষ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছি আমিও।

অপেক্ষা করছেন মানে! আপনার কথার হেঁয়ালী আমার কাছে দুর্বোধ্য।

একটা দিন আপনার কৌতূহলটা আমার অনুরোধে মনের কোঠায় আবদ্ধ করে রাখুন। আমার মনে হয় আগামীকাল গল্পটার শেষটা আপনাদের জানাতে পারব।

সুরেখা আমার কথার পর কিছু বলল না। না বললেও দেখতে পেলাম ওর চোখে প্রচণ্ড বিস্ময়।

প্রায়ই ভেসে ওঠে মনের দর্পণে বিরাট এক প্রতিবিম্ব, শুধু প্রতিবিম্বই নয় যার প্রতিবিম্ব তার পদধ্বনিও যেন শুনতে পাই সর্বক্ষণ। যখনই এই প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে মনের দর্পণে তখনই বুঝতে পারি জীবন-তরী নিয়ে কোনো মন-সমুদ্রে ভেসে

বেড়াবার নির্দেশ এসেছে। এই নির্দেশ উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। আজ বিকেলে হঠাৎই যেন সেই প্রতিবিম্ব ভেসে উঠল মনের দর্পণে আর তারপরই মনে হলো যেন শুনতে পেলাম তার নির্দেশ। সেই নির্দেশে ডুব দিলাম একটা ছোট্ট মানুষের মনের গভীরে। মনের অরণ্যে অনেক জটিলতা, অনেক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর আজও অজ্ঞাত সেই ছোট্ট মানুষটার কাছে।

গত বছর মা-বাবার সঙ্গে বাবলু গিয়েছিল কুলুতে। ঐখান থেকেই তার মা হারিয়ে যায়। বিরাট এক শূন্যতা তখন থেকেই ওকে গ্রাস করে রেখেছিল। একটা প্রশ্ন সেই থেকে ওকে ঘিরে আছে, বাবার কাছ থেকেও কোনো সদুত্তর পায়নি। ও ভাবতে পারে না একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ কী করে হারিয়ে যেতে পারে। ও জানত ছোটরাই শুধু হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু একটা বড় মানুষও যে হারিয়ে যেতে পারে এটা ভাবতেই পারেনি। মায়ের জন্য ওর কষ্ট হয়, স্নেহের আঁচলের নিচে ও বেশ ছিল। হঠাৎ কী ভাবে যে ঘটনাটা ঘটে গেল!

আপনি কিছু একটা ভাবছেন মনে হচ্ছে?—সুরেখা প্রশ্ন করল।

ছোট্ট একটা মানবসন্তান আমার হাতে একটা রহস্যের খুঁট ধরিয়ে দিয়েছে। একটা স্নেহের ভাণ্ডার রাতারাতি তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আপনার কথা শুনে কিছু অনুমান করতে পারব এতটা বুদ্ধিমতী আমাকে ভাববেন না।

গত বছর খবরের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল আশা করি খবরটা আপনার চোখে পড়েছে—কুলুতে এক বাঙ্গালী বধূ হঠাৎ নিখোঁজ। অনেক সন্ধান করেও তার কোনো খোঁজ মেলেনি। আপনি যদি অঙ্গীকার করেন যে আমি যা বলব তা গোপন রাখবেন তাহলে কৌতূহলের কারাগারে আপনাকে বেশিক্ষণ বন্দী থাকতে হবে না।

নির্ভয়ে বলতে পারেন।

আমার মনে হয় সেই বাঙ্গালী বধূ আর বাবলুর মা অভিন্ন। আরো একটা সন্দেহের কাঁটা আটকে আছে আমার মনে। সত্যি কথা বলতে কী আমার গল্প বলার উদ্দেশ্যও সেই কারণে।—প্রশান্তবাবুর কথাটা সুরেখাকে জানালাম না। তার পরিচয় গোপন রাখার নির্দেশ ছিল। এবং সেই কারণেই সমস্ত কিছু খুলে বলতেও পারছিলাম না।

আরো একটু খুলে বলা কী সম্ভব?—সুরেখা প্রশ্ন করল।

এখানে এ মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়, কথাটা এভাবে বললাম বলে মনে কিছু করবেন না।

আমি এখন মনে হয় কিছুটা অনুমান করতে পারছি কিন্তু যা অনুমান করছি তা এতই ভয়ঙ্কর যে সে কথা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে প্রকাশ করা চলে না। মনের অর্গল নামিয়ে দিয়ে সে কথা প্রকাশ করতে না পারলেও একটা কথা বলতে পারি আপনি কেবলমাত্র সাহিত্যিকই নন সত্যান্বেষীও।

বিদ্রূপ করছেন?   কিন্তু সাহিত্যিক মাত্রই সত্যান্বেষী।

চাচিজী আমাদের কাছে বসে আছেন সুতরাং আমাদের বক্তব্য তার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করার কথা নয়। কিন্তু তিনি যে আমাদের বিষয়বস্তুর উপর বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেছেন তা মনে হলো না। তার চোখ এবং মন ছড়িয়ে ছিল অনেক কিছুর উপর। যে ভাবে উনি দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে বসেছিলেন তাতে মনে হলো উনি নিঙরে নেয়া সৌন্দর্যের নির্যাস যেন দু'চোখ দিয়ে আকণ্ঠ পান করছেন।

সুরেখার সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় কথার কানাগলিতে ঢুকে পড়লাম। কথা বলার সময় সুরেখা কখনো বেহিসাবী হোতে পারে না এবং আমি হিসেব না করে কোনো কথা ওর কাছে পারতে ভরসা পাই না, তাই আমাদের কথা দম না দে'য়া ঘড়ির মত থেমে গেল।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন খাঁচার জন্তুর মত দাপাদাপি করছে দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে, তার উত্তর খুঁজে পেতে নদীর বুকে ছড়িয়ে রাখি দৃষ্টিটা। নদীর জলের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে উত্তরটা। আমরা যখন ওখান থেকে উঠলাম তখন রাত ন'টা। আস্তানায় ফিরে এসে শুনলাম পরিতোষবাবু হঠাৎ অসুস্থ শরীর নিয়ে, আত্মীয়স্বজন বিবর্জিত হয়ে বিদেশে থাকতে ভরসা না পেয়ে আমাদের আসার কিছুক্ষণ আগেই বেনারস চলে গেছেন। ওখানে তার এক আত্মীয় থাকে তার কাছে গেছেন, সঙ্গে রঞ্জিতবাবুরাও আছেন। সুরেখা আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিসফিস করে বলল, আপনি জানিয়েছিলেন বাবলুর মা হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা রহস্য আছে এখন আমারও তাই মনে হচ্ছে।

বললাম, আপনি তো আগেই তা অনুমান করেছেন শুধু তাই নয় আপনি আরো কিছু ভেবেছেন কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে পারেননি। যা আপনি অনুমান করেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভুল।—এ পর্যন্ত বলার পর ওকে প্রশান্তবাবুর কথা জানালাম। পরে বাঁধভাঙা বন্যার মত সকলের অজস্র প্রশ্ন আছড়ে পড়ল আমার কাছে। আমি বিস্তারিতভাবে জানালাম পরিতোষ সন্ন্যালের কথা সেই সঙ্গে আমার গল্প বলার উদ্দেশ্য। আরো একটা ব্যাপার ব্যক্ত করলাম—রঞ্জিতবাবুর স্ত্রীর সাথে পরিতোষ সন্ন্যালের সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। এটা বুঝতে পেরেছিলাম গতকাল রাত্রে।

গত বছর পরিতোষ সন্ন্যাল কুলুতে বেড়াতে যায় সপরিবারে। ওখানেই একটা খাদের মধ্যে পরিতোষ সন্ন্যাল তার স্ত্রীকে অতর্কিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এরকম একটা কিছু সন্দেহ করেছিলেন প্রশান্তবাবু সে কথা জানিয়েছিলেন আমাকে। আমি সত্যের অন্বেষণে গল্পটা ফেঁদে বসেছিলাম। গল্পের পরিতোষ সন্ন্যালের মুখ দিয়ে এমন একটা কথা বলাই যেটা অস্বাভাবিক। আমার গল্পের একক গুপ্ত সুরজিতকে জানিয়েছিল সেই কথা বলতে যেটা সে বলেছে গল্পে এবং নিজেও বলেছিল একই ধরনের কথা অর্থাৎ পরিতোষ সন্ন্যাল যে কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছিল সেটা গল্পের একক গুপ্তের এবং সুরজিতের মুখে একই ধরনের

গল্প শুনে যাতে সে বুঝতে পারে তার অপরাধ একক গুপ্তর কাছে আর অজানা নয়। আমার কাছে প্রশান্তবাবু যা জানতে চেয়েছিলেন জানিয়েছি, এরপর পুলিশ তার কর্তব্য করবে।

চলার পথে কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে, কত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটছে তার পরিসংখ্যান করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় কী তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আমাকে প্রশ্ন করা হোলে আমি বলব, বিশ্বের বিস্ময় মানুষের মন। আমার প্রায়ই মনে হয় বিশ্বের সমস্ত সুতো যদি জট পাকিয়ে যায় তাহোলেও মানুষের মনের জটের সঙ্গে তার তুলনা চলে না বোধ হয়। এক একটা মানুষের মনের মধ্যে আছে গোলকধাঁধা, তাতে হারিয়ে যায় অসংখ্য মানুষ। আবার প্রত্যেকটি মানুষ অনেক মানুষের মনের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি সত্যান্বেষী। সত্যকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি অনেকদিন ধরে। সাহিত্যিক আমি কোন দরের তা আমার জানা নেই এবং তা নিয়ে ভাববার মত অবকাশ বা ইচ্ছে কোনোটাই নেই আমার। লিখতে ভাল লাগে তাই লিখি। সাহিত্যের দরবারে আমার স্থান কতটুকু তা বিচার করবে পাঠক। আমার কাছে আমার পরিচয় শুধু সত্যান্বেষী, মানুষের মনের সত্যটুকু অন্বেষণ করে বেড়াতে পারলেই আমি খুশি। ট্রেনের কামরায় আমার আসনটাতে বসে ভাবতে থাকি অনেক কথা। হঠাৎ চাচিজীর ডাকে গড়িয়ে পড়ি ভাবনার পাটাতন থেকে।

কী ভাবছ একক ?

উল্লেখযোগ্য কিছু না।—আমি চাচিজীর কথার জবাব দেবার সময় আমার আসন পরিত্যাগ করে তার কাছে এসে বসি।

তোমাকে তো সাহিত্যিক বলেই জানতাম কিন্তু তুমি যে ডিটেকটিভও এটা জানা ছিল না।

এরকম কোনো পরিচয় আমার নেই আমি কিছুই করিনি, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, সবই ভবিতব্য।

কী বিচিত্র ঘটনা! বোধহয় এই ট্যুরের কথা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভুলতে পারব না দুটি কারণে।

একটা কারণ অজানা নয় কিন্তু দ্বিতীয়টা কী ?

অনুমান কর।

পারছি না।

সাহিত্যিক একক গুপ্তর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে এটা কী কম কথা!

চাচিজী আপনার কাছে আমি সাহিত্যিক একক গুপ্ত নয় শুধু একক। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

বল।

প্রথমে যে সম্বোধনটা করেছিলেন সেটাই বহাল যদি রাখেন তাহোলে ভাল হয়।

ওভাবে ডাকলে তোমার পাঠকরা আমাকে কেউকেটা ভেবে বসবে নাতো ?

একক গুপ্তর চাচিজীর যেটুকু প্রাপ্য সম্মান তা তো তিনি পাবেনই।

তোমার কথা শুনে আমার ভাল লাগছে, একক একটা কথা তুমি আমায় দেবে ?

বলুন চাচিজী।

পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে যাবে নাতো ?

বিশ্বাস করুন চাচিজী আপনাকে অনাত্মীয় ভাবতে পারছি না। আমরা আত্মীয় বেলতে বুঝি রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে আছে তারাই শুধুমাত্র আত্মীয় কিন্তু সত্যি কী তাই! আত্মীয় কথাটা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় আত্মার কাছাকাছি যে সেই আত্মীয় তাহোলে আপনাকে আত্মীয় ভাবতে পারব না কেন ?

চাচিজী আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না শুধু দুটো হাত দিয়ে আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

চলার পথে কত মানুষের সাথে পরিচয় কত মানুষের প্রতিবিম্ব আজ মনের দর্পনে প্রতিফলিত, কত চরিত্র, কত অনুভূতি, কত স্মৃতি মনের আকাশ জুড়ে আছে আবার কত চরিত্র কালের স্রোতে ভেসে গেছে অথবা জীর্ণ পাতার মত মনের বোঁটা থেকে খসে পড়ার অপেক্ষায় আছে। আমি প্রকৃতির রাজ্যে এক যাযাবর, মানুষের মনের রাজ্যেও তাই। বন্ধনের ভয়ে একজনের কাছ থেকে পালিয়ে যাই আরেকজনের কাছে। যাযাবরকে এক জায়গায় বন্দী করে রাখা যায় না। যারা সে চেষ্টা করে তারা ভুল করে। তাদের জন্য দুঃখ হয়। বিধাতা আমার জন্য গৃহ দেননি, যা দিয়েছেন তা নিয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত। কী দিয়েছেন ঈশ্বর ? একটা দেহ! দেহ তো খোলস আসল বস্তুটা রক্ষা করার একটা আবরণ, একটা আধার মাত্র। আসল পাখিটা তো মন, দেহটা শুধু পিঞ্জর ; পিঞ্জরের যেদিন দরজা খোলা থাকবে সেদিন বিহঙ্গ ডানা মেলে উড়ে যাবে অসীম অন্তরীক্ষে! এটাই চিরন্তন সত্য। পৃথিবীর বাতাস নিয়ে যেদিন ফুসফুস পূর্ণ করে মানুষ সেদিনই এই চিরন্তন সত্যের তিলক আঁকা হয়ে যায় তার ললাটে। এ সবই তো জানা তবু পাখিটা পিঞ্জরটাকেই ভালবেসে ফেলে। আমার প্রাণ পাখিটা এর ব্যতিক্রম কিনা জানি না।

এই মনের বাইরে আমার দুটি জিনিস আছে—দুটি চোখ, তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ ; এই চোখের তৃষ্ণা মেটাতেই তো আমাকে যাযাবর জীবন বেছে নিতে হয়েছে। বিধাতা নিপুণ হাতে গভীর অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, অশান্ত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন আর কোনো এক লগ্নে আমার অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন সে সংবাদ। সেটা কত দিন পূর্বে, কত বছর পূর্বে তা আমি জানি না কিন্তু সেই সময় থেকেই আমি অস্থির, অশান্ত ; দু'চোখে শুধু তৃষ্ণা, কোথায় কোন অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন বিধাতা যা আজও দেখা হয়নি একথা মনে হোলেই মনে হয় তপ্ত মরুভূমির বুকে ছুটে বেড়াচ্ছি আমি এক বিন্দু জলের জন্য।

দীর্ঘ বহেমিয়ার জীবন আমার। গৃহহীন এই মানুষের গৃহের প্রতি লোভ বোধহয় এই প্রথম। কত চাচিজী অতীতের স্মৃতির কবরের নিচে চাপা পড়ে

আছে কিন্তু কাউকেই জীবন-তরীর চিরস্থায়ী একটা অংশ জুড়ে থাকার অধিকার দি নি অথচ আজ স্বেচ্ছায় সে অধিকার দিয়ে বসলাম চাচিজীকে। আজ কেন জানি না একটা লোভ আমাকে পেয়ে বসল—অন্তত এই বিশ্বে একটা গৃহ আমার থাক। থাক-না একটা গৃহ মনের এক কোণে।

এক রাজকন্যা পাতালপুরীর এক পালঙ্কে সব সময় ঘুমিয়ে থাকত। কত রাজপুত্র এসে তাকে জাগাতে চাইত কিন্তু রাজকন্যার ঘুম কিছুতেই ভাঙত না। একদিন ভিন্ দেশ থেকে আসল এক রাজপুত্র, হাতে তার জীয়নকাঠি, ঐ জীয়নকাঠির স্পর্শে রাজকন্যার ঘুম ভাঙল। রাজকন্যার মত আমার মনের মধ্যে ছিল এক ঘুমন্ত ইচ্ছে, আমার যাযাবর মনও চায় একটা চিরস্থায়ী ঘর, একটুখানি বন্ধন। সেই বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে হারিয়ে যেতে পারব না। একটুখানি বন্ধনের মধ্যে আছে এক অনাস্বাদিত আনন্দ। নতুন করে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। এতদিনের একটা ধারণার দেয়ালে যেন চীড় ধরল। চাচিজীর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভাবতাম বন্ধন মানেই কষ্ট, পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখির বুকের যন্ত্রণা।

চলার পথে অনেক মানুষের সাথে পরিচয় কিন্তু যখনই চলার শেষ হয়েছে তখনই তারা স্মৃতি-পুস্তকের এক একটা পৃষ্ঠা হয়ে থেকে গেছে। কখনো কাউকে বলতে পারিনি আমাদের আবার দেখা হবে। শুধু জানিয়েছি পৃথিবী বৃত্তাকার, এভাবে পথ চলতে চলতেই হয়ত দেখা হবে আমাদের কিন্তু চাচিজীকে সেকথা বলতে পারলাম না।

একক তোমাকে একটা কথা বলছি—দুঃখের সমুদ্র পেরিয়ে এসেছি, আজ আমার সুখের দিন, সুখের আকাশে আজ আবার রামধনু দেখলাম।

চাচিজীর একপাশে আমি অন্যপাশে সুরেখা জানালার ধার ঘেঁষে বসে আছে। এক হাতে একটা জেফ্রি আর্চারের উপন্যাস, অন্য হাতের কনুই স্পর্শ করে আছে জানালার নিচের অংশ। কনুই থেকে হাতটা ভাঁজ হয়ে চুল পর্যন্ত উঠে আছে। রসিক সমীরণ তন্বীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে, চুল নিয়ে যেভাবে খেলায় মেতে উঠেছে তাতে হাতের শাসন ছাড়া তার কাছ থেকে নিস্তার নেই। বাধ্য হয়েই হাতটাকে ঐভাবে ভাঁজ করে রাখতে হয়েছে। আমাদের বিপরীত দিকের বার্থে বিয়াস শুয়ে আছে চোখ বন্ধ করে, ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে বোঝার উপায় নেই। সম্ভবত ঘুমিয়ে আছে তা না হোলে ওর ঠোঁট নড়া একেবারে বন্ধ থাকার কথা নয়। শুধু আমি আর চাচিজী কথা বিনিময় করে চলেছি। আশা করেছিলাম সুরেখা আমাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে কিন্তু সে আশা আমার পূর্ণ হোল না। যে ভাবে বইয়ের উপর চোখ ডুবিয়ে বসেছিল ও সে ভাবেই বসে থাকল দীর্ঘ সময়। আমি চাচিজীর সঙ্গে কথা বলে চলেছিলাম ঠিকই কিন্তু কেন জানি না আমার সমস্ত অঙ্গে ক্লান্তি বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল, ক্লান্তিকে নিরাশ্রয় করতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল। আমার অবস্থা তখন তেল ফুরিয়ে যাওয়া গাড়ির মত। সুরেখা আমার অবস্থা অনুমান করতে পেরে চাচিজীর উদ্দেশ্যে বলল, মা আমার মনে হয় এককবাবুর বিশ্রামের প্রয়োজন।

আমি প্রতিবাদ করলাম কিন্তু কণ্ঠে জোর ছিল না। দু'চারদিন নিরাশনের পরই এরকম কণ্ঠের অবস্থা হোতে পারে।

তাইত, কী আশ্চর্য তোমার অবস্থার কথা এতক্ষণ আমার খেয়ালই হয়নি, রেস্ট নাও পরে কথা হবে।

আমি চাচিজীর কথার পরও ভদ্রতার সীমারেখা লঙ্ঘিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে উঠব-উঠব করেও উঠতে পারছিলাম না। চাচিজী আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, তুমি বেশ ক্লান্ত যদিও এটা আমার বোঝা উচিত ছিল কিন্তু নিজের কথার মধ্যে এমনভাবে ডুবেছিলাম যে তোমার কথা একবারও ভাবিনি। তুমি আর কাল বিলম্ব না করে উঠে পড়।

এবার কালক্ষেপ না করে উঠে পড়লাম। এরপর চাচিজীর সাথে কথা হলো পরের দিন সকালে কিন্তু প্রত্যুষের দিবাকরের হিরণ্য আমার অঙ্গে গড়িয়ে পড়া পর্যন্ত দু'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে পারিনি। উপাধানের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় অন্ধকারের পাপড়ির ভেতর থেকে প্রভাতের আলো বেরিয়ে আসার অনেক আগে। অর্থাৎ চাচিজীর সাথে কথা হবার অনেক আগেই আমাকে শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়তে হয় সোনাবৌদির জন্য।

রাত তখন কত ঠিক বলতে পারব না। কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা খুলে রাখার কথা শোবার সময় মনে ছিল না সেই সঙ্গে মনে পড়েনি ঘড়িতে দম দেবার কথা। ঘড়িটা চলতে চলতে এক সময় থেমে যায়। ঘড়ির কাঁটা দুটো যে দুটো ঘর অধিকার করে ছিল তাতে বলা যায় তখন সময় সুনিশ্চিত ভাবে রাত তিনটের বেশি। নিকষ কালো অন্ধকার তখন না, খুব ক্ষীণ আলো মিশে আছে অন্ধকারের সাথে। আর কতক্ষণ পর রাত্রির মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আসবে ঊষা জানা নেই। স্টেশনের পাশে অস্পষ্ট পাহাড় আর গাছ-গাছালির আকৃতি দেখে অনুমান করার চেষ্টা করছিলাম রাত্রির আয়ু আর কতক্ষণ, কখন দেখতে পাব ধূসর কুটে সেই নির্ঝরকে যার আবির্ভাবে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলোকিত হয়। মনে মনে ভাবছি কখন নেমে আসবে গিরিপথ দিয়ে শ্রমণের দল তথাগতের গান গাইতে গাইতে, এছাড়া মনে আশা চাসের বীজনে রৌদ্রের লুটোপুটি যদি দর্শন মেলে। কেউ যদি বলে এ সৌন্দর্য হরণের ইচ্ছে নিয়ে এখানে বসে আছ কেমন মূর্খ তুমি! তাহোলে কী বলব? এই রূপ-জিহীর্ষা কেন এখানে নাকি নিজের মূর্খতার জন্য অধোবদন হয়ে থাকব! এ কথা কী বলা চলে না—যেখানে দেখ ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই মিলিলেও মিলিতে পারে অমূল্য রতন।

কোনো রমণীর আঁখিতে ঘর বাঁধার সুখ দেখতে দেখতে যিনি অবীরার বুকের ভেতরের কষ্ট অনুভব করেন তার উপর বিরক্ত না হওয়ার কারণ নেই এবং একই কারণে পাঠক আমার উপর কিছুটা বিরক্ত হোতেই পারে। এই ভয়েই বলি ঢের হয়েছে আর নয় এবার সোনাবৌদির কথায় ফিরে আসি। ঘুম ভাঙতেই দেখলাম কামরার বাইরে প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে আছেন সোনাবৌদি। অন্ধকার কিছুটা

ফিকে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তখনো পল্ললে শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিলাম। এ সময়ে বিনা কারণে কেউ শুধুমাত্র শিশিরে মস্তিষ্ককে সিক্ত করার জন্য নিশ্চয়ই প্লাটফর্মে বসে থাকবে না। বুঝে উঠতে পারি না কেন সোনাবৌদি উষ্ণ শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করে এই নির্জন স্থানে একা বসে আছেন। এই কেনর উত্তর পাওয়ার আশায় আমিও সুখ-নিদ্রাকে বিসর্জন দিয়ে প্লাটফর্মে এসে হাজিব হোলাম। অবশ্য সোনাবৌদিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যে সেখানে গিয়ে হাজির হোলাম তা নয়, প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ভোর যেন আছড়ে পড়ল অন্ধকারের বুকে। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে শেষ করে দিল। তখনো সোনাবৌদি বসে আছেন দেখে আমি আর উষ্ণ শয্যার আলিঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারলাম না। সোনাবৌদির কাছে হাজির হয়ে বললাম, আপনাকে রাত থাকতেই এখানে বসে থাকতে দেখছি এখনো বসে আছেন একই ভাবে—কথাটা শেষ না করে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে রাখলাম বৌদির মুখের উপর। আমার বক্তব্যের শেষ অংশটুকু চোখের তারায়। সোনাবৌদির চোখের উপর দৃষ্টি পড়তেই একটা ব্যাপার দৃষ্টির কক্ষে আশ্রয় নিল, দেখলাম চৈত্রের দুপুরের মত খাঁ খাঁ করছে তার চোখ দুটি। সেই সঙ্গে মনে হলো হাসি-খুশির উত্তরীয় সারাদিন গায়ে চড়িয়ে রাখলেও তার অন্তর জুড়ে বিরাট এক শূন্যতা বিরাজ করছে।

ঘুম আসছে না তাই বসে আছি।—সোনাবৌদির কণ্ঠস্বর ভাঙা সানাইয়ের মত বেজে উঠল।

কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত।

কেন ?

আমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বসে থাকলাম। ঠোঁট বিযুক্ত না হোলেও মনের অনেক কথা প্রকাশিত হয়। তখন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলে ওঠে। আমাব অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর ছিল চোখের তারায়, সম্ভবত সোনাবৌদি তা পড়তে পেরেছেন, না পারলে আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে অখণ্ড নীরবতার ছাদের নিচে অবস্থান করতেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া দৃষ্টিকে আমার মুখেব উপর থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্থাপিত করতেন না অন্তহীন নভমণ্ডলে। অনেকক্ষণ ঐভাবেই বসে থাকলেন। আমিও নীরবতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে উঠে পড়লাম। আমার উপস্থিতি হয়ত তার কাম্য নয় মনে হওয়াতে ওখান থেকে সরে পড়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম, আর তখনই শুনতে পেলাম তার কণ্ঠস্বর।—দাঁড়ান।

আমি ওনার দিকে ফিরতেই চোখের ইশারায় বসার নির্দেশ করলেন। নির্দেশ পালিত হবার পর বললেন, আমি এখানে একজনকে খুঁজতে এসেছি—আমার দেবতাকে। কোথায় গেলে তাকে পাব জানি না। কতদিন হয়ে গেল দেউল ত্যাগ করে আমার প্রাণের ঠাকুর চলে গেছেন। এক একদিন ঘুমের মধ্যে তাকে দেখি, ঘুমের মধ্যে তাকে কাছে পাই। অনেক কথা যেন শুনতে পাই তার। তিনি যখনই আসেন তখনই মনে হয় যেন হাজার সূর্য ওঠা দেখলাম। বলতে পারেন কোথায় গেলে তাকে দেখতে পাব ?

এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সোনাবৌদি আবার বলতে আরম্ভ করলেন।—তার সঙ্গে কবে দেখা হবে তা আমি জানি না কিন্তু দেখা আমি পাবই, দেখা আমাকে পেতে হবেই। এরজন্য যদি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে হয় যাব। আমি মহাপাপী আমার অপরাধের বোধহয় ক্ষমা নেই, তাই যদি না হবে তাহোলে এখনো তার দেখা পেলাম না কেন! আচ্ছা এককবাবু মানুষ যদি কোনো অন্যায় করে তার কী ক্ষমা নেই?

কেন নেই। ভুল তো মানুষ মাত্রেই করে, যখনই সে তার অপরাধ বুঝতে পারে, অনুশোচনা হয় কৃতকর্মের জন্য তখনই তার মুক্তি। বাল্মিকী পাপের বিবর থেকে মুক্ত হয়ে ঋষি বাল্মিকী হয়েছিলেন। শুধু বাল্মিকী কেন সম্রাট অশোকের অপরাধও অনুশোচনার প্লাবনে ধুয়ে-মুছে গেছিল। আপনি কী অপরাধ করেছেন জানা নেই কিন্তু আপনি অনুতপ্ত এটা বুঝতে পারছি। যাক সে কথা একটা প্রশ্ন করব?

করুন।

আপনার দেবতা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে কোনজন?

তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর থেকেও বড় আমার দেবতা। দেবদেবীর সঙ্গে কিসের বন্ধন আমার! শুধু বিশ্বাস। দেবদেবী আছেন, তারা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমাদের মঙ্গল করছেন কিন্তু আমার দেবতার সঙ্গে সাত পাকের বন্ধন। অগ্নি সাক্ষী করে, মন্ত্রোচ্চারণ করে তিনি আমাকে গ্রহণ করেছেন। উনি আমার কায়া, আমি তার ছায়া মাত্র। আপনাকে একটা অনুরোধ করব?

নির্দ্বিধায়।

এই অপরাধিনীর কাহিনী যদি আপনার কোনো বইয়ের কিছুটা জায়গা জুড়ে থাকে তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ক'জনকে জানাতে পারব আমার অপরাধের কাহিনী!—এ পর্যন্ত বলার পর সোনাবৌদি আমার কাছে মেলে ধরেছিলেন তার জীবনের একটা অধ্যায়। একটা সন্দেহের অঙ্কুর কী ভাবে মহীরুহ হয়ে উঠেছিল তার ইতিহাস। চার দেয়ালের মধ্যে একটা সুখের জগৎ হঠাৎ খান খান হয়ে ভেঙে পড়ার কাহিনী।

এমন একদিন ছিল যখন তার সংসারে চুনবালি খসা দেয়ালের মত অভাবকে দেখতে হতো অষ্টপ্রহর। এরজন্য যে তার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিল তা নয়। বরং এই অভাবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বেশ সুখেই সংসার করছিলেন। জরাজীর্ণ সংসারের মধ্যে সুখ ছিল নব বিবাহিতা মহিলার সিঁথির সিঁদুরের মত প্রশস্ত। এই সংসারের মধ্যে কোনোদিন ফাটল ধরবে তা ভাবেননি সোনাবৌদি। হিংস্র দর্বের থাবায় সংসারটা ভেঙে পড়তে পারে কখনো তা ছিল তার স্বপ্নেরও অতীত।

সুনীল তার কায়া। তার ইহকাল পরকাল। এই মানুষটা তাকে ভরিয়ে রেখেছিল। অথচ একদিন তার সন্দেহের ছায়া এসে পড়ল এই মানুষটারই উপর। সে কাহিনী অবতারণার পূর্বে সুনীলের কিছু কথা বলা অপরিহার্য। সুনীলের

বিত্তের প্রতি স্পৃহা ছিল আকাঙ্খন। দীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভাগ্যলক্ষ্মীর আঁচলটা ছিল তার নাগালের বাইরে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে সোনাবৌদির কাহিনী শোনাবার জন্য আমাকে কলম ধরতে হতো না। সুনীল শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটার সন্ধান পেল। আস্তে আস্তে অভাব অন্তর্হিত হলো। আসতে থাকল অর্থের প্রাচুর্য। এমন একদিন আসল যখন দু'কূল দাপিয়ে বন্যার মত অর্থ এসে পড়ল সোনাবৌদির সংসারে। সেই বিত্তের নির্ঝরে গা ভাসিয়ে তিনি কতটা সুখী হয়েছিলেন তা মনে করতে পারবেন কি না বলা শক্ত তবে একটা কথা ভুলতে পারবেন না। বুকের তলায় একটা ভয় বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল। ভয়ের ছায়াটা যার জন্য মনের উপর বিস্তৃত হচ্ছিল তার নাম সুমনা। একই গর্ভজাত সুমনা আর সোনাবৌদি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে উঠে আসার পর সোনাবৌদির একাকিত্ব ঘোচাবার জন্য সুমনাকে আসতে হয় এই বাড়িতে। সমস্ত দিন সুনীল তার কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখে নিজেকে। ফেরে অনেক রাত্রে, এর ব্যতিক্রম খুব একটা হয় না। বিত্তের কুট-প্রাকার থেকে বেরিয়ে এসে সোনাবৌদির একাকীত্বের কথা ভাববার মতো অবকাশ তার ছিল না। এরজন্যও সোনাবৌদির কোনো অভিযোগ ছিল না। শুধু নিজের একাকীত্বের কথা ভেবে সুমনাকে নিয়ে এসেছিলেন। ওর আগমনের পর থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন সুনীলের যেন গৃহের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেছে অনেকখানি। এছাড়া মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শুধু সুমনাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোয় কিম্বা সিনেমা-থিয়েটারে যায়। প্রথম প্রথম ব্যাপারটার মধ্যে অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মনের আঁতুর ঘরে সন্দেহ জন্ম নিল। সেই সন্দেহ ক্রমশই যেন শৈশবের থেকে যৌবনের দিকে গড়িয়ে গেছে। সুমনা এবং সুনীল যখনই বেরিয়েছে সোনাবৌদিকে সঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়েছে কিন্তু তিনি নিজেই চাননি সঙ্গী হোতে, ওদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটা জানার জন্য মাথা ধরা কিম্বা অন্য কোনো অজুহাতে আমন্ত্রণ এড়িয়ে গেছেন। কই ওদের দেখে তো মনে হয়নি ওরা দুঃখিত। তার না যাওয়ার জন্য ওদের খারাপ লেগেছে বলে তো মনে হয় না। বরং তার মনে হয়েছে সুমনার চোখে যেন খুশির ঝিলিক দেখতে পাচ্ছেন। সন্দেহের দানবটাকে চাবুক মেরে রেখেছিলেন কিছুদিন কিন্তু হঠাৎই একদিন সন্দেহের দানবটাকে সংযত করে রাখতে সক্ষম হোলেন না, চাবুকটা যেন আপনা থেকেই খসে পড়ল। সুমনা অন্তঃসত্ত্বা। সোনাবৌদি ব্যাপারটা জানার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ তারপর হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন, সমস্ত ক্রোধ আছড়ে পড়ল সুনীলের উপর। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বল এর জন্য দায়ী কে?—প্রশ্নটা দু'জনের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। যদিও অগ্নি-ঝরা দৃষ্টি দু'জনকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল তবু প্রশ্নটা ছিল স্বামীর কাছে। প্রশ্ন শুনে সুমনা মাথা তুলতে পারেনি, সেই সঙ্গে সুনীলও নির্বাক। পরে সুমনার অসাক্ষাতে সোনাবৌদি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সুনীলকে প্রশ্ন করেছেন,

কেন তুমি আমার সর্বনাশ করলে বল, বল, বল ?—কথা বলতে বলতেই চোখের আর কথার দাবানল আছড়ে পড়েছিল তার স্বামীর উপর এবং সেই সঙ্গে লবণাক্ত নীরে অপাঙ্গ সিক্ত হয়ে উঠেছিল।

সুনীল বোঝাবার চেষ্টা করেছে, বলেছে, বিশ্বাস কর সোনা সুমনাকে আমি নিজের বোনের মত ভালবাসি, বিশ্বাস কর তুমি যা ভাবছ তা ঠিক নয়। জানি না সুমনা কেন নিরুত্তর থাকছে কিন্তু আমি ওর সঙ্গে ওরকম সম্পর্কের কথা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারি না।—সুনীল কথা সমাপ্তির পর স্ত্রীর পিঠের উপর হাত রাখতে যায় কিন্তু তার স্পর্শ পেতেই ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে উঠে সোনাবৌদি বলেন, ছুঁয়ো না আমাকে। চরিত্রহীন, লম্পট—যাও আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকো না।—কথা বলতে বলতেই ভগ্নস্তূপের মত দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে পড়েন সোনাবৌদি।

সুনীল অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করে যে সোনাবৌদির ধারণা ঠিক নয় কিন্তু ব্যর্থ হোতে হয় তাকে। অশান্তির আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, সেই আগুনে সংসারটা পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। অশান্তির জন্য একটা আধি সুনীলকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। বাধ্য হয়ে একদিন গৃহত্যাগ করে সে।

এরকম একটা পরিণতির কথা ভাবেনি সোনাবৌদি, সেই সঙ্গে সুমনাও। যে কথা এতদিন জানাতে পারেনি সুমনা তা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হোল। যে ভ্রূণটাকে নার্সিংহোমে ধ্বংস করে এসেছিল সে তার জন্ম অশোকের ঔরসে। মানুষটা সম্পর্কে তার মামা আর এই কারণেই সুমনা মুখ খুলতে পারেনি। অশোকের মনের মধ্যে একটা জঘন্য পশু থাবা মেলে রেখেছিল শিকারের জন্য তা অজানা ছিল সুমনার। সেই পশুটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এটা ওর কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। সেই কল্পনাতীত ব্যাপারটাই ঘটে গেল। ও প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছে কিন্তু মুখ খুলতে পারেনি। কী বলবে? ঐ ভ্রূণের জন্ম মামার ঔরসে! এ কথা যখনই বলবার চেষ্টা করেছে তখনই কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। অবশেষে তাকে বলতেই হোল। সোনাবৌদি সব শুনলেন, শোনার পর তার মনে হোল একটা তপ্ত লৌহশলাকা যেন মস্তিষ্কে প্রবেশ করল। অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেছিলেন, এ কথা কেন বলিসনি মুখপুড়ি এতদিন! তোর জন্য একটা নির্দোষ মানুষ আজ ঘরছাড়া।—এরপর আরো অনেক কিছুই বলে গেলেন। কথার বারুদে সুমনাকে দগ্ধ করতে থাকলেন দীর্ঘ সময় ধরে। সুমনা তার কথায় কতটা দগ্ধ হয়েছিল বলা শক্ত তবে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার জানাতে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। সত্যি তার জন্যই একটা নির্দোষ মানুষ জন-সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে গেছে

সোনাবৌদির কাহিনী শেষ হোল, সেই সঙ্গে রাত্রিরও অবসান হোল। দুটি পাহাড়ের মাঝে শিশু সূর্যের জন্ম হোল। পূব আকাশে যেন রক্ত ছড়িয়ে আছে আর তারই মাঝে রক্তাক্ত সূর্যটা তিরতির করে কাঁপছে। অদিতির পুত্রের কাছে

প্রার্থনা জানাচ্ছে অনেকে। ভোরের আকাশ-বাতাস পাখির কলকাকলিতে মুখরিত। সেই শব্দে অনেকের ঘুম ভাঙল। সোনাবৌদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার অপরাধের কাহিনী তো শুনলেন, আমার অনুরোধটা রাখবেন তো এককবাবু ?

বললাম, এত কিছু শোনার পর কী করে বলি রাখব না—নিশ্চয়ই রাখব।

আমার উত্তরের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। উত্তর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্পার্টমেন্টের দিকে পা বাড়ালেন। তার চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ আমি বসে ছিলাম সেখানে।

আমার তরণী অভিজ্ঞতার রিক্থে কতটা সমৃদ্ধ তা বলতে পারব না তবে একেবারে রিক্ত নয় এ কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। গৃহের বন্ধন যখন থেকে টুটেছে আমার তখন থেকেই আমি পথে পথে। পথের আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, হাটে-গঞ্জে ঘুরি, মানুষের সুখ-দুঃখের কথা শুনি, এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভেসে চলি। অশন কখনো জোটে আবার কখনো নিরাশনে পথ চলি। আরো একটু খোলসা করে বলতে গেলে—ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। পথ চলতে চলতেই হোক কিম্বা গ্রামে-গঞ্জে-হাটে-বাজারেই হোক মানুষের সুখ-দুঃখের কথা শুনি। সে সব সুখ-দুঃখের কথা লিপিবদ্ধ করি। সোনাবৌদির অন্তরের ব্যথা আমার বুকে বেজেছে তাই শুধুমাত্র লিপিবদ্ধ করার কথাই ভাবছি না. তার কথা এই ছন্নছাড়া মানুষটার মনের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছে। আর সেইজন্যই সোনাবৌদি চলে যাওয়ার পরও বসে থেকেছি অনেকক্ষণ।

চাচিজী একসময় আমার পাশে এসে বসে বললেন, কী ব্যাপার একা এখানে বসে আছ ?

এখন একা ঠিকই কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বে একা ছিলাম না।

কেউ ছিল ?

হ্যাঁ, সোনাবৌদির সাথে কথা বলছিলাম।

সোনাবৌদি মানে তো সেই ভদ্রমহিলা যার সঙ্গে একটা কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে আছে। মনে হয় ছেলেটা ভদ্রমহিলার ভাই-টাই হবে।

ঠিকই অনুমান করেছেন।

ভদ্রমহিলাকে তোমার কিরকম মনে হয় এককু ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন করছেন কেন বলুন তো ?

বলব তার আগে তোমার কাছ থেকে শুনি।

এত কম সময়ের পরিচয়ে কারো সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করাই মনে হয় ঠিক।

বুঝলাম কোনোরকম মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাইছ না কিম্বা ভদ্রতার সীমারেখা যাতে অতিক্রম না করে ফেল তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে চাও। তোমার মত আমি অত হিসেবী নই সুতরাং ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে একটা কথা না বলে পারছি না, ভদ্রমহিলাকে দেখলে মনে হয় প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে একটা কান্নাকে আড়াল করে রাখার প্রচেষ্টা

ঐ হাসিখুশির চেহারায়। খুশির ঝরনা হওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা আছে ওর মধ্যে তা তোমার চোখে পড়েনি ?

পড়েছে কিন্তু আপনি বুঝলেন কী করে ?

ঐ যে বললাম কেন জানি না।

তবু ?

আমি দেখেছি ভদ্রমহিলা যখনই একা থাকেন তখনই যেন একটা কষ্ট ভদ্রমহিলার উপর ছায়া ফেলতে শুরু করে।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কথা বলতে পারলাম না। আসলে চাইছিলাম না এই প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত হোক। চাচিজী বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ থেকে সরে আসলেন। প্রসঙ্গ থেকে সরে আসলেও কথা বিনিময় হতে থাকল আমাদের মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বিনিময়ের পর আমরা উঠে পড়লাম।

॥ পাঁচ ॥

শৈশবের সবিত্রীর কমনীয়তা যেন ক্রমশই অন্তর্হিত হচ্ছে, যেন শৈশবের চৌকাঠ অতিক্রম করে কৈশোরে এসে দাঁড়িয়েছে। কবোষ্ণ সূর্যকিরণে গা ডুবিয়ে আমরা চলেছি হৃষীকেশে। যাবার পথে চোখে পড়ছে ছোট-বড় অনেক পাহাড়, অসংখ্য মন্দির আর নাম না জানা পাখি।

চন্দ্রা আর বিয়াসের ইচ্ছে ছিল আমার কাছে বসে কিন্তু সে সুযোগ ওরা পায়নি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার সহধর্মিণী আমার পাশের আসন দুটো দখল করে রেখেছেন। তিনজনেরই একসাথে বসার কথা ছিল। বাসে ওঠার আগে চন্দ্রা ও বিয়াস জানিয়েছিল কিন্তু আমি যখন বাসে উঠেছি তখন ওরা আমার সঙ্গে উঠে আসতে পারেনি। আমার পাশে জায়গা রাখার কথা জানিয়েছিল বিয়াস। আমি সে চেষ্টা করার আগেই বৃদ্ধ দম্পতি আমার পাশে বসার অনুমতি চেয়ে বসলেন। চাইল বটে কিন্তু অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় না থেকে দু'জনই বসে পড়লেন। বসেই বৃদ্ধা বললেন, আপনার লেখা সবকটি বই মনে হয় আমার পড়া, খুব ভাল লেখেন, সবার কথা বলতে পারব না তবে আমার অসম্ভব ভাল লাগে।

আমি বৃদ্ধার কথার পৃষ্ঠে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না, আসলে লেখনীর ডগায় যত কথা আসে তার দশ ভাগের এক অংশ কথাও আসে না ঠোঁটে। সত্যি কথা বলতে কী আমি যতক্ষণ একটা বাক্য সাজিয়ে তুলি মনে মনে এবং সেটা যখন বলব বলে ভাবি ততক্ষণে সকলেই অন্য কথা পেড়ে বসে থাকে।

আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন এটা জানার সাথে সাথেই আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে হচ্ছিল, আজ সুযোগ পেয়ে গেলাম।—বৃদ্ধাই আবার কথা বললেন।

আমি আপনাদের সাথে থাকব দীর্ঘ কুড়িদিন, শুধু আলাপ কেন আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনেক কাছে চলে আসব দেখবেন।

আমি মুখে এসব বললেও মনে মনে অন্য কথা ভাবছিলাম।

আমার মন একটা ধর্মশালার মতন। যে খুশি আস, যখনই আস কোনো বাধা নেই—উন্মুক্ত দুয়ার। এখানে অবস্থানকালে কোনো পার্থিব বস্তু দিতে হয় না কাউকেই, শুধু মনের ছবিটা নিয়েই আমি খুশি। মনের রহস্য মণিকোঠার দ্বার খুলে আমাকে জানতে দাও এই একটা ঐকান্তিক ইচ্ছে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা মনের খনি থেকে আরেকটা মনের খনিতে। আমি শত-সহস্র মনের সাথে জুড়ে দিতে চাই আমার কৌতূহলী মনটাকে। শত-সহস্র সেতু রচনা করে চলেছি সর্বক্ষণ, সেই সেতু ডিঙিয়ে পোঁছতে চাই মানুষের মনের গভীর বিবরে। মন দিয়ে মন ছোঁয়ার ব্রত গ্রহণ করেছি সেদিন যেদিন বুঝতে পেরেছি মানুষের মনের ঐশ্বর্য অকল্পনীয়, বৈচিত্র্যময়।

একাকবাবু আপনি আমাদের মতন শুধু বেড়াতে আসেননি এটা অনুমান করতে পারছি, আমার ধারণা গল্পের উপাদান সংগ্রহের জন্যই আপনার এই ভ্রমণ—ঠিক কি না বলুন?—বৃদ্ধা কথাটা শেষ করেই উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখের উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখলেন।

মন চল ভ্রমণে। 'কত ঘুরিলাম কত দেখিলাম তবু মিটিল না তৃষ্ণা'। তৃষ্ণা আজও মেটেনি। গল্পের প্রয়োজনে ছুটে বেড়ানো নয়, চলার আনন্দে পথ চলি আমি। কখনো অরণ্যের নিস্তব্ধতা, কখনো শহরের জন-কোলাহল, এ সবই আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করে তাই গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে হাঁপিয়ে উঠি। তখনই বলি, আর নয়, মন চল ভ্রমণে। কবির ভাষায় বলি—

> বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
> চারিদিকে কত না নগর রাজধানী—
> মানুষের কত কীর্তি কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
> কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
> রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
> মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

দুচোখ ভরে দেখা বিশ্ব-সংসার আর তার সাথে উপলব্ধি—রিয়ালাইজেশন, এরই প্রকাশ গল্প। প্রকাশের জন্য উপলব্ধি এবং উপলব্ধির জন্য ছুটে বেড়ানো। বৃদ্ধাকে জানালাম আমার কথা। শোনার পর বললেন, আমাদের এবার আসাই হচ্ছিল না। প্রায় শেষ মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হোল বলেই আসতে পারলাম। এসেছি বলেই আপনার সঙ্গে পরিচিত হোতে পারছি। আপনার সাথে আমাদের কত পার্থক্য!

বললাম, আমার একটা অনুরোধ আছে, আমাকে আপনি বলবেন না। আমার মা বেঁচে থাকলে আপনার বয়সী হোতেন। আপনাকে আমি মাসিমা বলে ডাকার অনুমতি পাব?

এ তো আমার সৌভাগ্য, এত বড় একজন নামি লেখকের মাসিমা হওয়াটা কী কম ভাগ্যের কথা।

আপনি আমাকে বড্ড দাম দিচ্ছেন। যাক সে কথা আপনি যখন মাসিমা হোলেন তখন আপনাদের পরিচয়টা আমার কাছে অজানা থাকা উচিত নয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি, নীরবে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। আমার কথা সমাপ্তির পর প্রথম মুখ খুললেন, মাসিমার সঙ্গে আলাপ জমালে, মেসোমশাইকে পছন্দ হচ্ছে না ?

কথা শুনেই বুঝলাম মানুষটা নীরস নন। বললাম, আপনার সঙ্গে আলাপ হবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। জানতাম সুতোর একটা প্রান্ত ধরতে পারলে অপর প্রান্তের নাগাল মিলবেই।

মেসোমশাই সম্ভবত মাসিমার কান পর্যন্ত কথা যাতে না যায় তার জন্য গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে বললেন, ঠিকই বলেছ এ প্রসঙ্গে জুতসই একটা কথা বলতে পারি, আমরা অর্থাৎ পুরুষরা ঘুড়ির মতন। ঘুড়ি যেমন আকাশের যে কোনো জায়গায় উড়তে থাকুক না কেন সুতোটা যার হাতে তার ইচ্ছার বাইরে যাবার উপায় নেই। মহিলাদের হাতে আমাদের অবস্থাও সেরকম সুতরাং মাসিমার সঙ্গে আলাপ মানেই···

মাসিমার কানে কথাগুলো আশ্রয় যাতে না পায় সে চেষ্টা করলেও মেসোমশায়ের প্রয়াস সফল হোল না। বুঝলাম মাসিমার পরের কথাতেই ; ধমকে উঠলেন মেসোমশাইকে, থাম, মানুষকে আর বড়াই করে এসব জানাতে হবে না।—এরপর আমার উদ্দেশ্যে বললেন, ওর কথা ছাড়, তুমি বালিগঞ্জের সিংহদের বাড়ি দেখেছ ? ঐ বাড়ির খুব কাছেই আমাদের বাড়ি। ওখানে গিয়ে ডাক্তার হরপ্রসাদ ভুঁইয়ার নাম যাকে বলবে সে-ই তোমাকে আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ওর পরিচয় তো পেলে এবার আমার—নাম কেতকী, প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আমি কেতকী ভুঁইয়া। আমাদের একটা ছেলে দুটি মেয়ে। ছেলে হায়ার এ্যডুকেশনের জন্য ইউ, কে-তে গেছে বছর দুই আগে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন বাড়িতে আমরা দুটি প্রাণী মাত্র থাকি। নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি। এবার সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও ট্যুরটা ক্যানসেল হয়ে যাচ্ছিল। তোমার মেসোমশাই ঘুমের মধ্যে একদিন মারাদনা হয়ে গেছিল বোধহয় আর তারজন্যই আমাকে মাঝরাতে আছড়ে পড়তে হয় মেঝেতে। নেহাত ডাক্তারের বউ বলে সেরে উঠেছি তাড়াতাড়ি।

বাস ছুটে চলেছে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে। উঁচু-নিচু পথ। পথের দু'ধারে মাঠ, সেই মাঠের মাঝখানে দু'একটা পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট দেব-দেউল। আকাশে হাল্কা পেঁজা তুলোর মতন মেঘ। সূর্য এখন মধ্য গগনে। সূর্যের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ বাড়ছে। রুক্ষ মাঠের বুক চিরে পীচের রাস্তা। সর্পিল পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বাস হৃষিকেশের দিকে। শুষ্ক আঁধি

পবনদেবের ঘাড়ে চেপে যেন আমাদের সঙ্গ দেবার একান্ত বাসনা নিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের সাথে।

বিধাতার সৃষ্টি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আমার কাছে অমৃত কুম্ভ। সেই অমৃত কুম্ভের সন্ধানে এক যুগ ধরে ছুটে বেড়াচ্ছি। যা মানুষকে অমর করে অর্থাৎ যা পান করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করে তাই তো অমৃত। আমি এই যে দু'চোখ ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সুধা পান করে বুঁদ হয়ে থাকি এই তো আমার চরম পাওয়া। এই পাওয়ার মধ্যেই তো মুক্তি, যেদিন দু'চোখের তৃপ্তি সেদিনই তো আমি অমর। আমার অমৃত কুম্ভ ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির সাম্রাজ্যে। আমার ভাললাগর জগতে সকালের ঘাসের ডগার উপর একটা শিশিরবিন্দু অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে।

একক তোমার কে কে আছে?—মাসিমার দৃষ্টি জানালার বাইরে। চোখ না সরিয়েই প্রশ্ন করলেন।

বললাম, বাবা আর ছোট একটা ভাই।

বিয়ে করনি?

আমি ঠোঁটের প্রান্তে হাসি ভাসিয়ে জবাব দিলাম, ঊনপঞ্চাশের বায়ু যার ঘাড়ে চেপে আছে তার কী বিয়ে করা উচিত? এই ছন্নছাড়া জীবটাকে কে বিয়ে করবে মাসিমা!

সেকি কথা! তোমাব মত ছেলেকে আমরা হীরের টুকরো বলব না—তার থেকে অনেক বড, তুমি আমাদেব গর্ব।

না মাসিমা আপনি অনেক কিছু জানেন না আমার, আমি আজ পর্যন্ত নিজেকে বুঝে উঠতে পারিনি। কখনো মনে হয় আমি বিদেহী, শুধু দুটো চোখেরই জন্ম হয়েছিল, সেই চোখে শুধু তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণার কথা কাকে বোঝাব, কে বুঝবে, কে বিশ্বাস করবে এই তৃষ্ণার জন্য আমি বেশিদিন গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে থাকতে পারি না। যার গৃহই নেই তার গৃহিনী থাকবে কী করে মাসিমা?

কী জানি বাবা আমি এসব বুঝি না।

তুমি ওসব বুঝবে না।—মেসোমশাই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

তুমি বোঝ?—মাসিমা জানালার বাইবে থেকে দৃষ্টিটাকে সরিয়ে আনলেন মেসোমশাইযের মুখের উপব।

না আমিও ঠিক বুঝি না এসব।—স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন মেসোমশাই। ঠোঁট থেকে হাসি মিলিয়ে যাবার পর বললেন, কী করে বুঝব বল একক যা বলল তা আমার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মেলে না। মানুষের দেহই তো আসল বস্তু। দেহই আমার ভাবনা-চিন্তা ধ্যান-ধারণা। দেহকে রোগমুক্ত করা আমার কাজ।

তাই কী! অনেক সময় প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি দিয়ে নিরাময় করা যায় দেহকে। অনেকদিন পূর্বের একটা ঘটনা আজও মানসপটে প্রায়ই ভেসে ওঠে। আমি

দেখেছি একটা ছোট্ট মেয়েকে মৃত একটা গাছের কাছে বসে থাকতে। ওর ধারণা গাছটাতে একদিন ফুল ফুটবে। সত্যি একদিন সেই মরা ডালের বুকে সবুজের আবির্ভাব হোল। এটা অলৌকিক ঘটনা, নাকি সেই গাছটা যেটাকে সকলে মৃত বলে ভাবছিল সেটা আসলে বেঁচেই ছিল জানি না। হয়ত ছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছিল মেয়েটার প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি গাছটাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল। ইচ্ছা-শক্তির উৎস তো মন, মনটা মরে গেলে দেহটা বেঁচে থাকতে পারে! সে বেঁচে থাকা তো মৃত মন নিয়ে বেশ্যার দেহ দে'য়ার মত। মনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তো আমাদের ব্যস্ততা, এত ছোটাছুটি। পাখিটাই যদি না থাকে তাহলে খাঁচাটা সোনার হোলেই বা কী লাভ!

তুমি তো গল্প লেখ একক কথার জাল বোনা তোমার কাজ কিন্তু গল্প কখনো মানুষকে তাড়া করে বেড়ায় একথা শুনেছ কখনো?

আমি নিরুত্তর। কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। মেসোমশাই উত্তর প্রত্যাশা করেছেন বলে মনে হোল না কারণ কথা সমাপ্তির পর আমার কাছ থেকে উত্তর আসার মত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করে বললেন, গল্পটা বলি. তুমি তো লেখ-টেখ, দেখ কাজে দেয় কি না।

এবারও আমি কিছু বললাম না। কতক্ষণে শুরু করেন তার অপেক্ষায় থাকলাম। খুব বেশিক্ষণ সময় অতিবাহিত হোল না একটু পরেই মুখ খুললেন উনি। প্রথমে যতটা সম্ভব ঘুরে আমার মুখোমুখি হয়ে বসার চেষ্টা করলেন তারপর শুরু করলেন আরব্য রজনীর মত এক অত্যাশ্চর্য কাহিনী মেলে ধরতে।

মহানন্দ প্রসাদের জমিদারি আজ আর নেই কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরে জমিদারি না থাক প্রাসাদটা আজও দাঁড়িয়ে আছে একটা অভিশপ্ত জমিদার বংশের সাক্ষী হয়ে। ঐ প্রাসাদের পেছনে এক বিরাট জঙ্গল এখনো অনেকখানি জায়গার উপর বিস্তৃত। তখন এই জঙ্গল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আরো সুবিশাল ছিল এবং ঘনও ছিল। শোনা যায় এই জঙ্গলে প্রতি রাতেই এক নারীকণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদ। জরাজীর্ণ সেই প্রাসাদের কক্ষে এখনো চোখে পড়ে ভাঙা ঝাড়-লণ্ঠন। সেই ঝাড়-লণ্ঠনের নিচে একটা আরাম-কেদারাও দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এখন সেটাকে আরাম-কেদারা বলে সনাক্ত করা শক্ত। শুধু কয়েক খণ্ড কাঠ কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে। এটাতে মহানন্দ প্রসাদ এসে বসত সন্ধ্যে হোলেই। তার বসার সাথে সাথেই শুরু হোত গান-বাজনা। সে নিজে গাইতে পারত না কিন্তু নিজে না পারলেও সঙ্গীত তাকে আকর্ষণ করত। অনেক নামি-দামী গায়কদের সমাবেশ হোত সেখানে। গান শুনত মহানন্দ প্রসাদ এবং সেই সঙ্গে আকণ্ঠ সুরা পান করত। শুধু যে গান শুনত তা নয় গানের সঙ্গে নর্তকীর নূপুরের শব্দে মানুষটা অন্য এক জগতের মধ্যে ডুবে যেত। সোমরস দু'চোখের কোলে সামান্য রক্ত ছড়াত। প্রচুর পরিমাণে সুরা গলাধঃকরণ করেও খুব বেশি মাতাল হোত না। গান-বাজনা নাচ কিম্বা সুরাতে মানুষটা শুধু ডুবে থেকেই ক্ষান্ত হোলে এ কাহিনী অবতারণা করার

প্রয়োজন হোত না। এসব নেশার পর আরেকটা নেশা পেয়ে বসত তাকে। রাত দশটার মধ্যেই গানের আসর শেষ হোত, তারপর তার মধ্যে শ্রু হোত প্রথম রিপুর দাপাদাপি। তখন মানুষটা আব মানুষ থাকত না, হয়ে উঠত অমানুষ। শুধু বিপ্রদাস ছাড়া রাত দশটাব পব মানুষটা যেন কাউকেই বরদাস্ত করতে পারত না। বিপ্রদাস ছিল তাব ইচ্ছা পূরণ কবার হাতিয়ার। ছলে-বলে-কৌশলে বিপ্রদাস নিয়ে আসত কোনো বাবা-মা'র বুক থেকে তাদের কন্যাকে। অথবা কোনো স্বামীর গৃহ থেকে তার বধূকে, তুলে দিত মহানন্দ প্রসাদের হাতে। এক একদিন এক একজনকে ছিঁড়ে-ফুঁড়ে শেষ করে দিত মানুষটা। এ ভাবেই চলছিল। দিনের পব দিন পাপের পাল্লাটা ভারী হয়ে উঠছিল ক্রমশঃই। এত পাপ করে কেউ কোনোদিন অব্যাহতি পায়নি, মহানন্দ প্রসাদও পেল না। সে কাহিনী পরে—তার আগে অন্দরমহলে বন্দী মহানন্দ প্রসাদের স্ত্রী পদ্মাবতীর কথা না বললে এ গল্প অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পাঁচ বছর পূর্বে পদ্মাবতীকে দেখেছিল মহানন্দ প্রসাদ। তখন পদ্মাবতী সাবিত্রী নামে পরিচিত। মহানন্দ প্রসাদ শিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে-জঙ্গলে। প্রত্যেক বছরই দু'একবার বেরোয় শিকারে। মৃগয়ায় যাওয়ার মধ্যে তার কতটা উৎসাহ তা বলা শক্ত তবে সে সময়ে শিকারে না যাওয়াটা জমিদারদের কাছে খুব একটা গৌরবের ব্যাপার ছিল না। যে কারণেই হোক দলবল নিয়ে মানুষটা মৃগয়ায় যেত। বাঘ-ভাল্লুক না হোক দু'একটা হরিণ, খটাস কিম্বা খরগোশ শিকার করতে পারলেই হোল। নিদেন পক্ষে একটা দুটো বেলেহাঁস অথবা বনমুরগি হোলেও চলে আর একান্তই যদি কিছু না জোটে তাহলে ব্যর্থতার জন্য মানুষটার কতটুকু কষ্ট হোত বলা মুশকিল, মনে হয় বিশেষ কষ্ট তাকে স্পর্শ করত না। সহাস্য বদনে না হোলেও খুব বেশি মনঃকষ্ট নিয়ে দলবলসহ ফিরে আসত এ কথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না।

প্রত্যেকবারের মত একবার নিয়মমাফিক মৃগয়ায় বেরিয়েছিল মহানন্দ প্রসাদ। সেবারের যাওয়াটা অন্যান্যবারের মত ছিল না, একটা ব্যতিক্রম ছিল। অন্যান্যবার পারিষদসহ বেরিয়েছে কিন্তু সেবার একাই বেরিয়েছিল। জঙ্গলে প্রবেশ করেই সেবার তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল একটা হরিণ। ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল হরিণ আর তার মধ্যের দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য। হরিণ অনেক আগেই অদৃশ্য হয়েছে। ঐ জঙ্গলের শেষ প্রান্তে যখন সে পৌঁছল তখন মৃগের পরিবর্তে মৃগনয়না তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে প্রবেশ করেছে। মৃগনয়নাকে নিঃসন্দেহে অপরূপা আখ্যা দে'য়া যায়। যৌবনবতীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমন্ত্রণ। যেন রতির স্নেহধন্যা কন্যা ঐ রূপসী। রূপবতীর নাম সাবিত্রী। ধীবর কন্যা। কাঠ সংগ্রহের জন্য রোজই তাকে আসতে হয় এখানে। আজও এসেছিল একই উদ্দেশ্যে। হঠাৎ অশ্বক্ষুরের শব্দে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সাবিত্রী নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। ওর কাছাকাছি এসে অশ্বক্ষুরের শব্দ স্তব্ধ হয়, মহানন্দ প্রসাদ ঘোড়া

থেকে নেমে পড়ে। সাবিত্রী হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে সেখান থেকে সরে পড়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত হাঁটতে থাকে, কিন্তু বেশি দূরে যেতে পারে না। একটা প্রবল আকর্ষণে ছিটকে পড়ে মাটির উপর।

মহানন্দ প্রসাদ কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করতে পারে না। তার প্রয়োজনও নেই, স্থানটি নির্জন। অরণ্যের নিস্তব্ধতার প্রাকার বিদীর্ণ করে গ্রাম-গঞ্জের জন-কোলাহল প্রবেশ করতে পারে না। শুধু দু'একটা পাখির কূজন কিম্বা পাতার সামান্য খস্খস্ শব্দ বায়ুতরঙ্গকে আলোড়িত করে। সেদিন এই নির্জনতা কৃত্ত হোল একটা অভ্রভেদী আর্তনাদে। টু—হু—উ, টি—টি—টি-ই শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছিল, সেই শব্দ আর্তনাদের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সাবিত্রীর সংজ্ঞাহীন ক্ষতবিক্ষত নগ্ন দেহটা পড়ে থাকে ঘাসের উপর। মহানন্দ প্রসাদ ফিরে যাবার জন্য ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবং ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তখনও তার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি সাবিত্রীর অনাবৃত শরীরের উপর যেন উন্মত্ত করীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে রয়েছে।

সাবিত্রীর আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরে আসে। জ্ঞান ফেরার পরই মনে পড়ে একটু আগে কী ভাবে একটা মানুষ তার উপর ভেঙে পড়েছিল। কী ভাবে মানুষটা তার যৌবন তছনছ করে দিয়েছে তা ভাবতে গিয়ে তার অবস্থা ঝড়ে তেঁতুল পাতার মত, সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। দু'চোয়াল বেয়ে জলের দুটি ধারা নেমে এলো। পড়ে থাকা কাপড়টা শরীরের উপর কোনোরকমে টেনে এনে বলে, আপনি তো আমার সব কিছু কেড়ে নিলেন এরপর আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে—রাখবেন?

মহানন্দ প্রসাদ তখনও ঘোড়ার পিঠে ওঠেনি, অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে সাবিত্রীকে দেখছিল। সাবিত্রীর প্রশ্ন শুনে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, বল।

আপনার বন্দুকের একটা গুলি খরচা করবেন? আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না—কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল সাবিত্রী।

মহানন্দ প্রসাদ আরো কিছুটা এগিয়ে এসে সাবিত্রীকে দু'হাতে তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, তুমি আমার সাথে যাবে? তোমাকে আমি স্ত্রীর মর্যাদা দেব, কী যাবে?—মহানন্দ প্রসাদ নিজের পরিচয় দিয়ে আরো একবার শেষের কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, যাবে?

সাবিত্রী কি বলবে ভেবে পায় না, বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। মহানন্দ প্রসাদের কথাটা যেন রিনরিন করে তার কানের কাছে বাজতে থাকে। বুঝে উঠতে পারে না যা শুনছে তা ঠিক শুনছে কি না। স্বপ্ন না সত্যি বুঝে উঠতেই বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। তারপর যখন বুঝতে পারে যা শুনেছে তা ঠিকই শুনেছে তখন বলল, আমার পরিচয় জানতে চাইবেন না আপনি?

না, বংশ পরিচয়ের কথা বলছ ত'? ও সব নিয়ে ভাবি না।—মহানন্দ প্রসাদ সাবিত্রীর বাহুসন্ধিস্থলে হাত রাখল।

তবু বলি—এ পর্যন্ত বলে মুখটা আস্তে আস্তে তুলল সাবিত্রী তারপর বলল আমি জেলের মেয়ে। এটা জেনেও যদি…

সাবিত্রীকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মহানন্দ প্রসাদ বলে, হ্যাঁ জেনেও, তুমি আমার পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর গল্পটা জান?

ঘাড় নেড়ে প্রশ্নের উত্তর দেয় সাবিত্রী। কথাটা কেন বলল মানুষটা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি তার। ব্যাসদেব পদ্মাবতীকে দেখে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রথম বিপুব দংশন অনুভব করে। মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিস্ফোরণ শুরু হয়। নাসারন্ধ্র থেকে নির্গত হোতে থাকে অগ্নিস্পৃষ্ট নিঃশ্বাস। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সমস্ত শিরা-উপশিরায়, যেন হুতাশনের দহন চলতে থাকে সমস্ত দেহে। ব্যাসদেব বোঝে পদ্মাবতীকে গ্রহণ করা ছাড়া তখন তার আর কোনো বিকল্প উপায় নেই। মহানন্দ প্রসাদ যে এ কাহিনীর কথা বলতে চেয়েছেন সে বিষয়ে সংশয় নেই, শুধু মনে একটাই প্রশ্ন তার তখন—মৎসগন্ধা যে ভাবে পদ্মগন্ধা হয়েছিল অর্থাৎ যে ভাবে পদ্মাবতীর উত্তরণ হয়েছিল সে ভাবে তার উত্তরণ আসন্ন কি না। মানুষটা যে প্রতিশ্রুতি দিল সে প্রতিশ্রুতি পালন করলে তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আশাতীত সৌভাগ্যের কথা শুনে সুখের মালঞ্চে বিচরণ করতে শুরু করল যেন সাবিত্রী।

মহানন্দ প্রসাদ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। স্ত্রীর মর্যাদাই দিয়েছিল সাবিত্রীকে। শুধু তাই নয় জমিদারের স্ত্রী হয়ে থাকার জন্য তার যেটুকু যোগ্যতার দরকার ছিল সেটুকু যোগ্য করে তুলেছিল অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সাবিত্রী তখন অতীত জীবনের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলছে, নিজের নামটাও হারিয়ে ফেলল। পদ্মাবতী নামে পরিচিত হোল, মহানন্দ প্রসাদ স্ত্রীর অতীত জীবনটা নিয়ে কখনো প্রশ্ন তোলেনি বরং পদ্মাবতীরই বার বার মনে হোত মানুষটা এতখানি উদার হোল কী করে! বিশেষ করে মানুষটার চরিত্র জানার পর অবাক না হয়ে পারেনি। প্রথমে ভেবেছিল সেদিনের ঘটনাটা একটা দুর্ঘটনা। ঐ নির্জন পরিবেশে বনানীতে তার মত উদ্ভিন্ন যৌবনাকে দেখে কোনো পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য যদি ঘটে থাকে তাহোলে তাকে খুব বেশি অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়ত ন্যায়সঙ্গত হবে না কিন্তু পরে বুঝেছিল তার অনুমান অভ্রান্ত নয়, মানুষটা ব্যভিচারী। রমণীর প্রতি লোভ তার দুর্নিবার। সর্বগ্রাসী তার ক্ষুধা। প্রতিটি রমণীর শরীরের বাঁকে যেন সে অনুভব করে আমন্ত্রণ। পদ্মাবতী বুঝেছিল মানুষটার কাছে অনেক মেয়েকেই তাদের কৌমার্য বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়েছে। নাচঘরের চার দেয়ালের মধ্যে অনেক বামাকণ্ঠের আর্তনাদ বাতাসকে ভরিয়ে রেখেছে। এ কাহিনী জানার পর নিঃসন্দেহে সবাই একবাক্যে স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করবে না যে মানুষটা দুশ্চরিত্র। দুশ্চরিত্র কথাটার সংজ্ঞা কী তা জানা নেই পদ্মাবতীর কিন্তু

এটা বোঝে যে একই ব্যাপারের জন্য কারো চরিত্র নষ্ট হয় আবার কারো অক্ষত থাকে। আসলে এটা ব্যক্তিনির্ভর। সাধারণ মানুষ যা করতে পারে তা একজন ধর্মযাজক করতে পারে না। এই উপলব্ধি আছে বলেই স্বামীর কার্যকলাপের জন্য দুঃখ পেলেও ভেঙে পড়ে না পদ্মাবতী।

পদ্মাবতী মহানন্দ প্রসাদের স্ত্রী হয়ে আসার পর সকলের রানীমা হয়ে গেল। তার কাছে এ আরেক পৃথিবী। সুখের পৃথিবী, ঐশ্বর্যের পৃথিবী। এই সুখের মধ্যে একটা কষ্ট মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে আশ্রয় নেয় আর তখনই অনুভব করে একটা অস্থিরতা ওকে গ্রাস করে ফেলছে।

জমিদার বাড়ির অন্দরমহল থেকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি নাচঘর পর্যন্ত নেমে এসেছে। নাচঘর থেকে কোনো কোনোদিন নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসে অন্দরমহল পর্যন্ত। সেই আর্তনাদ শুনে পদ্মাবতী সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসেছে অনেক দিন কিন্তু ঐ পর্যন্তই, নাচঘরে প্রবেশ করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি; পদ্মাবতী অসুখী নয়, সুখ নূপুরের মত যেন তার মনের মধ্যে বাজে সর্বক্ষণ তবু এই সুখের মধ্যে একটা কষ্ট কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। প্রায়ই বিবেক তার মনের কড়া ধরে নাড়া দেয়। স্বামীকে সংযত করার ইচ্ছে, আর সেই কারণেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে আসে প্রায়ই। কিন্তু একটা ভয় তাকে এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলে যে নাচঘরের চৌকাঠে পা রাখতে গিয়েও পারে না। এই বাড়িতে পা রাখার পর জেনেছিল নাচঘরে প্রবেশ করার অধিকার তার নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ নির্দেশের বেড়া ডিঙিয়ে একদিন এসে হাজির হোতেই হোল নাচঘরে। বামাকণ্ঠের আর্তনাদ সেদিন এতই মর্মভেদী ছিল যে নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারেনি, সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা করে নেমে এসেছিল নাচঘরে। ঢুকেই দেখতে পেয়েছিল একটা কিশোরীকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ অবস্থায় মহানন্দ প্রসাদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ঘরময় ছুটোছুটি করতে। হঠাৎ পদ্মাবতীকে দেখতে পেয়ে তার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে, আমাকে বাঁচান রাণীমা—বাঁচান—রানীমা বাঁচান, ওর কান্নায় জড়ানো কণ্ঠস্বর নাচঘরের চারদেয়ালের গায়ে যেন উন্মত্ত সারমেয়র মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পদ্মাবতী বুঝতে পারে মনের গবাক্ষ উন্মুক্ত করে বিবেক যেন বলে চলেছে, পদ্মাবতী পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকো না, বাঁচাও ওকে। দর্পের হিংস্র নখরাঘাতে ওকে শেষ হতে দিও না। পদ্মাবতী নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না, বলে, ওকে ছেড়ে দাও—কণ্ঠের কাঠিন্য এমন ছিল যে তার সঙ্গে ঘন বর্ষার অসিত বর্ণের মেঘের গর্জনের সঙ্গেই একমাত্র তুলনা করা চলে। ঐ কণ্ঠস্বর শুনে মহানন্দ প্রসাদের মত মানুষ পর্যন্ত চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণের জন্য মূক হয়ে পরম বিস্ময়ে পদ্মাবতীর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। এই সময়ের মধ্যেই

পদ্মাবতী ঘরের দরজার পাল্লা খুলে দিয়ে মেয়েটাকে কক্ষ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল।

মেয়েটা বেরিয়ে যাবার পর মহানন্দ প্রসাদ নিজের মধ্যে ফিরে আসল, পদ্মাবতীকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই শেষ এরপর আর কখনো আমার নির্দেশ যেন লাঙ্ঘত না হয়, কথাটা মনে রেখ—ঘরের বাতাস যেন ছিন্নভিন্ন করে একটা বাজ এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

সেই শেষ এরপর আর কখনো পদ্মাবতী অন্দরমহল থেকে নাচঘরে নেমে আসেনি, স্বর্ণ-কারাগারে শেষ দিন পর্যন্ত বন্দী হয়ে ছিল। স্বামীকে নরকের দরজা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে চেষ্টা খুব প্রখর ছিল না। এরও কারণ ছিল, সে যে জায়গাটা অধিকার করে আছে তা স্বপ্নাতীত। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তা শুধু মহানন্দ প্রসাদের মহানুভবতার জন্য। কী হোত যদি সেদিন ঐ মানুষটা তার যৌবন তছনছ করার পর ফেলে আসত জঙ্গলে! কী হোত সে কথা ভাবলে আজও মনের ভেতরটা ভূমিকম্পের মত কেঁপে ওঠে।

মেসোমশাই এ পর্যন্ত বলে একটা সিগারেট ধরালেন, এরপর বাতাসে ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, এ গল্পের পরবর্তী অংশে পদ্মাবতীর আর কোনো ভূমিকা নেই। এরপর যদি কখনো তার আবির্ভাব ঘটে তা শুধু মাত্র মহানন্দ প্রসাদের স্ত্রী হিসাবে। এবার আসি বিপ্রদাসের কাহিনীতে। বিপ্রদাস মহানন্দ প্রসাদকে পাপের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছিল শুধু মাত্র কাঞ্চনের জন্য। কামিনীর প্রতি আকর্ষণ তার ছিল না। অর্থ উপার্জনের জন্য এরকম একটা পথ বেছে নিয়েছিল তার জায়ার অধর থেকে যাতে হাসি ঝরে না পড়ে তারজন্য। স্ত্রীকে ভালবাসত সে। যার জন্য এত কিছু তাকেই একদিন হারাতে হোল।

বিপ্রদাসের স্ত্রী ছিল সুন্দরী। তার শরীর ছিল রূপলাবণ্যের ভাণ্ডার। অধর যুক্ত না থাকলে দেখা যেত সিত বলাকা সারিবন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুক্ত থাকলে মনে হোত মেঘের সীমানায় রৌপ্যসদৃশ্য আলোর ঝিলিক। চোখের তারায় কী ছিল বলা শক্ত তবে পরকীয়া প্রেম যারা গর্হিত কাজ বলে মনে করেন তারা তার চোখের তারায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখবার চেষ্টা করবেন না এ কথা বলা কতটা ঠিক হবে তা বলা একেবারেই অসম্ভব। বিপ্রদাসের স্ত্রীর মধ্যে যা ছিল তাকে এক কথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বলা যেতে পারে।

মহানন্দ প্রসাদের দৃষ্টি একদিন বিপ্রদাসের স্ত্রীকে স্পর্শ করল। দেখেই বুঝল এরকম একটা অগ্নিশিখার উত্তাপে নিজেকে দগ্ধ না করতে পারলে শান্তি নেই। শুধু চোখে দেখেই তার কামনার সলতেতে আগুন ধরে যায়। শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা বন্য বরাহের মত দাপাদাপি শুরু করে। সেই সঙ্গে ভাবে যে শুক্তিটা নিয়ে সে খেলে বেড়ায় তারমধ্যেই মুক্তো আছে এ কথা এতদিন কেন সে জানতে পারেনি! প্রথম রিপুর দংশন জ্বালায় অস্থির হোয়ে ওঠে মহানন্দ প্রসাদ। শেষ পর্যন্ত বিপ্রদাসের সরবরের প্রস্ফুটিত বিসটির দিকে হাত না বাড়িয়ে উপায়

থাকল না তার। বিপ্রদাসকে একটা কাজ দিয়ে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তার স্ত্রীকে লেঠেল দিয়ে তুলে আনে নাচঘরে। এরপর উপোসী পশুর মত হিংস্র থাবায় ক্ষত-বিক্ষত করে তাকে। কামনার আগুনের শিখাটা নিভে যাওয়ার পর বিপ্রদাসের স্ত্রীর কণ্ঠনালীটা সজোরে চেপে ধরে। একটা নিশিত আর্তনাদ শুধু নাচঘরেই মাথা ঠুকে ক্ষান্ত হয় না আছড়ে পড়ে বনানীর নীরাবতার প্রাচীরের উপর। বুঝি সেই আর্তনাদের তীব্রতা এতই ভয়ংকর ছিল যে গাছের শাখা-প্রশাখায় যে সব ভীরু বিহঙ্গ বিশ্রাম গ্রহণ করছিল তাদের হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুকানি স্তব্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। তারা আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এক সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল। ভোর হবার আগেই মহানন্দ প্রসাদের নির্দেশে একটা নিরীহ বধূর নিষ্প্রাণ দেহকে লেঠেলরা পুঁতে রেখে আসে বাড়ির পেছনের বাগানে।

মেসোমশাই এ পর্যন্ত বলে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কী একক খারাপ লাগছে না ত'? লাগলে বল এখানেই তাহোলে যবনিকা নামাই।

বললাম, খারাপ কী বলছেন ভীষণভাবে টেনে রেখেছে।

সত্যি বলছ ত'?

অনুগ্রহ করে আমাকে অবিশ্বাস করবেন না।—মেসোমশাইকে যা জানিয়েছি প্রথমেই তা বর্ণে বর্ণে সত্যি। এতক্ষণ আমি গল্পের মধ্যে এমনই ডুবেছিলাম যে গল্প আরম্ভ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত একবারও জানালার বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিনি। রথ দেখতে কলা বেচা বন্ধ। কত মনোরম দৃশ্য না জানি অতিক্রম করে এসেছি। এ কথা ভেবে এবার থেকে কান আর চোখ দুটোকেই সজাগ রাখার সংকল্প করে জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টিকে সরিয়ে না নিয়ে এসে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম গল্পের পরবর্তী অংশের জন্য।

রুক্ষ মাটির বুকে পীচঢালা অসমতল পথ, সেই পথ ধরে ছুটে চলেছে বাস। রোদের উত্তাপে বাতাস ক্রমশই তেতে উঠেছে, উত্তপ্ত বাতাস আছড়ে পড়ছে চোখে-মুখে। এই উত্তাপের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য অনেকে জানালার নিকষ কালো কাঁচের শার্শি নামিয়ে দিয়েছে। বাইরের দৃশ্যের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করার ইচ্ছে আমার নেই আর এই কারণেই বাতাসের অশান্ত উষ্ণ চুম্বন অবাধে বর্ষিত হতে থাকল আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর। জানালার শার্শি নামাতে পারলাম না। সম্ভবত আমার মত মাসিমা-মেসোমশাইও প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাড়ি গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে ইচ্ছুক নয়।

বাংলাদেশের মত সবুজের সমারোহ এখানে নেই। ধূসর দিগন্ত; আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণের জন্য মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। অচেনা পাখিদের কাকলি বাতাসকে ভরিয়ে রেখেছে। অবশ্য সব পাখিই যে অচেনা তা নয় আমার পরিচিত কয়েকটি পাখি ঐ-সব পক্ষিকুলের মধ্যে বিরাজমান তবে তারা এখানে যেন অন্য রকম। কলকাতায় আমরা জাতীয় বিহঙ্গকে অবশ্যই দেখেছি কিন্তু স্বাধীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ এখানকার মাঠে-ঘাটে

দেখতে পেলাম রংয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে জাতীয় পাখি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এছাড়া আরো এক শ্রেণীর পক্ষী সম্প্রদায় আমার অতি পরিচিত। বঙ্গে এরা পরভৃৎ, এখানে এই পক্ষী সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে পুরোমাত্রায় অবাঙ্গালী। চিনতে অসুবিধা না হোলেও অনেক অমিল চোখে পড়ে।

মেসোমশাই হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা হুস্ হুস্ করে টেনে যাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে মনে হলো কোনো কিছুর মধ্যে ভীষণভাবে ডুবে আছেন। হয়ত গল্পের পরবর্তী অংশের উপস্থাপনা কী ভাবে করবেন সেটা ভেবে চলেছেন! আমার অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। খুব বেশি সময় অতিবাহিত হলো না পাঁচ-সাত মিনিট পর মুখ খুললেন উনি। বলতে আরম্ভ করলেন মহানন্দ প্রসাদের অসম্পূর্ণ কাহিনী।

বিপ্রদাস ফিরে আসার পর জায়াকে দেখতে পেল না তার ঘরে। কোথায় গেছে কখন গেছে সে সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া গেল না কারো কাছ থেকেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন সন্ধান না পেয়ে বিপ্রদাস প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। মাসাধিক পর হঠাৎ একদিন দেখতে পেল, কাপড়ের একটা ছেঁড়া অংশ আটকে আছে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে। দেখেই চিনল, কাপড়ের ছেঁড়া অংশটা যে তার স্ত্রীর কাপড়েরই একাংশ সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না। জমিদার বাড়ির বাগানের ঐ কাপড়ের টুকরোটা দেখে তার বুঝতে বাকি থাকল না স্ত্রীর অন্তর্ধানের কারণটা। নিজের মনে মনে চিৎকার করে বলল, মহানন্দ প্রসাদ বিপ্রদাসকে তুমি এখনো চেননি এটা আশ্চর্যের ব্যাপার, এবার দেখতে পাবে সে কত বড় শয়তান। নিজের কবর নিজে হাতে খুঁড়লে মহানন্দ প্রসাদ! স্ত্রীর মৃত্যুর রহস্যটা আবিষ্কার করার পর থেকে বিপ্রদাস দিবারাত্র ভাবতে থাকে কী ভাবে মহানন্দ প্রসাদকে নিয়ে যাওয়া যায় সেখানে যেখানে সে অনুভব করবে হাজার হাজার বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা। দিবারাত্র যখন এ কথাই ভাবছে তখন এ সময়কালের মধ্যেই একদিন মতিয়া সাহানীর সাথে পরিচয় হয়। মতিয়া বছর তিনেক পূর্বে তার স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর ও বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর বাতাস নিয়ে ফুসফুস পূর্ণ করতে হলে তাকে কী করতে হবে। বুঝেছিল তার কাছে বেঁচে থাকার জন্য একটি পথই খোলা আছে। পুরুষের আদিম রিপুতে বিস্ফোরণ ঘটাবার মত একটা দেহের অধিকারিণী ও। এই দেহের উপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে হবে ওকে।

বিপ্রদাস একটা ধারাল অস্ত্র পেয়ে খুশি, মতিয়াকে দিয়ে ধ্বংস করতে হবে মহানন্দ প্রসাদকে। একটা পরিকল্পিত পথ ধরে এগোতে শুরু করে সে।

আলাপ হবার কয়েক দিন পর মতিয়া বুঝতে পারে অনেক পুরুষদের সাথে বিপ্রদাসের একটা জায়গায় অমিল আছে। নারীর প্রতি আকর্ষণ অনেকের মত না। সহজাত একটা আকর্ষণ নারীর প্রতি পুরুষের থাকেই, এটাই স্বাভাবিক, এটাই চিরন্তন সত্য। ইট ইস এ্যাক্সিওম্; কিন্তু প্রত্যেক পুরুষ নারীকে এক ভাবে কামনা করে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে পুরুষ, এক একজনকে এক

এক ভাবে। নারী কখনো ভোগ্য সামগ্রী, কখনো শক্তির উৎস আবার কখনো কল্যাণময়ী। প্রত্যেকটা রূপই বর্তমান এক একজন রমণীর মধ্যে, যে যেভাবে দেখে তার কাছে সে সে-রূপেই আত্মপ্রকাশ করে অথবা করতে হয়, এটাই বিধিলিপি। কেউ বলে যাকে রমণ করা হয় সেই রমণী আবার কেউ বলে তা নয়, যে রমণীয় সেই রমণী। কথাটার ব্যুৎপত্তি যে-ভাবেই হোক বিপ্রদাস তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাকে নারী-বিদ্বেষী কখনই বলা চলে না এবং সেই সঙ্গে নারী তার মনের মালঞ্চে সর্বক্ষণ বিচরণ করে এ কথা বলাও চলে না। স্বাভাবিক নিয়মে যে ভাবে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং পৃথিবী যে ভাবে আবর্তিত হয়, সে ভাবে নিয়মের বেড়া না ডিঙিয়ে নারীর প্রতি আকর্ষিত হয় বিপ্রদাস। এটা বুঝতে খুব বেশিদিন সময় লাগে না মতিয়ার। আর এই কারণেই মানুষটার প্রতি একটা দুর্বলতা আশ্রয় নিয়ে আছে ওর মনের মধ্যে। বিপ্রদাসের সাথে পরিচিত হবার কয়েক দিন পর মতিয়া একদিন ওর বাড়ি গিয়ে হাজির হয়। বিপত্নীক মানুষটা যে আস্তানায় থাকে সেখানে তাকে সঙ্গ দেয় কয়েকটা চড়ুই এবং কয়েকটা জংলি পায়রা। আস্তানাটা নিঃসন্দেহে কয়েক যুগ ধরে রোদ-জলে ভিজে ভিজে ভগ্নস্তূপে পরিণত হবার অপেক্ষায় আছে! বাড়িটার শরীরে যে এক সময় লাবণ্য ছিল এটা এত বছর পরও অনুমান করা যেতে পারে। এরকম একটা বাড়ির প্রতি এতটা নির্মম কেন ছিলেন বাড়ির মালিক তার কারণ বোধগম্য হোল না মতিয়ার। যাই হোক বাড়ি নিয়ে গবেষণা করার খুব বেশি অবসর নেই, আকাশ ফুটো হয়ে জলের বর্শা যে ভাবে মতিয়াকে অস্থির করে তুলেছে তাতে বেশিক্ষণ অভ্রের নিচে মস্তক রাখার যৌক্তিকতা খুঁজে না পেয়ে দরজার কড়া ধরে নাড়া দিতে থাকল খুব দ্রুত। শুধু বৃষ্টিই নয় অন্ধকারও ঝাঁপিয়ে পড়ছে, একজন মেয়েমানুষ এরকম পাণ্ডববর্জিত স্থানে কতটা অসহায় বোধ করে তা সহজেই অনুমেয়। এক নাগাড়ে খুব দ্রুত কড়া নাড়তে থাকল মতিয়া। সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর বিপ্রদাস দরজা খুলল, খুলেই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, আপনি?

আমি কী এ ভাবে সিক্ত বসনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দেব? ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি কী পাওয়া যাবে?

আসুন আসুন,—বলেই বিপ্রদাস দরজা থেকে সরে দাঁড়াল।

মতিয়া ভেতরে ঢুকে দরজার একপাশে দাঁড়াল। তার গা বেয়ে তখন জল ঝরছে। ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আমি কী এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকব? নড়াচড়া করলেই আপনার ঘর ভিজবে, কাপড়-টাপর কিছু দেবেন না কি ······

মতিয়াকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিপ্রদাস বলে, আমার ধুতি আর পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছু নেই সুতরাং এতে যদি আপনার অসুবিধা না হয় তাহোলে এনে দিতে পারি।

কেন আপনার স্ত্রীর কোনো শাড়ি নেই?

আছে কিন্তু সে সব দেওয়া সম্ভব নয়, কিছু মনে করবেন না আমার স্ত্রীর

কোনো কিছুই কাউকে ব্যবহার করতে দিতে চাই না। একটা সেণ্টিমেণ্ট জড়িয়ে আছে ঐ সব জিনিসের সঙ্গে। কী কিছু মনে করলেন ?

মতিয়া কথার জবাব না দিয়ে ঠোঁট বিযুক্ত না করেই হাসল প্রথম তারপর বলল, ঠিক আছে যা দেবেন দিন আর এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

বিপ্রদাস ট্রাঙ্ক খুলে ধুতি আর পাঞ্জাবী বার করে দিয়ে বলল আমার একটি মাত্র ঘর—বাইরে যাচ্ছি, হয়ে গেলে বলবেন।

বিপ্রদাস বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতে যায় কিন্তু তার আগেই মতিয়া বলে ওঠে, বাইরে বৃষ্টিতে ভিজে যাবেন বরং আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এখানেই থাকুন—মতিয়া বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল বটে কিন্তু নিজেই হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিল।

আলো নিভিয়ে দে'য়ার পব সমস্ত ঘরটা যে একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল তা নয়, বাইরের ক্ষীণ আলো মিশে থাকল অন্ধকারের সাথে। মতিয়া তারই মধ্যে একে একে সমস্ত জামা-কাপড খুলে ফেলল।

পোশাক পরিবর্তন করার সময় মতিয়ার প্রায় অনাবৃত দেহটার উপর চোখ চলে এসেছিল বিপ্রদাসের। পরিবেশের শিকার মানুষকে হতেই হয়, না হয়ে উপায় নেই। আর এটাকে পুরুষ মানুষের লাম্পট্য বলে মনে করা ঠিক নয়। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার ঘর, এই পরিবেশে প্রায় অনাবৃত এক রমণী যার শরীরে আছে বিপদজনক বাঁক, যা খুব কম মেয়েরই আছে তার দেহের আমন্ত্রণ কী ভাবে উপেক্ষা করবে বিপ্রদাস। তার রক্তের অণুপরমাণুতে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। ঘন মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যেভাবে আগুনের ঝলক আত্মপ্রকাশ করে সে ভাবে কামনার দাবানল আত্মপ্রকাশ করে মানুষটাকে অস্থির করে তুলল। নিজেকে নিয়ে কী করবে ভেবে পেল না বিপ্রদাস।

মতিয়া পোশাক পরিবর্তন করার পর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল বিপ্রদাসের কাছে, ঘরের আলো তখনও অন্ধকারকে শুষে নিতে পারেনি অর্থাৎ মতিয়া আলো না জেবলেই বিপ্রদাসেব কাছে চলে এসেছিল। এতক্ষণ দূর থেকে চোখ দিয়ে অন্ধকার সবিয়ে সরিয়ে দেখছিল বিপ্রদাস, কাছে আসতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল মতিয়ার শরীর। যদিও ওর শরীরটা এখন নিরাবরণ নয় তবু তার শরীরের রহস্য উদ্ঘাটন করার প্রচণ্ড ইচ্ছা বিপ্রদাসের মনাঙ্গন থেকে মণিকোঠায় প্রবেশ করতে শুরু করল। মতিয়ার চোখে ধরা পড়ল সব কিছু। তার মনেও তখন রতি আশ্রয় গ্রহণ করেছে। একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে। বুঝতে পারছিল আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত গলিত লাভা তার সংযমের বাঁধকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত। বিপ্রদাসের চোখের তারায় তারই ইঙ্গিত পেয়ে বলল, কী দেখছেন!—সেই সঙ্গে দু'ঠোঁটের মাঝে হাসির একটা রেখা ভেসে উঠল।

নারীর এ কণ্ঠস্বরে কী আছে তা জানা বিপ্রদাসের। ঐ ভাবেই ব্যক্ত হয় রমণীর অন্তরের অনুচ্চারিত ভাষা। লজ্জার দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ত' নয়ই

এমনকি দরজা খুলেও বেরিয়ে আসতে পারে না নারী। শুধু সন্তর্পণে যেন দরজার ছিটকিনি নামিয়ে দেয়। দিয়ে অপেক্ষা করে থাকে কখন পুরুষ দস্যুর মত হুড়মুড় করে দু'হাতে দরজা খুলে ঢুকে তাকে নিষ্পেষিত করবে। ভাললাগাকে নামিয়ে আনবে শরীরের মধ্যে। এটা জানে বিপ্রদাস। মতিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝল কিসের আমন্ত্রণ তার কণ্ঠে। খাটের একপাশে বসে ছিল সে। মতিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতেই উঠে দাঁড়াল প্রথমে, এরপর কয়েক পা এগিয়ে এসে মতিয়ার বাহুসন্ধিস্থল দুটি দু'হাতে ধরে বলল, কী দেখছি বোঝ না? যদি বুঝে থাক তাহোলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কী?—মতিয়ার চোখ দুটি স্থির হয়ে থাকে বিপ্রদাসের চোখের উপর।

তোমাকে অপমান করছি না ত?

না।

তোমার মধ্যে হারিয়ে যেতে পারব ত'?

জানি না।

বিপ্রদাস মতিয়ার অধর সুধা নিঙরে নিতে চাইল তার সর্বগ্রাসী ঠোঁট দুটো নামিয়ে এনে।

বাইরে বৃষ্টি আর ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য। সমস্ত বিশ্ব-সংসার যেন ভেসে যাবে। মাঝে মাঝেই নীরবতাকে ছিঁড়ে বজ্রপাত হচ্ছিল। শর্বরীর আঁচলের নিচে মতিয়া আর বিপ্রদাস দুটি দীপশিখার মত তিরতির করে কাঁপছিল। গনগনে আঁচে বসানো কোনো পাত্রে তরল পদার্থ ভেঙে পড়ার আগে যে ভাবে ফুলে ফুলে ওঠে সে ভাবে ফুলে ফুলে উঠছিল দু'জনই। বিপ্রদাস উত্তাল নদীর মত প্রবাহিত হচ্ছিল আর মতিয়া সে নদীর মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইছিল, হারিয়ে যেতে চাইছিল। বাইরে বৃষ্টি আর ঘরে দুটি প্রাণী দেহের সুখে সুখী।

মতিয়া সে রাতে ফিরে যেতে পারে না। রাত কখন গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে তা বুঝতেই পারেনি ও। তখন কানায় কানায় পূর্ণ হওয়ার সুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জড়িয়ে আছে। অন্য কিছু ভাববার মত অবকাশ কিম্বা ইচ্ছে কোনটাই তার নেই।

ঘরের ভেতরের ঝড়ের সমাপ্তির পর বিপ্রদাসের মনের ভেতরকার ঝড় যেন শতগুণ বেড়ে গেল। মতিয়াকে জানাল সে কথা। মহানন্দ প্রসাদের কাহিনী ব্যক্ত করল তার কাছে। মতিয়াও জানাল তার কথা। আজ তার বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়—দেহ। কিন্তু বহুবল্লভা হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না। প্রতিদিন কাদা অঙ্গে মেখে বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার নেই। তবু দেহই তার উপার্জনের একমাত্র পথ, দেহটাকে প্রদর্শন করে অর্থ রোজগার করতে হয় ওকে। পুরুষ তাকে কী ভাবে পেতে চায় তা ভাল ভাবেই জানে মতিয়া। সুদক্ষ দাবারুর মত সতর্ক দৃষ্টি আর বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তাকে। প্রতি মুহূর্তে সংগ্রামী অসিলতা দিয়ে বিপদকে কেটে কেটে নিষ্কণ্টক পথ তৈরি করে যেতে হচ্ছে।

এখনো পর্যন্ত এভাবেই বেঁচে আছে সে। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।

বিপ্রদাস শুনল। গভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল মতিয়ার দিকে। খোদাই করা পাথরের মূর্তির মত নিষ্পলক তার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি দেখে মতিয়া প্রশ্ন করল, কী দেখছ ?

এ প্রশ্ন আগেও করেছে তবে এবার কণ্ঠস্বর অন্য রকম। বিপ্রদাস বলল, তোমার কী অনুশোচনা হচ্ছে ?

না-না আমি সে কথা বলিনি। কাল আমি···।—মতিয়া কথাটা শেষ না করে বিপ্রদাসের হাতের উপর তার হাতটা নামিয়ে এনে রাখে। এই স্পর্শের মধ্য দিয়েই তার অব্যক্ত কথা প্রকাশ পায়।

ফ্রীজ থেকে জমাট কিছু বার করে আনার পর বাইরের উষ্ণতায় তার যেরকম চেহারার কাঠিন্য অন্তর্হিত হতে থাকে সেরকম বিপ্রদাসের চেহারার মধ্যে এলো পরিবর্তন। অনেক সহজ-সরল হয়ে সে বলল, মতি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার—করবে ?

মতিয়া তার কথা শুনে হাসল প্রথম তারপর বলল, তোমার জন্য আমি মরতেও পারব বোধহয়, বল।

বিপ্রদাস জানায় কী ভাবে মহানন্দ প্রসাদকে ধ্বংস করতে হবে।

এ পর্যন্ত বলার পর মেসোমশাই গল্প বলা বন্ধ করলেন। আমরা পেঁছে গেলাম হৃষিকেশে। বাসের চাকা থেমে যেতেই একে একে প্রত্যেকেই নেমে পড়লাম। চন্দ্রা প্রথমেই নেমে পড়েছিল এবং কয়েক গজ পথ অতিক্রম করে ফেলেছিল ইতিমধ্যেই। সেখান থেকে সামান্য গলা চড়িয়ে আমাকে ডাকল। আমি ডাক শুনে মুখ তুলতেই দেখতে পেলাম ওকে এবং সেই সঙ্গে ওর পাশে দণ্ডায়মান বিয়াসকেও। বিয়াসের চোখে চোখ পড়তেই বুঝলাম সে-ও আমাকে তাদের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে। অতএব পদযুগলকে কিছুটা অধিক মাত্রায় ব্যস্ত করে তুলে ওদের নিকটবর্তী হতেই হল। পেঁছতেই চন্দ্রা বলল, বুড়োদের সাথে ত' বেশ জমিয়ে বসেছিলে—ভাল-লাগছিল ?

বুড়োদের সাথে জমিয়ে বসা যায় না বুঝি ? তা কাদের সঙ্গে বসা যায় সমবয়সীদের সঙ্গে ? তাহলে ত' তোমার সঙ্গেও আমার বাক্যালাপ বন্ধ করে দিতে হয়।

চন্দ্রা আমার বক্তব্য শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ থেকে সরে গেল, বলল, কী কথা হচ্ছিল এত ?

আমরা হেঁটে চলেছি লছমনঝোলা সেতুর উপর দিয়ে, নিচে খরস্রোতা গঙ্গা, সেতুর অপর প্রান্তে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজের সমারোহ। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত সবুজের স্পর্শ গায়ে মেখে পাহাড়ের বিস্তার। এরমধ্যে অসংখ্য দেবদেউল। হৃষিকেশের ধড়ার মত এই পাহাড় ভাললাগার

উপকরণে সমৃদ্ধ। দু' চোখ ভরে এই দৃশ্য গ্রহণের প্রয়াস চালাতে চালাতে চন্দ্রার প্রশ্নের জবাব দিলাম। বললাম, মেসোমশাই এক অত্যাশ্চর্য কাহিনীর পাণ্ডুলিপি যেন এতক্ষণ পড়ে শোনাচ্ছিলেন আমাকে। অপূর্ব সে কাহিনী। রাগ যদি না কর তাহলে একটা কথা বলতে পারি।

বিয়াস কোনো কথা বলছিল না নীরবে হেঁটে আসছিল এতক্ষণ, আমার মুখ নিঃসৃত কথার পরও মুখ খুলল না তবে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ফেলল আমার মুখের উপর। সে দৃষ্টির মধ্যে কিছু বক্তব্য ব্যক্ত করার ইচ্ছে আছে যা হয়ত চন্দ্রার সঙ্গে কথোপকথনের পর আত্মপ্রকাশ করবে, আমার এরকমই মনে হল।

বল রাগ করব না।

আসার সময় কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের সঙ্গ হারিয়েছিলাম কিন্তু তারজন্য এখন আর আমার কোনো দঃখ নেই বরং মেসোমশাই মাসিমার সান্নিধ্য পাওয়ায় কৃতার্থ বোধ করছি।

বিয়াস এবার আমার কথার জবাব দিল, বলল, আপনার কথায় আমি আহত হইনি। আমার কৌতূহল হচ্ছে কী এমন কাহিনী শোনালেন ভদ্রলোক যার জন্য আপনার মুখে এরকম বচন শুনতে হচ্ছে আমাদের।

চন্দ্রা আমার কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছিল প্রথমে পরে বিয়াসের কথা শুনে তার ক্ষোভ অন্তর্হিত হলো, বলল জানাবে কী এত তন্ময় হয়ে শুনছিলে বাসে ?

যে কাহিনী মেসোমশাইর কাছ থেকে জেনেছি তা ওকে বলা যায় না তাই বললাম, চন্দ্রা তোমার বয়সের কথা ভেবে সে কাহিনী শোনাতে পারছি না তবে একদিন জানতে পারবে। যা শুনেছি তা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে রাখব, বড় হয়ে পড়ে নিও।

আচ্ছা এককবাবু এর আগে এদিকে এসেছেন কখনো ?—প্রশ্ন করল বিয়াস।

বললাম, একাধিকবার। যতবারই আসি না কেন প্রত্যেকবারেই যেন ভাললাগার অর্ঘ্য সাজিয়ে বসে থাকে প্রকৃতি। আমরা এখন যে সময়ে এসেছি সে সময়ে প্রকৃতির যে রূপ চোখে পড়ে অন্য সময় সে রূপে তাকে দেখা যায় না। রোদ উৎসে ফিরে যাবার পর যখন ধূসর গোধূলি সমস্ত অঞ্চলটাকে ঘিরে রাখে তখন অন্য রকম মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে দেব-দেউলগুলিতে টিপ্‌টিপ করে দীপশিখা জ্বলতে থাকে। এ সময় স্বর্গ মর্ত যেন এক হতে শুরু করে, যেন দেবালয় থেকে অসংখ্য দেবদেবী নেমে আসতে শুরু করে দেবদেউলগুলিতে। এরপর সময়ের মসৃণ পথ ধরে গোধূলি গড়িয়ে যায়, আস্তে আস্তে অসিতের গর্ভে হারিয়ে যায়। তখন আঁধার যেন বিহঙ্গের মত পাখা মেলে আসে এ অঞ্চলের উপর। জানি না কোথা থেকে ভেসে আসে শীকর। খুব সামান্যই তবু স্পর্শ অনুভব করা যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

আমরা কথা বলতে বলতে লছমনঝোলার সেতু অতিক্রম করে আসলাম। সেতুর যে প্রান্তে আমরা এসে দাঁড়ালাম সেখানে এক বহুতল সৌধ যেন অম্বরের সঙ্গে আলাপরত। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এই সৌধের শীর্ষে পৌঁছে যে

কোনো মানুষেরই দৃষ্টি স্পর্শ করবে হৃষিকেশের সীমারেখা। শুধু উচ্চতাই এ বাড়িটার বৈশিষ্ট নয়, এ বাড়িতে যেন নির্জর সপরিবারে অবস্থান করছেন। এত দেবদেবী সম্ভবত আর কোথাও একসঙ্গে দেখা যায় না। ঐ গগনচুম্বী সুরালয় দর্শন করে এসে রাস্তায় পা দিয়ে বিয়াস বলল, জানেন যত দেখছি ততই যেন মনে হচ্ছে ভরে উঠছি, অসম্ভব ভাল লাগছে। আপনি সঙ্গে না থাকলে এতটা ভাল লাগত কিনা সন্দেহ আছে। এর কারণ কী জানেন ?

কী ?

সবই দেখা হোত ঠিকই কিন্তু অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। অনেক অজানা বিষয় জানতে পারছি আপনি সঙ্গে আছেন বলে।

বিয়াস কথা বলার সময় বার বার আমার মুখের উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি ওর কথার পৃষ্ঠে যে কথা বলব বলে ঠিক করলাম তা বলতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আসলে কথাটা বলার জন্য মুখ তুলতেই রাস্তার উপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল, ফলে আমার পায়ের নীচের একটা পাথর বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসল। সামান্যতম সুযোগ না দিয়ে পা-টাকে শূন্যে রেখেই স্থানচ্যুত হোল। আমি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যচ্ছিলাম বিয়াস আমাকে ধরে ফেলল। পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে ওর দুটি হাত বেষ্টন করল আমাকে। আমার আর ওর শরীরের মধ্যে ব্যবধান থাকল না অল্প সময়ের জন্য। এ স্পর্শ অনিচ্ছাকৃত তবু বিয়াস লজ্জা পেল। রূপসীর পেলব অঙ্গ পীড়িত হোলে নারীর স্বাভাবিকতা বজায় না থাকারই কথা, অনিচ্ছাকৃত হোলে পুরুষের অবস্থা অনুরূপ হবে না এ কথা বলা সমীচীন নয়। কার কী হয় বলতে পারব না, তবে আমি কিছুক্ষণের জন্য ওর মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। মুখ নামিয়ে নেবার আগে দেখেছিলাম বিয়াসের মুখ রক্ত-বর্ণ। চন্দ্রা নিঃসন্দেহে কিশোরী, এই বয়সে অনেক কিছু অস্পষ্ট তবু নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা আছে তা ঐ বয়সে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত থাকে সে কথা ঠিক নয়। ইচ্ছাকৃতই হোক আর অনিচ্ছাকৃতই হোক নারী-পুরুষের এরকম শারীরিক সান্নিধ্য তার মনে বিন্দুমাত্র ঝড় তুলবে না একথা ভাবা নিতান্তই বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত তা প্রমাণিত হোল অর্থাৎ চন্দ্রার চোখের তারায় দেখলাম একটা অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল। সম্ভবত আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়াটা জানার ইচ্ছে। সুখ না অস্বস্তি আমাদের মনের অঙ্গনে হয়ত এরকম কিছু জানতে চাইছে। ঐ অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য আমি নীরবে প্রহর গুনতে পারলাম না, কথা না বলে নীরবতাকে দীর্ঘায়িত করলে যে স্বাভাবিক হতে পারব এরকম কোনো নিশ্চয়তা আছে বলেও মনে হল না আমার। বুঝলাম কিছু বলা প্রয়োজন। হয়ত কথার ফ্রেমে স্বাভাবিক অবস্থাকে বাঁধিয়ে ফেলতে পারব। এরকম একটা বিশ্বাস নিয়ে বিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললাম, মনে হয় এখন আমাদের কিছুটা দ্রুত পদচালনার প্রয়োজন, আমরা কিন্তু ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছি।

তা হোক তবু তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারব না আমি। তাছাড়া দলছুট হবার সম্ভাবনা নেই কারণ এ পথ শেষ হয়েছে গীতা ভবনের দ্বারে গিয়ে।

আমার কথার উত্তর আসলো চন্দ্রার কাছ থেকে। আমি চাইছিলাম বিয়াস কিছু বলুক। ওর কিছু বলা একান্তই আবশ্যক, ও কথা বললে আমি সহজ হয়ে ওর দিকে তাকাতে পারব এবং ও নিজেও অনেক সহজ হয়ে উঠতে পারবে। ওকে কথা বলাবার প্রয়াসে আমি বললাম, বিয়াসের জলোচ্ছ্বাস হঠাৎ থেমে গেল কেন বুঝতে পারছি না!

বিয়াস আস্তে আস্তে মুখ তুলল, একবার মাত্র চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকাল তারপর দৃষ্টি সামনে প্রসারিত রেখে বলল, আমি এমন একটা কথা বলে আপনার কথার জবাব দিতে চাই যা শুনলে বুঝতে পারতেন নীরবতাকে কেন অক্ষুন্ন রেখেছি এতক্ষণ।

সে কথাটা বলতে বিলম্ব কেন? বাধাটা কোথায়?

আসলে কথাটা বলা খুব সহজ নয়, আমার মত মেয়ে যার কথায় কোনো লাগাম নেই বলে বদনাম আছে তার পর্যন্ত কথাটা জানাতে রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কী বন্ধুত্ব না হোলে সে কথা বলা যায় কিনা বুঝে উঠতে পারছি না।

বেশ ত' এখন থেকে আমরা বন্ধু, এবার আর অসুবিধা নেই ত'?

একজন সাহিত্যিকের বন্ধুত্ব মনে হয় সকলেরই কাম্য সুতরাং আমি বন্ধুত্বের হাতটা পুরোপুরি প্রসারিত করে দিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করব না।

তাহোলে আপনাকে তুমি বলা যায়?

যায়।

আর তুমি?

বিয়াস আমার কথা শুনে হেসে ফেলল, বলল, তুমি তুমি বলবে আর আমি আপনি বলব!

তাহোলে কথাটা বল এবার।

বিয়াস চোখের মণি সরিয়ে চন্দ্রার দিকে তার অজ্ঞাতে তাকাল এরপর বলল, এখন থাক পরে বলব।—এ পর্যন্ত বলে অন্য প্রসঙ্গে চলে আসল, বলল, সূর্যের তাপ দেখেছ, যা তাপ আমাদের পুড়িয়ে মারবে।

আমি কিছুটা সরে ঘন হয়ে বিয়াসের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললাম, এ জন্যই কী মুখে এত রক্ত উঠে এসেছে?

এখনো মুখ রাঙা হয়ে আছে!—কথাটা বলে হাসল বিয়াস।

তোমার একথার কী অর্থ দাঁড়াল জানো?

খুব নির্লজ্জ মনে হচ্ছে আমাকে—না?

বন্ধুত্ব ঘন হবার আগেই ভেঙে যাক এটা আমার কাম্য নয়।

তার মানে আমি নির্লজ্জ?

আমি সে কথা বলিনি।

নিশ্চয়ই বলেছ। বন্ধুত্ব ঘন হবার আগে ভেঙে যেতে পারে যে কথায় তা তুমি বলতে চাইছ না এতে কী বুঝব? আমি নির্লজ্জ এ কথাই-ত' বলতে হোত!

না তা নয়, আমার কথা বলতে হোত, সে কথা শুনলে তুমি রেগে যেতে পার।

আমার উপর দ্বিতীয় রিপুর আধিপত্য বিস্তার খুব বেশি করতে পারে না তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পার।

তোমার ভয় হচ্ছে না?

ভয়! না তোমাকে ভয় পাওয়ার মত কারণ আমি খুঁজে পাইনি।

যে কোনো মেয়েরই ভয় পাওয়ার কথা কারণ কথা যেভাবে গড়িয়ে চলেছে তাতে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে কী ধরনের কথা বলব আমি।

তা ঠিক তবু তোমাকে আমার একটুও ভয় নেই। কেন জানো?

কেন?

তুমি যে বৌদির কথা বলেছিলে সে কথা না শুনলে ভয় পেতাম হয়ত। আচ্ছা সে বৌদি সুন্দরী ছিল?

ছিল।

বয়স খুব বেশী ছিল?

মোটেই নয়, তোমার থেকে বড় না-ও হতে পারে।

এ সব জানার পর তোমাকে ভয় পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

চন্দ্রা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল সেই অবসরেই আমার আর বিয়াসের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল। বিয়সের শেষের কথাটার পর আমি কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না, চন্দ্রা দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের আর ওর মধ্যের ব্যবধানটা ঘোচাবার জন্য। এরপর আমাদের সুযোগ থাকল না পূর্ব প্রসঙ্গ দীর্ঘায়িত করার। তিনজন একসঙ্গে যখন পথের দূরত্ব কমিয়ে আনার কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখলাম তখন প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হোল। চন্দ্রা বলল, এককদাকে তুমি বলার অধিকার পেয়েছি কিন্তু বিয়াসদিকে আপনি বলতে হচ্ছে।—এ পর্যন্ত বলে বিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বলল, একজনকে তুমি বলব আরেকজনকে আপনি বলব এভাবে তুমি আপনি বার বার করা যায়? দু'জনকে তুমি বলতে পারলে সুবিধা হয়, হয় কিনা বলুন বিয়াসদি?

হয়, এটা বলতে খোদার হাট ঘুরিয়ে এনে তবে বলতে হোল!

বিয়াসের কথার পর আমি নীরব থাকতে পারলাম না, বললাম, তিনজনই পরস্পরকে তুমি বলব এটা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোল।

তা হোল······।—চন্দ্রা কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে যেভাবে দৃষ্টি সামনে প্রসারিত রেখে হাঁটছিল সেভাবেই হাঁটতে থাকল।

কী?—প্রায় একসঙ্গে বিয়াস আর আমার মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে আসল।

না থাক।—চন্দ্রা তখনো কথাটা প্রকাশ করতে পারল না কোনো অজ্ঞাত কারণে। হয়ত যে কথাটা বলতে চাইছিল সেটা বলার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি।

থাকবে কেন? যা বলার তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রা যে মুখ খুলল তা নয় কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর অনেক কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, আচ্ছা বয়সের ব্যবধান খুব বেশী হোলে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না—না ?

কথাটা আমাকে বলেছে ও তবু আমার ঠোঁট বিযুক্ত হওয়ার আগেই বিয়াস চন্দ্রার প্রশ্নের জবাব দিল, কে বলেছে তোমাকে একথা ? বন্ধুত্বের জন্য বয়সের সীমারেখা কেউ নির্ধারণ করে রাখেনি, একজন শিশুর সঙ্গে একজন বৃদ্ধরও বন্ধুত্ব হতে পারে।

আমি বুঝলাম চন্দ্রা কী বলতে চাইছে, বললাম, এখন থেকে তিনজনই প্রত্যেকের বন্ধু,—এরপর বিয়াসের উদ্দেশ্যে বললাম, কী উর্বশী তাই ত' ?

হ্যাঁ তাই তবে শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না এটা মনে থাকে যেন সত্যান্বেষী। তোমার নিজেরই নিজেকে দে'য়া নামটা ব্যবহার করলাম, আপত্তি নেই ত' ?

না, বলতে পার। যাক সে কথা এবার বলত প্রশ্ন করার আগে যে কথা বললে সে কথার তাৎপর্য কী ?

এখন থেকে তোমার সঙ্গলাভ থেকে যাতে বঞ্চিত না হতে হয় আমাদের তারজন্য এই হুশিয়ারি, দুঃখে দুখী, সুখে সুখী, শ্মশানে সঙ্গী যে একমাত্র সেই প্রকৃত বন্ধু এটা আশা করি তুমি জান ?

জানি, তুমি যা যা বললে তার প্রত্যেকটি কথা মানতে হবে না প্রকৃত বন্ধুর যে সংজ্ঞা জানালে তা পালন করতে হবে ?

তার মানে ! প্রকৃত বন্ধুর সংজ্ঞার কথাই ত' শুধু জানলাম ওটাই ত' মেনে চলার কথা জানিয়েছি।

বেশ তোমার ঐ সংজ্ঞার প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে এ অঙ্গীকার আমি করছি।

চন্দ্রা বিয়াসের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করে বলল, বিয়াসদি সাহিত্যিক বন্ধুর কথার মধ্যে কী আছে খুঁজে দেখ, এত সহজে ঘাড় কাৎ করার মানুষ এককদা যে নয় এটা এতক্ষণেও বুঝে উঠতে পারলে না !

বিয়াস চন্দ্রার কথা শুনে কিছুক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে থেকে পথের দূরত্ব কমিয়ে আনার কাজে ব্যস্ত রাখল পদযুগলকে। তার এই নিজের মধ্যে ডুবে থাকার কারণ কী তা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছিল না আমার। বুঝতে পারছিলাম ওর কথার উত্তরে যে অঙ্গীকার আমি করলাম তার মধ্যে কোথায় ফাঁক থেকে গেছে সেটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুব বেশিক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হোল না একটু পরেই বিয়াস বুঝতে পারল। বুঝতে পেরেই তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সাংঘাতিক মানুষ ত' তুমি আমি বুঝতেই পারিনি কথার মারপ্যাচে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে দিলে আমাদের। আচ্ছা আমাদের তোমার সঙ্গলাভ করা থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস কেন ?

প্রয়াস নয় কখনো কখনো প্রয়োজন বলতে পার। এই যেমন গীতাভবন

থেকে ফেরার সময় আমি আকাঙ্ক্ষা করছি মেসোমশাইর সান্নিধ্য। তার অসম্পূর্ণ কাহিনী ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে আমাকে। তোমাকে ত' আগেই বলেছি বিয়াস অনেক মানুষের মধ্যে আমি হারিয়ে থাকতে চাই, মনের জানালা বন্ধ করে এই হারিয়ে থাকার ইচ্ছেকে বন্দী করে রাখতে পারব না।

আমরা তিনজন কথা বিনিময় করতে করতে এক সময় গীতাভবনে পেঁছলাম। গীতাভবনে যখন পেঁছলাম তখন রোদের উৎসস্থল বড় একখন্ড মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। হঠাৎ পবনদেব বড় বেশি অশান্ত হয়ে উঠলেন। গাছপালা দুলে উঠল। কয়েকটি পরভৃৎ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তারস্বরে চিৎকার করতে করতে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার আশ্রয়স্থলের উপর আস্থা হারিয়ে শূন্যে ডানা মেলে দিল। আঁধি সমস্ত অঞ্চলটার উপর তান্ডব নৃত্য শুরু করল। ঝড়ের দাপটে পথের ধুলো যেন আত্মরক্ষার তাগিদে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এবং বসন-ভূষণে আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল মেঘেরও বিস্তার। খুব বেশি সময়ের জন্য পবনদেবের সেই রুদ্র মূর্তি আমাদের অবলোকন করতে হোল না, চোখ-মুখের উপর থেকে ভয়ের ছায়া অনেকখানি অদৃশ্য হোল। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত তখনো হতে পারিনি, না পারার কারণ ঝড় না থাকলেও যেভাবে মেঘ আকাশে জড়ো হচ্ছে তাতে ভয় হচ্ছিল মেঘের গর্ভ থেকে জলের বর্ষা না নেমে আসে। আমাদের আশঙ্কা অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য স্থায়ী হোল না একটু পরেই এখানকার এক বাসিন্দাকে প্রশ্ন করে জানলাম এ মেঘের রূপ যদিও কৃষ্ণবর্ণ তবুও এই মেঘকে পর্জন্য আখ্যা দে'য়া চলে না। বৃষ্টি হবে না। ঐ সময়ে এই মেঘের উপর বিশ্বাস রাখা যেতে পারে। ভয়কে বিতাড়িত করতে পারার জন্য উৎসাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোলো মনের মধ্যে। নিশ্চিন্ত হয়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে দ্রুত পা চালালাম।

মন্দিরের ভেতর সিত অশ্মের ফলকে গীতার বাণীকে খোদাই করে রাখা হয়েছে। ঘুরে ঘুরে সেই বাণী কতটা অন্তরে গাঁথতে পারলাম বলতে পারব না তবে সেই বাণীর উপর চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে মনে হোল পরিচিত সেই বাণী এখানে যেন অন্যরকম। সুদর্শনচক্রধারীর মুখ নিসৃত বাণীর প্রতিটি অক্ষর যেন এখানে নতুন সুরে বাজতে থাকে। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর গীতাভবনের যে অংশে এসে দাঁড়ালাম সেখান থেকে বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। জনারণ্য গঙ্গার ঘাট। আমরা সেখানে অবতরণের পর সেই জনারণ্যের মধ্যে হারিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কোনো কিছুর আকর্ষণে যে ওখানে অবস্থান করছিলাম তা নয়, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যেই আমাদের থাকতে হোল কিছুক্ষণ। বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য না থাকলে এরকম স্থানে অবস্থান করার কোনো অর্থই হয় না কারণ এই স্থানে চিত্তবিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকা চলে, অবশ্য চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা কিছু মানুষের জন্য আছে তবে তাদের নির্ভেজাল লম্পট ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। অ্যাবলিউশনের জন্য সিক্ত বসনে এবং প্রায় বিবস্ত্রা হয়ে অনেক নরনারী সুরোপসনায় গঙ্গার পবিত্র নীরে গা ডুবিয়ে রেখেছে। কোনো কলুষিত

দৃষ্টি তাদের দেহকে স্পৃষ্ট করছে কিনা তা নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। হরিদ্বারেও গঙ্গার পবিত্র সলিলে একজন রমণীকে দেখেছিলাম এক বুক জলে উন্মুক্ত বক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে। সু-উন্নত শৃঙ্গদ্বয়ের উপর চোখ চলে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। রমণীর বক্ষ কামনার দরজা উন্মুক্ত করে দেয় এটা ঠিক কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য একথা আমি বিশ্বাস করি না, আমি বলি ঊষার মত পবিত্র ভাল লাগার ভাণ্ডারও আছে তাতে। কামনা-বাসনা এবং আদিম রিপুর বিচরণ কার মনে কীভাবে শুরু হয় তার কী কোনো নিয়ম আছে! বিশেষ কোনো অঙ্গ নয় রমণীর যে কোন অঙ্গই চিত্তচাঞ্চল্যের সহায়ক হতে পারে। মদোনৎসবের আহ্বান জানাতে পারে। সেদিন হরিদ্বারে যা দেখেছিলাম তাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল কোনো স্বচ্ছ সরসীতে প্রস্ফুটিত যুগল বিসের হৃদয়ের ঘ্রাণ নিতে এসেছে দুটো অসিত ভ্রমর। অমিত ভাল লাগা তখন আমার অন্তর জুড়ে, দিদৃক্ষা অভ্রস্পর্শি তবু চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম। গীতাভবনের যে জনারণ্যে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছি সেখানে এরকম দৃশ্যের অভাব নেই এ কথা বলব না কারণ হরিদ্বারে যে দৃশ্য অবলোকন করেছিলাম সে দৃশ্যের মধ্যে শালীনতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার সম্ভবনা ছিল না, কিন্তু এখানে নারীর শরীর ভয়ঙ্কর বন্যার মত যেন সমস্ত বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনভ্যস্থ চোখ হোঁচোট খায়। আর এই কারণেই চোখ মেলে এদৃশ্য দেখার একটাই উদ্দেশ্য হতে পারে এবং সে উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করা হয়েছে। আমাদের এখানে অবস্থান করতে হোল এই একটি কারণে—গঙ্গার অপর প্রান্তে যাবার জন্য মোটরলঞ্চের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে বলে বিকাশবাবু 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে আছেন। যতক্ষণ অপর প্রান্তে যাবার ছাড়পত্র যোগাড় করে না আনতে পারছেন ততক্ষণ এখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। রোদ মাথায় করে এখানে অবস্থান করতে হচ্ছে বলে প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অস্বস্তি জগদ্দল পাথরের মত যেন চেপে বসে আছে মনের মধ্যে। প্রত্যেকের কপালেই দু' একটা ভাঁজ জন্ম নিয়েছে। আমি জানি দর্পণে আমার প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন নেই কারণ আমি সুনিশ্চিত বিন্দু-মাত্র বিরক্তি আমার চোখে-মুখে ছায়া ফেলতে পারেনি। জনারণ্যে অনেক মানুষ সুখ-দুঃখের হাট বসিয়ে রেখেছে, শুনতে পাচ্ছি তাদের কথোপকথন। এরই মধ্যে দু'চারজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, শমনালয়ের দোরে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে আর কাতরাচ্ছে। কেউ পুণ্যের কানাকড়ি দিয়ে যাবে এ আশায় নয়, যদি কেউ কড়ি দিয়ে যায় এই আশায়। কেউ কেউ বসেছে রকমারি জিনিস নিয়ে, অস্থায়ী আপণে অনেক কিছুর সম্ভার—কত কী যে আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। এছাড়া আছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দল যারা এক এক জায়গায় জড়ো হয়ে হাসি-তামাসা কিম্বা ঘর-সংসারের কথায় ব্যস্ত। দেখলে মনে হয় মনের সাগরের অবিরাম কথার ঢেউ যেন অনন্তকাল ধরে চলবে। অজস্র মানুষের সমাগম, এরমধ্যে একজনের উপর স্থাপিত হোল আমার দৃষ্টি। যাকে দেখলাম তার বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। জরাঙ্কে শায়িত, গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে তার কণ্ঠ থেকে,

বুঝলাম অচিরেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। এ সময়ে তার কাছে দু' একজনের থাকা দরকার। পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেলাম, এরপর তার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে মনে মনে বললাম, এত মানুষ চারপাশে অথচ একজন মুমূর্ষ মানুষের পাশে একজনও নেই এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখার দুর্ভাগ্য হোল আমার মানুষের হৃদয়হীনতার জন্য। বিস্মিত হোলাম একজন মানুষকেও এসময় তার পাশে না দেখতে পেয়ে। আমি কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার এই মুমূর্ষ মহিলাটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে একজন অবাঙ্গালী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, কী ব্যাপার বাবুজী আপনি এখানে দাঁড়িয়ে ? বুঝেছি এই মহিলাব এ অবস্থা দেখেও কেন কেউ এগিয়ে আসছে না একথা ভাবছেন, বলুন বাবুজী একথা ভাবছেন কি না ?

বললাম, আপনার অনুমান নির্ভুল।

আমার কথা শেষ হতেই ভদ্রলোক বললেন, আপনার পাঁচ-সাত মিনিট সময় যদি হাতে থাকে তাহোলে এই মহিলার কিছু কথা জানাতে পারি যা শুনলে বুঝতে পারবেন কেন এত অবহেলিত অবস্থায় এ পড়ে আছে।

আমি বুঝতে পারছিলাম না ঠিক কতক্ষণ এখানে অবস্থান করতে হবে তাই বললাম, হতে পারে আবার না-ও হতে পারে।—এ পর্যন্ত বলে তাকে জানালাম আমার বক্তব্য ঐ ভাবে কেন পেশ করলাম।

ভদ্রলোক বললেন, শুরু-ত' করি তারপর দেখুন কতটা শুনে যেতে পারেন। —এরপর বলতে শুরু করলেন মুমূর্ষ মহিলাটির কাহিনী। সে কাহিনীর শেষাংশ আমার জানা হয়নি কিন্তু যেটুকু জেনেছি তা খুবই অস্বাভাবিক।

সরস্বতী সন্ধ্যে হোলেই সস্তা দামের পাউডারের পলস্তরা পুরু করে লাগায় পান পাতার মত মুখের কিছু কলঙ্ককে আড়াল করে রাখার উদ্দেশ্যে। পুরোপুরি না হোলেও কিছুটা আত্মগোপন করার সুযোগ পায় মুখের কালো কালো দাগগুলো। কপালে রংবাহারী কাঁচের টিপ পরে। হাতে থাকে ডজনখানেক কাঁচের চুড়ি। রাংতার মত চকমকি শাড়ি অঙ্গে উঠে আসে প্রতি সন্ধ্যেয়। সব মিলিয়ে নিজেকে আকর্ষণীয় করার প্রয়াস চালাতে হয় প্রতিদিন। এ ছাড়া কোনো বিকল্প উপায় নেই। জঠরের জ্বালায় আদিম ব্যবসা ফেঁদে বসতে হয়েছে। এখন তার পরিচয় কসবী। কিন্তু এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। যৌবনে যে ভুল করে মেয়েরা নিজেদের ঐ জায়গায় টেনে নামায় সরস্বতী সে ভুল করেনি। স্বেচ্ছায় কখনো কোনো পুরুষের সঙ্গে শারীরিকভাবে মেলামেশা করেনি বললেই চলে। কোনো প্রলোভনেই ও প্রলুভিত হয়নি। ওর এই পরিণতির জন্য দায়ী গঙ্গা। হৃষিকেশেই এক বিত্তবানের বাড়িতে কাজ করত গঙ্গা। যে মানুষটার গৃহে কাজ করত সেই গৃহে দুটি প্রাণী থাকত। মনোহর আর তার স্ত্রী। গঙ্গা ঐ বাড়িতে কাজ নে'য়ার পর বাড়ির ভেতর অশান্তি দেখা দিল। অশান্তির কারণ গঙ্গা। ওকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুরু হোল কলহ। গঙ্গার রূপ-যৌবন মনোহরের চিত্তে অস্থিরতা আনে। গঙ্গা বাল-বিধবা তাই পুরুষমানুষের সম্বন্ধে একটা অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল ছিল, মনোহরকে বুঝতে পেরে তার দিকে ঝুঁকে

পড়তে বিলম্ব হয় না ওর। চলতে থাকে অবৈধ মেলামেশা। এ ব্যাপারটা মনোহরের স্ত্রী কয়েকদিনেই ধরে ফেলে। শুরু হয় অশান্তি। এভাবেই চলছিল কিন্তু খুব বেশীদিন নয় মাত্র মাসখানেক পরেই মনোহরের স্ত্রী গলায় দড়ি দেয়। অবশ্য সত্যি সে গলায় দড়ি দিয়েছিল না তাকে হত্যা করা হয়েছিল তা এখনো জানা যায়নি। অনেকের ধারণা দুজনে মিলে তাকে হত্যা করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। যাই হোক সে কথা আদালতে প্রমাণিত হোল না। মনোহরের স্ত্রীর মৃত্যুর পর ওদের অবাধ মেলামেশা চলতে থাকল নিয়মিতভাবে। কিছুদিন পর মনোহর কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় ফলে তাকে স্থানান্তরিত করতে হয়। হস্‌পিটালাইজড্‌ হয়। সেই সময় গঙ্গার শরীরের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন আসে। তার পা ভারী হয়ে ওঠে এবং মাঝে মাঝে মাথা ঝিমঝিম করে। অবশ্য এই শারীরিক পরিবর্তনের জন্য গঙ্গা খুব বেশি চিন্তিত হয় না। ভাবে শরীর থাকলেই সুখ-অসুখ থাকে তা নিয়ে ভাবলে চলবে না। তখন তার মনের মধ্যে অন্য চিন্তা, মনোহর হাসপাতালে কতদিন থাকবে কে জানে, এই সময় পুরুষবিহীন শয্যায় সে থাকবে কী করে! অন্য পুরুষে আসক্ত হয়ে পড়ে ও। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে গঙ্গা তার শরীরের মধ্যে আরো একটা শরীর বেড়ে উঠছে। একদিন সরস্বতীকে জন্ম দেয়। এরপর পাঁচটা বছর অতিক্রান্ত হয়। ইতিমধ্যে মনোহর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। আবার মনোহরকে ফিরে পায় গঙ্গা। এই পাঁচ বছরে গঙ্গার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে। তখন ও শুধু শারীরিকভাবে তৃপ্ত হতে চায় না আরো কিছু প্রত্যাশা করে। বিত্তের সড়ক বড় সুখের, সেই সড়কের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছেটা অসম্ভব রকম প্রবল হয়ে উঠছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার মধ্যে উন্মাদনা বাড়ছে। অর্থকে কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে শুরু করল। এইভাবে আরো বেশ কিছু বছর অতিবাহিত হোল। এই সময়ের মধ্যে সরস্বতীর শরীরের মধ্যে আসলো অনেক পরিবর্তন। ওর শরীরে জোয়ার আসল। পাপড়ি মেলে যেন একটা ফুল ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে। মনোহর অনেকদিন ধরেই লক্ষ্য করছিল একদিন গঙ্গার সাথে তার সরস্বতী সম্বন্ধে কিছু কথা বিনিময় হোল। মনোহর তার মনের ইচ্ছেটা ব্যক্ত করে বসল। শুনে গঙ্গা প্রথমে কেঁপে উঠেছিল, বলেছিল, এ কী বলছ কখনই এটা সম্ভব নয়, জান ও কে? সম্ভবত ও তোমারই মেয়ে। —মনোহর এক তাড়া টাকা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলেছিল, কে বলেছে আমার মেয়ে? আমার কোনো মেয়ে নেই। তুমি কি শুধু আমার সঙ্গে ছিলে যে ও আমার মেয়ে হতে যাবে? যখন সঠিকভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না তখন ও নিয়ে ভাবতে পারব না আমি। তুমি রাজী কিনা সেটা বল?—গঙ্গার চোখ তখন চকচক করছিল, এক তাড়া টাকা তার মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণরূপে বিকল করে আনছিল, কোনো কিছু ভাববার মত তখন তার মনের অবস্থা ছিল না। কী করতে যাচ্ছে সে কথা না ভেবেই বলে বসল, ঠিক আছে কাল তোমার কাছে নিয়ে আসব ওকে।—বলেই ছোঁ মেরে মনোহরের হাত থেকে টাকার বাণ্ডিলটা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

এ পর্যন্ত শোনার পর আমি বললাম, ইলেকট্রাকমপ্লেক্স।

কী বললেন বাবুজী ?—ভদ্রলোক প্রশ্ন:করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

তার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু বলার আগেই ডাক পড়ল। বিকাশবাবু এক-রকম তাড়িয়ে নিয়ে তুললেন লঞ্চে। জলযানটিতে ওঠার পর বললেন, কী এত কথা বলছিলেন বলুন ত' আর একটু হোলেই এ লঞ্চটা ছাড়তে হোত। এটা ছাড়লে আবার আধ ঘণ্টা এখানে বসে থাকতে হোত।

চাচিজী অপেক্ষা করছিলেন বিকাশবাবুর কথা শেষ হতেই বললেন, কী ব্যাপার একক যেখানে যাচ্ছ সেখানেই জমে যাচ্ছ দেখছি কী কথা হচ্ছিল ? যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল তাকে দেখে মনে হচ্ছিল খুব উৎসাহের সঙ্গে যেন কিছু বলছিল।

যে কাহিনী শুনেছি তা বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারলাম না আর এই কারণেই কথাটাকে পাশ কাটাবার উদ্দেশ্যে বললাম, বলার মত কিছু না। আমার অবস্থা ঢেঁকির মত, জানেন ত' ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও তার কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে না। আমার অবস্থা অনেকটা সেরকম, যেখানেই যাই না কেন কারো না কারো সঙ্গে ঠিক গল্প ফেঁদে বসব। বাচ্চার হাতে কাঁসর থাকলে কী হয় জানেন ?

কী হয় ?

একক লোকারণ্যে থাকলে তার যে অবস্হা হয় বাচ্চার হাতে কাঁসর থাকলে ঐ কাঁসরের অবস্হাও হয় অনুরূপ—দুই বাজতে থাকে এক নাগাড়ে।

বাজছেন কেন তা মনে হয় আমি জানি।—এবারের বক্তব্যটা বিকাশবাবুর।

বললাম, কেন ?

বাজার মধ্য দিয়েই কাব্য করার রসদ খুঁজে বেড়ান বলে আমার ধারণা।—আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে ভদ্রলোক সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলেন পকেট থেকে। আমার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, ধরান একটা তারপর অপেক্ষা করে থাকুন প্রকৃতি আপনাকে কতটা ভরিয়ে দিতে পারে তারজন্য। এতদিন ত' অনেক কিছুই দেখলেন কিন্তু আমার মনে হয় এরপর প্রকৃতিকে যে রূপে দেখতে পাবেন তার তুলনায় তা কিছুই নয়। আকাঙ্ক্ষিত পুরুষের সান্নিধ্যে এবং সোহাগের পর রমণীর মুখে যেরকম সুখের বিস্তার দেখা যায় সেরকম আপনার মুখেও সুখের বিস্তার যে দেখতে পাব এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কাব্য করার রসদ খুঁজে বেড়াচ্ছি ঠিকই কিন্তু এ মুহূর্তে যা জানতে পারলাম তা কী জানেন ?

কী ?

আরো একজন কাব্যরসে ডুবে আছেন।

আমার কথা শুনে বিকাশবাবু বাতাসে ঝড় তুলে হাসলেন তারপর হাসির ঝড় বন্ধ হবার পর বললেন, আমার কথা বলছেন! আমার বক্তব্যের মধ্যে যদি কাব্য থেকে থাকে তাহোলে সেটা সত্যি বিস্ময়ের ব্যাপার কারণ কাব্য ব্যাপারটায় আমার ভীষণ অ্যালার্জী। আর এই কারণেই আমার স্ত্রী হয়ত মনে মনে আমাকে পাষণ্ড

ছাড়া আর কিছু ভাবত না। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এখন আমার নিজেরই মনে হয় আমি একটা পাষণ্ড ছাড়া আর কিছু নই।

আমি চারমিনারের ধোঁয়া গিলতে পারব বলে মনে হোল না। একেই সিগারেট কম খাই তার উপর এত কড়া সিগারেট টানতে পারব বলে ভরসা পেলাম না। ভদ্রভাব প্রত্যাখ্যান করে বললাম, আপনি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, বিভূতি-ভূষণের লেখা পড়েননি ?

পড়েছি, স্কুল-কলেজে পড়তে গিয়ে যেটুকু বাধ্যতামূলক ছিল।

বিকাশবাবু যে কথাই বলুন না কেন তিনি যে কাব্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তা আমি মানতে পারলাম না তাছাড়া তিনি যে আদৌ পাষণ্ড নন তার যথেষ্ট প্রমাণ ইতিপূর্বেই মিলেছে। সত্যি বলতে কী এখন পর্যন্ত মানুষটার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছি তাতে তাকে নিঃসন্দেহে একজন অতিশয় ভদ্রলোক আখ্যা দে'য়া ছাড়া উপায় নেই। এছাড়া কাব্যের প্রতি তিনি যে সত্যিই বিন্দুমাত্র অনুরাগী নন তার কোনো প্রমাণ ত' পাই-ই নি বরং এখন মনে হচ্ছে তিনি মুখে যাই বলুন কাব্যের প্রতি অনুরাগ অবশ্যই দেখিয়েছেন।

বিকাশবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল বলে চাচিজী কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে-ছিলেন। আসলে অনেকে একসঙ্গে একজায়গায় থাকলে কথোপকথন এভাবেই চলতে থাকে অর্থাৎ কারো সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলে না। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা বিনিময় হতে থাকে অনেকের সঙ্গে। আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহোলে বলতে পারি চাচিজী আমাকে কিছু বলার জন্য আগ্রহী কিন্তু এখানে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়েও করলেন না, হয়ত অবিচ্ছিন্নভাবে সে কথা বলা সম্ভব হবে না ভেবেই বলতে পারলেন না। বুঝতে পেরেছিলাম ওনার চোখ-মুখ দেখে।

জল কেটে কেটে মোটর লঞ্চ এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিকাশবাবুর এবং সেই সঙ্গে অনেকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় হচ্ছিল আমার। পাঁচ-ছ' মিনিটের মধ্যে আমরা চলে আসলাম গঙ্গার অপর প্রান্তে। অন্য প্রান্তে পেঁছিবার পর চাচিজী বললেন, কী একক হরিদ্বার থেকে যাত্রার পর তোমার সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হোলাম কেন ? নতুন মেসোমশাই-মাসিমা পেয়ে কী চাচিজীকে ভুলে গেলে ?

না—না তা নয় আসলে ভিড়ের মধ্যে আপনাকে আমি পেতে চাই না। আপনাকে পেতে চাই অন্যভাবে—একান্তে। ঠিক সময়ে আপনাকে খুঁজে নেব। আসলে আপনি আমার ঘর। সারাদিন বাইরে ঘোরার পর সকলেই যেরকম ঘরে ফিরে আসে সেরকম হাজার মানুষের সঙ্গে কথা বললেও একসময় ঘরে ফেরার কথা মনে হবেই।

কী সুন্দর কথা বল একক আজ মনে হচ্ছে অনেক কিছু পেলাম।

আমরা কথা বলতে বলতে যখন বাসের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য এগিয়ে চলেছি তখন বিয়াস প্রথমে এসে আমাদের সঙ্গী হোল এবং এরপর সামান্য একটু সময়ের ব্যবধানের পর সুরেখাও আমাদের কাছে চলে আসল। বিয়াস এসে কিছুক্ষণ

নীরবতা বজায় রেখে হেঁটেছে। ওর ওভাবে বাকরুদ্ধ হয়ে পথ পরিক্রমা আমাকে বিস্মিত করছিল। চাচিজীও যে বিস্মিত হয়েছেন তা বুঝতে পারলাম তার চোখের দিকে তাকাতেই, নীববতা অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি একটা প্রশ্ন রাখলেন আমার কাছে। বিয়াসের এই নীরবতাকে ভঙ্গ না করার ব্রত কেন এটাই ছিল তার প্রশ্ন। যেভাবে উনি প্রশ্ন করলেন সেভাবেই আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম অর্থাৎ বিয়াসের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঠোঁট বিযুক্ত না করে জানলাম ওর এই মৌনব্রত অবলম্বন করার কারণ আমার কাছেও অজ্ঞাত।

একক তুমি কী মনে কর তোমার সঙ্গ না পেলে আমরা হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসব ?

এতক্ষণ নীরবতা বজায় রেখে হাঁটছিল কেন বিয়াস তা এবার বুঝতে পারলাম। বুঝলাম ভীষণ রকম তেতে ছিল বলেই ভেতরে ভেতরে ফুলছিল ফেটে পড়ার জন্য। বললাম, একথা বলছ কেন ?

আমার কথা শুনে ওর দুচোখের আগুন যেন ঝরে পড়ল, কেন তুমি বুঝতে পারছ না ?

আমি ওর প্রশ্নের উত্তর দে'য়ার আগেই চাচিজী মুখ খুললেন, আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দাঁড়াও দাঁড়াও ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও আগে।

আমি বিস্মিত হয়ে চাচিজীর চোখে চোখ রাখলাম। যেভাবে উনি কথাটা বললেন তাতে পরম বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শুধু আমিই নই বিয়াসও যে বিস্মিত হয়েছে তা বুঝতে পারলাম চাচিজীর কথার পর সে যখন বলে উঠল, কী বঝতে চাইছ ?

তোদের।

তোদের মানে ! খুলে বল।

যে সন্দেহ মনের মধ্যে শেকড় ছড়াতে পারত তা পারছে না কারণ এত কম সময়ে তা হবার নয় তাহোলে

কী তাহোলে ?—প্রশ্নটা করেই বিয়াস বুঝল চাচিজী কী বলতে চাইছেন, বলল, আমরা পরস্পরের নাম ধরে ডাকছি এবং আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছি এটাই ত' জানতে চাইছ ?

ঠিকই অনুমান করেছিস। এটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি যে হঠাৎ তোদের এই পরস্পরের নাম ধরে ডাকা এবং আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসার মধ্যে কোনো হৃদয়ঘটিত ব্যাপার নেই—কী তাই ত' ?

তোমার অনুমান নির্ভুল। নির্ভুল বললাম বটে তবে কথাটা সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার একটা আছেই, আমি একককে ভালবাসি কারণ এখন আমরা পরস্পরের বন্ধু। ভাল না বাসলে বন্ধুত্ব হয় না আর বন্ধুত্ব মানেই হৃদয়ঘটিত ব্যাপার, তবে তুমি যে ভালবাসার কথা ভেবে কথাগুলো বললে সেরকম কোনো ভালবাসা আমাদের মধ্যে কখনই গড়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই।

কেন? যদি ওরকম কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠত তাহোলে হয়ত আমি অখুশি হতাম না।

বিয়াস তির্যক দৃষ্টিতে একবার আমার আপাদমস্তক দেখে নিল, নিয়ে চাচিজীর কথার উত্তর দিল, বলল, ওর সঙ্গে কথা বলতে ভাললাগে, সীমাহীন কথার সাগর ওর মধ্যে আছে। এই কথার মধ্যে ডুবিয়ে দেয় ও, সে সব কথা যেন রংয়ের বৈচিত্র্য নিয়ে প্রজাপতির মত ডানা মেলে থাকে সর্বক্ষণ। এর বাইরে একক গুপ্ত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। বিয়াস কাপুর একজন পুরুষের কাছে যা যা পেতে চায় তা ওর মধ্যে নেই।

আমি কপট রাগের ভান করে বলি, আমার সামনেই এভাবে নিন্দে করছ বিয়াস '

এতক্ষণ যেন মেঘের বিস্তার ছিল বিয়াসের মুখের উপর, এই প্রথম যেন দীর্ঘ সময়ের পর সূর্যোদয় হোল অর্থাৎ বিয়াসের দু'-ঠোঁটের মাঝে একটা রেখা ভেসে উঠল। ঐ হাসিকে ডুবে যেতে না দিয়ে বলল, তুমি রেগেছ! আমার বিশ্বাস হয় না, যদিও খুব কম সময়ের পরিচয় তোমার সাথে তবু আমার মনে হয় তোমাকে চিনতে আমি ভুল করিনি, আমার ধারণা সত্যি কথা শুনলে তুমি অখুশি হও না। সত্যি কথা বলার ক্ষেত্রে আমি যথেষ্ট সাহসী, এ পরিচয় তুমি ইতিপূর্বে পেয়েছ।

বিয়াসের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আমি সুরেখার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করে বললাম, বিয়াস আমার বন্ধুত্ব কামনা করেছিল আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। আমি যদি আপনার দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত···

আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই সুরেখা বাধা দিয়ে বলে উঠল, আমি বিয়াস নই, বন্ধুত্ব করতে চাইলেই তা করা সম্ভব নয় কারণ বন্ধুত্ব হোলেই কতগুলো শর্ত মানার প্রশ্ন এসে যায়, সেই শর্ত বড় কঠিন। যতক্ষণ বুঝতে না পারছি যে যার জন্য শর্ত মানতে হবে তার জন্য মনের কতটা জায়গা বরাদ্দ করতে পারব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার আহূতিতে সারা দিতে পারছি না। আমার অনুরোধ—প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছি বলে মনে করবেন না, শুধু এই মুহূর্তে প্রস্তাবটা মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তোমাকে আগেই একটা কথা জানিয়েছিলাম মনে আছে?--সুরেখার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিয়াস প্রশ্ন করল। প্রশ্নটা যে আমার উদ্দেশ্যে তা বুঝতে বিলম্ব হোল না। বললাম, কোন কথাটা বল ত'?

সুরেখার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত হীম-শীতল—কী বলিনি? তাছাড়া আরো একটা কথা জানিয়েছিলাম—সুরেখা একটা ধারালো অস্ত্র। খাপের মধ্যে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তুমি নিশ্চিত, আর যখনই দেখবে খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে তখনই মুখে কুলুপ আঁটবে, যদি একান্তই অসুবিধা হয় তাহোলে বাক্য ব্যয় করার আগে দশবার ভেবো।

সুরেখা বিয়াসের কথায় রেগে গেল। উত্তেজিতভাবে বলল, কী যা-তা বলছিস! এককবাবু একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, এরকম একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব

হওয়া কম কথা নয়, এটা আমি জানি তবু প্রস্তাবটা এই মুহূর্তে মেনে নিতে পারিনি শুধুমাত্র নিজের কথা ভেবে। আমি পুরোপুরি নিজেকে প্রকাশ না করে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চাই না। আমাকে বার বার এভাবে পরিচিত করছিস কেন ?

বিয়াস বলল, চটেছিস ? শুধু আমার কাছ থেকেই এরকম কথা শুনতে হয় তোকে ? অন্য কারো কাছ থেকে শুনিসনি কখনো ?

আমি ভেবেছিলাম ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুরেখা ক্ষুব্ধ না হয়ে পারবে না। একটু আগেই উষ্মার আভাস ছিল তার কণ্ঠে। কিন্তু যা ভেবেছিলাম সেরকম হোল না অর্থাৎ সামান্যতম উত্তেজনা প্রকাশ পেল না ওর বক্তব্যের মধ্যে। তাছাড়া বিয়াসের বক্তব্যের মধ্যেও নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি সরে এসেছিল প্রসঙ্গ থেকে। আমাকে বলেছিল, এককবাবু আমি আপনাকে আঘাত করতে চাইনি, এত স্পর্ধাও আমার নেই তবু যদি আমার বক্তব্যের মধ্যে কিছু থেকে থাকে যা আপনাকে হয়ত আঘাত করতে পারে, যদি করে থাকে তাহোলে তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

বুঝলাম ওর বক্তব্যের মধ্যে অশালীনতার ছায়া পর্যন্ত নেই, বরং ও যে কথা বলেছে, তা যুক্তিগ্রাহ্য। বললাম, আমার বিবেক-বুদ্ধির উপর যদি বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকে তাহোলে আপনার বক্তব্যের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কোনো মালঞ্চ থেকে যেন ক্রমান্বয়ে আমরা তিনজনই কথা অবচয় করে চলেছি। এই কথা আদান-প্রদানের মূল্য আমার কাছে অপরিসীম, যেন আমার মনের সূত ভাললাগার রথকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ঐকান্তিক ঈহার ধ্বজা তুলে। চাচিজী অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা না বলে হেঁটে চলেছেন বাসে উঠে আসার পর শুধু বললেন, একক এখন আমার খুবই আপসোস হচ্ছে বাংলা ভালো জানি না বলে, বাংলা বলতে না পারলেও বুঝি কিন্তু তোমরা যেভাবে কথা বলছ তাতে তোমাদের কথার বিন্দু-বিসর্গও আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

চাচিজীর কথার পৃষ্ঠে কিছুই বলতে পারলাম না বলে ঠোঁটদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করতে পারলাম না। নিরুত্তর থেকে আমার আকাঙ্ক্ষিত আসনটিতে বসার অভিপ্রায়ে পা বাড়াতেই চন্দ্রার হাতের স্পর্শ পেলাম। আমার হাতটা ধরে ও বলল, এবার আমরা একসঙ্গে তিনজন বসতে পারি কী ?

ওর প্রশ্নের জবাব দিল বিয়াস,—সে পথ ত' আগেই বন্ধ করে রেখেছে ও, কী বলেছিল মনে নেই ?

চন্দ্রা আমার হাতটাকে মুক্তি না দিয়ে বলল, প্লীজ এককদা যেও না।

বললাম, চন্দ্রা মাসিমা-মেসোমশাই আমার জন্য জায়গা রেখেছেন না গেলে খারাপ দেখাবে তাছাড়া অসমাপ্ত কাহিনীটা শোনার জন্য মনের মধ্যে কৌতূহল যেভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে যে তাকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করা অসম্ভব।

আমার বক্তব্যের পর চন্দ্রা আমার হাতটা ছেড়ে দিল, ও যে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তা বুঝতে আমার বিলম্ব হোল না। বুঝেও আমি পা বাড়ালাম আমার গন্তব্যস্থলের দিকে। মেসোমশাইয়ের পাশের অপূর্ণ স্থানটা পূর্ণ করার পর বললাম, অসমাপ্ত কাহিনীটা

আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করছে, বুঝতে পারছি না শুনে উপায় নেই তাই চলে এলাম।

বেশ করেছ, আমিও চাইছিলাম গল্পটা তুমি শোন,—বলে মেসোমশাই সামান্য কিছু সময়ের জন্য নীরব হয়ে থাকলেন। বুঝতে পারছিলাম মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছেন। এরপর পরবর্তী অংশ মেলে ধরতে শুরু করলেন।

বিপ্রদাস মতিয়ার কাছে মেলে ধরল তার পরিকল্পনা। কামনার আগুন জ্বালতে হবে মহানন্দ প্রসাদের শরীরে। স্মরকে আহুতি জানাতে মতিয়াকে কী করতে হবে তা ব্যক্ত করল বিপ্রদাস। সেই সঙ্গে জানাল মানুষটা যখন উন্মত্ত দ্বিপের মত মতিয়ার শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে তখন কী ভাবে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে হলাহল, এক বিচিত্র ধরনের বিষ যার প্রতিক্রিয়া শুরু হয় অনেক পরে। শমন দু'হাত বাড়িয়ে দেয় তার দিকে যাকে এই বিষ প্রদান করা হয়, তবে মৃত্যু আসে গজেন্দ্রগমনে। শুরের মত ছিনিয়ে নিতে আসে না মৃত্যু, অজ্ঞাতে অনেক দিন ধরে একটু একটু করে প্রাণটাকে নিয়ে যেন লোফালুফি করতে করতে নিয়ে চলে যায়। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যেন শতসহস্র অসির আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করতে হয় সর্বাঙ্গে। এই যন্ত্রণার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। কোনো কিছুতেই যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি মেলে না। একমাত্র মৃত্যুই শমকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে দেহে। মতিয়া নীরবে বিপ্রদাসের কথা শুনছিল। তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর আস্তে আস্তে বিধ্বস্ত বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, চোখ সরিয়ে আনল বিপ্রদাসের মুখের উপর তারপর বলল, আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারব ত' ?

সম্ভ্রমের রশনা পরিত্যাগ করার বাসনা নেই বলেই মতিয়া প্রস্তাবটা শুনে কেঁপে উঠেছিল, কী ভাবে আত্মরক্ষা করবে জানতে চেয়েছিল মতিয়া।

পারবে,—এ পর্যন্ত বলে আত্মরক্ষা করার কৌশলটা শিখিয়েছিলেন বিপ্রদাস। চেতনা অবলুপ্তির জন্য যে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে বিষের সঙ্গে তা ব্যক্ত করেছিল।

বিপ্রদাসের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল সুষ্ঠভাবে। নির্দেশ পালন করার উদ্দেশ্যে মতিয়া নিজেকে করে তুলেছিল অপরূপা। মুখের উপর ম্যাক্সফ্যাক্টরের প্রলেপ লাগিয়েছিল সযত্নে, অপাঙ্গে এবং চোখের পাতায় নীলাভ আভা ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদেশী আইস্যাডো লাগিয়ে। আইল্যাশের স্পর্শে দু'লোচনের পাপড়ির কুন্তল হয়ে উঠেছিল উদ্ধত। কামনার আগুন যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল অর্ধোন্মিলিত চোখ দুটি থেকে। শিতি অলিকে আশ্রয় নিয়েছিল শ্যাম্পু করা চুল। লো-কাট ব্লাউজের গর্ভে চোখকে টেনে নামানোর প্রয়াস চালাচ্ছিল একটা সুদৃশ্য লকেট। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে লকেটটা ওঠানামা করছিল আর সেই সঙ্গে সেই লকেটের হৃদয় থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল ঘন নীল রংয়ের আলো। এমন রূপের ডালি সাজিয়ে রাখলে কোন পুরুষ তা গ্রহণ করতে চাইবে না! মহানন্দ প্রসাদের ত' প্রশ্ন ওঠেই না কারণ নারীর অঙ্গ পীড়নে সে তৃপ্ত হতে চায় প্রতিদিনই সুতরাং এ রূপ-যৌবনের পেয়ালাতে তার মত মানুষ অধর স্পর্শ করাবে না এ কথা কোনো উষর মস্তিষ্কে স্থান পাবে না।

মতিয়া নতুন এক সর্গের সূচনা করে এসেছিল। একটা নতুন অধ্যায় যুক্ত হয়েছিল মহানন্দ প্রসাদের জীবনে। রূপবতীর হাত থেকে তুলে নিয়েছিল কালকূট। কণ্ঠকে সিক্ত করেছিল প্রথমে তারপর রূপবতীর শরীরের রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে আঁচল ধরে সজোরে আকর্ষণ করেছিল। শাড়িটা খুলে ফেলেছিল। শুধু শাড়িই নয় ব্লাউজের হুক্ পর্যন্ত খুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ পর্যন্তই এরপর আর এগোতে পারেনি, চোখের উপর নেমে এসেছিল এক ধূসর পর্দা সেই সঙ্গে চৈতন্য বিলুপ্ত হতে শুরু করল। একটু পরেই সম্পূর্ণভাবে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। গড়িয়ে পড়ল নাচঘরের ব্যসনবহুল গালিচার উপর। মতিয়া কার্যোদ্ধারের পর বিপ্রদাসের কাছে ছুটে এসেছিল। জানিয়েছিল সব কিছু, শুনে খুশির আতিশয্যে দু'হাত বাড়িয়ে বিপ্রদাস ওকে টেনে এনেছিল বুকের মধ্যে। সামান্য কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর বিপ্রদাস বুঝল মতিয়ার শরীরটা তার দু'বাহুর মধ্যে ফুলে ফুলে উঠছে। চোখের জলে চোয়াল ভেজাচ্ছে এটা বুঝতে অসুবিধা হোল না, বলল, কাঁদছ মতিয়া! কেন কাঁদছ আমাকে জানাবে না?

এমনি।

না এমনি নয় আমাকে খুলে বল, আমি তোমার ভালবাসা চাই।

আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার শরীর যখন আমার শরীরের ঘ্রাণ নিয়েছে তখনই আমি তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছি।

তবে বলছ না কেন?

একটা কলুষিত দৃষ্টি কী ভাবে আমার মুখের উপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমেছে নিরাবরণ বুক পর্যন্ত তা ভেবেই চোখের জলকে আটকাতে পারছি না। এতটা কষ্ট বোধহয় তোমাকে ভালবেসেছি বলেই হচ্ছে।

বিপ্রদাস এরপর আর কিছু বলে না শুধু তার সর্বগাসী ঠোঁট দুটো নামিয়ে আনে মতিয়ার ঠোঁটের উপর। নিষ্পেষিত হয় গোলাপের পাপড়ির মত নরম দুটি অধর। যেন সঞ্চিত সুধা শুষে নিতে চায় সেই সর্বগ্রাসী ঠোঁট। এভাবে ওদের প্রেমের সূচনা হয়েছিল দেহের জোয়ারে গা ভাসিয়ে তাই সে প্রেম অনন্তকালের হতে পারেনি। একটা বর্ণময় ছবির উপর ধুলোর আস্তরণ যে ভাবে ঘন হয়ে ছবিটাকে দৃষ্টির ফ্রেম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় সে ভাবে তাদের প্রেম আস্তে আস্তে ম্লান হোল। কিছুদিনের মধ্যেই দু'জনের মধ্যে একটা ফাটল দেখা দিল।

অন্যদিকে সূচনা হলো আরেক সর্গের। কিছুদিনের মধ্যে মহানন্দ প্রসাদের শরীরে শুরু হলো বিষক্রিয়া। যতই সময় অতিক্রান্ত হচ্ছিল ততই যেন বিষাক্ত সরীসৃপ তাকে জড়িয়ে ধরছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় মানুষটা তখন দিশেহারা, সমস্ত বিশ্ব-সংসারের উপর যেন নেমে আসছিল নিকষ কালো তমিস্রা। তার দু'চোখ তখন খুঁজে বেড়াচ্ছে মুক্তির আলো। কিন্তু সে আলো তার ভাগ্যের রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়ছে তখন।

মহানন্দ প্রসাদ যতই যন্ত্রণায় ছটফট করছে ততই বিপ্রদাসের সুখের ভান্ডার পরিপূর্ণ হচ্ছে। খুশির ঝরণায় গা ভাসিয়ে মৃত স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, সরমা আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

মহানন্দ প্রসাদ বাঁচেনি, তার মৃত্যুর পর সূর্যপ্রসাদের রক্তেও দেখা যায় বাপের সেই নেশা, নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করার বাসনা অন্তর জুড়ে। উষ্ণ শয্যায় উষ্ণ শরীর তার রক্তে আনে উন্মাদনা। তবু পিতাপুত্রের মধ্যে একটা জায়গায় বৈষম্য ছিল, পিতার মত বাহুবলে কোনো রমণীর দেহের পবিত্রতা নষ্ট করতে চায়নি সে। জোর করে কারো উপর অত্যাচার করত না। কাঞ্চন দিয়ে কামিনীকে পেতে চাইত। এছাড়া তার মস্তিষ্ক পিতার মত ঊষর ছিল না, যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল সূর্যপ্রসাদ। সে বুঝেছিল জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে ভোগ করার মধ্যে সুখ নেই। সূর্যপ্রসাদ বুদ্ধিমান বলেই বুঝেছিল তার বাবার শরীরে যে অপরিচিত বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে তা সুনিশ্চিত ভাবে কোনো অজ্ঞাত শত্রু প্রয়োগ করেছে। বুঝে উঠতে পারে না কে সেই শত্রু। সেই শত্রুকে খুঁজে বার করার জন্য একজনকে নিযুক্ত করল। সেই মানুষকে জানাল তার শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, এটাই হবে তার একমাত্র কাজ। বাবার আততায়ীকে খুঁজে বার করার প্রয়াস চালাতে হবে।

নিযুক্ত মানুষটার নাম মিলন সরকার। মানুষটা কয়েক দিনেই তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হলো। সকলের কাছেই সে সূর্যপ্রসাদের শত্রু হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে ফেলল। এমন কী বিপ্রদাসও জানতে পারল না তার আসল পরিচয়টা। বিপ্রদাস মনে মনে ভাবল এরকম একজনকে হাতিয়ার করতে পারলে মন্দ হয় না, এই মানুষটাকে কাজে লাগিয়ে সূর্য প্রসাদকে ধ্বংস করা যেতে পারে। একদিন মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করে ফেলে মিলন সরকারের কাছে। জানায় তার পরিকল্পনার কথা।

মিলন সরকারের মারফৎ সমস্ত খবর পায় সূর্যপ্রসাদ এবং তার পিতার মৃত্যুও যে বিপ্রদাসের জন্য হয় তা জানতেও বাকি থাকে না তার। কিন্তু হত্যার পেছনে কী কারণ আছে তা বুঝে উঠতে পারে না, কিছুদিনের মধ্যে সে সংবাদও এনে দেয় মিলন সরকার। আরো একটা সংবাদ পায় সূর্যপ্রসাদ—মুন্নাবাঈয়ের পূর্বের পরিচয়।

মুন্নাবাঈ সুকণ্ঠী, রাগরাগিনীরা তার বশীভূত। শুধু গলা নয় তার সঙ্গে আছে তার রূপ। যৌবন তার অস্তমিত তবু এরকম বাঈ বিরল।

মুজরো করার জন্য লোক পাঠায় সূর্যপ্রসাদ। শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে জমিদার বাড়িতে বাঈ আসে কয়েক যুগ ধরে তবে এবারের আমন্ত্রণ অন্য উদ্দেশ্যে। সূর্য-প্রসাদ জানতে চায় একটা বিশেষ তথ্য আর সেই সঙ্গে একটা পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যও তাকে আনতে চায়।

নির্দিষ্ট দিনে বাঈয়ের আগমন হয় জমিদার বাড়িতে। শুরু হয় সঙ্গীতের মূর্ছনা, বাতাসকে ভরিয়ে তোলে সুরের মায়াজাল। মুগ্ধ শ্রোতারা সঙ্গীতের মধ্যে

ডুবে থাকে। সবাই ডুবে থাকলেও সূর্য প্রসাদের মনকে স্পর্শ করতে পারে না বাঈয়ের কণ্ঠ নিঃসৃত সুধা। তার মনে তখন অন্য চিন্তা, কখন শেষ হবে সঙ্গীত তারজন্য অপেক্ষা করছিল। শেষ হতেই বাঈকে ডেকে পাঠাল নাচঘরে।

কী মতিয়া সাহানী আমাকে চিনতে পারছ—বাঈ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে না হোলেও অল্প সময়ের ব্যবধানের পর প্রশ্ন করল সূর্যপ্রসাদ।

মুন্নাবাঈ সূর্যপ্রসাদের কথা কোন দিকে প্রবাহিত হতে চলেছে তা বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। কী উত্তর দেবে বুঝে উঠতে পারে না।

আমার বয়স খুব কম ছিল সে সময় তবু না চেনার কথা নয়, থাক সে কথা, একটা প্রশ্ন করব উত্তর দেবে?—মুন্নাবাঈকে নিরুত্তর থাকতে দেখে সূর্যপ্রসাদই আবার কথা বলে উঠল।

বলুন রাজাবাবু।

আমার বাবাকে হত্যা করেছিলে কেন?

এটা আপনি কী বলছেন!

অস্বীকার করার চেষ্টা কোর না কারণ বিপ্রদাসের ডাইরি এখন আমার কাছে। এবার আশা করি স্বীকার করবে?

মুন্নাবাঈ তার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার কথার মধ্যে কতটা সত্য আছে তা বুঝে উঠতে পারে না। সূর্যপ্রসাদের কথাটা তার বিশ্বাস হয় না, বলে, কার ডায়রি পেলেন কী পেলেন না তাতে আমার কী।

আছে, তোমার সঙ্গে তার কতটা সম্পর্ক আছে জানতে চাও?—কথা বলতে বলতে সূর্যপ্রসাদ টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা ডাইরি বার করে আনল তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাঈয়ের মুখের উপর ছড়িয়ে রেখে তার প্রতিক্রিয়াটা বুঝতে চেষ্টা করল। এরপর ডাইরিটা খুলে পড়তে শুরু করল। কিছুটা পড়ার পর চোখের কোণ দিয়ে দেখল মুন্নাবাঈয়ের মুখের উপর আস্তে আস্তে ঘন হয়ে উঠেছে একটা কালো ছায়া, আষাঢ়ের মেঘ যেন ক্রমশই জড়ো হচ্ছে তার মুখের উপর।

মুন্নাবাঈ ভেঙে পড়েনি সহজে বেশ কিছুক্ষণ সাহসের স্তম্ভ জড়িয়ে ধরে ছিল কিন্তু সে স্তম্ভ হঠাৎ যেন ভেঙে পড়ল। বুঝল আত্মরক্ষার সমস্ত পথগুলো এক এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এক সময় সাহসের শিখাটা কেঁপে কেঁপে নিভে গেল আর তখনই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সূর্যপ্রসাদের পায়ের উপর — রাজাবাবু আমাকে ক্ষমা করুন, আমি — আমি — আমি···

মুন্নাবাঈ কথাটা শেষ করতে পারে না। সূর্যপ্রসাদ বোঝে তার অব্যক্ত কথা, বলে, তুমি বাঁচতে চাও? সত্যি যদি বাঁচতে চাও তাহলে আমি যা বলব করতে হবে—করবে?

হ্যাঁ করব, আপনি যা বলবেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব শুধু আমাকে বাঁচান রাজাবাবু। —দু'চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল বাঈয়ের।

যেভাবে আমার বাবাকে হত্যা করেছ ঠিক সেইভাবে বিপ্রদাসকে সরিয়ে দিতে হবে, পারবে ?

কথার উত্তর না দিয়ে মাথা নাড়ে মুন্নাবাঈ, যার অর্থ পারবে। এরপর অন্য একদিন সূর্যপ্রসাদ বিপ্রদাসকে ডেকে আনল তার নাচঘরে। বিপ্রদাসের দর্শন পাবার পর বলল, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, একটা প্রশ্ন করব আশা করি সদুত্তর পাব।

বলুন রাজাবাবু।

মুন্নাবাঈ ওরফে মতিয়া সাহানীর সঙ্গে পরিচয়টা আপনার অনেক দিনের—না ?

না—না মুন্নাবাঈকে চিনি আমি কিন্তু ওর যে আরো নাম আছে তা এই প্রথম শুনলাম আপনার কাছ থেকে। বিশ্বাস করুন মতিয়া না কী যেন নাম বললেন ওরকম নামের কাউকে আমি সত্যি চিনি না।

তাই কী! মুন্নাবাঈ অর্থাৎ মতিয়া সাহানীর ডায়রি ত' সে কথা বলছে না।

পড়ন্ত বিকেলের মত ধূসর একটা ছায়া যেন বিপ্রদাসের মুখের উপর আশ্রয় নিল। তাড়া খাওয়া জন্তুর মত তার অবস্থা, ভয়ের ছায়া চোখের তারায় স্পষ্ট। সূর্যপ্রসাদ স্থির দৃষ্টি মেলে তা লক্ষ্য করল প্রথম তারপর যেভাবে মুন্নাবাঈকে ডায়রি পড়ে শুনিয়েছিল ঠিক একই পদ্ধতিতে পড়ে গেল একটা ডায়রি। কয়েকটা পাতা পড়তেই বিপ্রদাসও মুন্নাবাঈয়ের মতন ভেঙে পড়ল।

সূর্যপ্রসাদ মনে মনে নিজের পিঠ নিজে চাপড়াল। এত সহজে কার্যোদ্ধার হবে ভাবেনি। বিপ্রদাসকে জানাল কীভাবে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে তার কাছ থেকে। যেভাবে তার বাবাকে হত্যা করেছে ঠিক সেই বিষ প্রয়োগ করে মতিয়া সাহানীকে শেষ করে দিতে হবে, একমাত্র এই শর্তেই বিপ্রদাস মুক্তি পেতে পারে।

বিপ্রদাস সম্মত হয়। এরপরের ঘটনা সহজেই অনুমেয় তবু বলি বিপ্রদাস এবং মতিয়া সাহানী উভয়েই পরস্পরের অজ্ঞাতসারে পান করেছিল সেই বিষ যে বিষের বিষক্রিয়ায় চলে যেতে হয়েছিল মহানন্দ প্রসাদকে। কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় অসহনীয় যন্ত্রণা। দু'জনই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বিদায় নেয় পৃথিবী থেকে।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম, তার কথা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ আমার মুখ থেকে কথা সরেনি। এক সময় বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে প্রশ্ন করলাম, ডাইরির ব্যাপারটা বোধগম্য হোল না, বুঝতে পারছি না ওদের দু'জনের ডাইরি কী করে সূর্যপ্রসাদের হাতে এসে পড়ল!

মেসোমশাই বললেন, তুমি জানতে না চাইলেও আমি বলতাম। আসলে সূর্য-প্রসাদের এটা ছিল একটা কৌশল। কোনো ডায়রিই তার হস্তগত হয়নি। ডায়রি দুটো ছিল তারই তৈরি। ভুল করেছিল বিপ্রদাস। একদিন আকণ্ঠ মদ্যপান করার পর মিলন সরকারকে বলে তার কৃতকর্মের কথা। নিজের হাতেই তুলে দেয় নিজের মৃত্যুবাণ। সমস্ত কাহিনীটা জানা যায় পদ্মাবতীর ডাইরি থেকে। পদ্মাবতী তার দিনপঞ্জীতে লিখে রেখে যায় সমস্ত ঘটনা সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরদের

জন্য রেখে যায় একটা নির্দেশ। যে বিষে মহানন্দ প্রসাদের মৃত্যু হয়েছিল সে বিষ ডাক্তারদের কাছেও ছিল অজ্ঞাত। তার বংশধরদের কাছে পদ্মাবতীর নির্দেশ ছিল— সেই বিষ যেন খুঁজে বার করার প্রয়াস চালিয়ে যায় তারা। ঐ বিষে আর কারো মৃত্যু না হোক এটাই তার মনের ইচ্ছে ছিল কি না তা প্রকাশিত হয়নি। ঠিক কী উদ্দেশ্যে সে ঐ নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিল তা অজ্ঞাত আজও। যাই হোক সূর্য-প্রসাদের পর তার ছেলে লক্ষ্মণপ্রসাদ সেই নির্দেশ পালন করার জন্য ডাক্তারি পড়ে। ডাক্তার হওয়ার পর চালিয়ে যায় অনুসন্ধান কিন্তু সেই বিষ অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। লক্ষ্মণপ্রসাদ নিজে ব্যর্থ হোলেও সেই নির্দেশের কথা ভুলতে পারে না, তার ছেলেকেও ডাক্তার করে তোলে এবং অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব দিয়ে যায় তাকে। আমিই সেই ছেলে। আজও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি। আমার পূর্ব-পুরুষদের এবং বিপ্রদাস ও মুন্নাবাঈ ওরফে মতিয়া সাহানীর কাহিনী যেন সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে আমাকে। আমার পূর্বসূরীদের কার্যকলাপের জন্য তাদের উপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, বরং এক এক সময় বিরক্ত বোধকরি এই ভেবে যে আমার শরীরের মধ্যেও আছে সেই দূষিত রক্ত। এ কথা যখনই মনে হয় তখনই বুকের মধ্যে অনুভব করি একটা কষ্ট, মনে হয় মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে আছে। এ কষ্টের থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় নেই এ কথা ত' জানি তবু ভাবি যদি সেই অজ্ঞাত বিষের সন্ধান পেতাম তাহোলে হয়ত কিছুটা শান্তি পেতাম।—এ পর্যন্ত বলে মেসোমশাই আমার উপর দৃষ্টি স্থাপন করে বললেন, কী একক এটা নিয়ে তোমার গল্প হতে পারে?

বললাম, অবশ্য, কাহিনী সৃষ্টি করার কথা বলব না কারণ এটা বাস্তব কিন্তু যেভাবে বললেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি কাগজ কলম নিয়ে বসলেও হয়ত আপনার মত সাজিয়ে পরিবেশন করতে পারতাম না।

এ কথাগুলো তুমি যদি লিখে দিতে তাহলে বাঁধিয়ে রাখতাম, কম বয়সে কবিতা লিখতাম, যা লিখতাম তা একটা বাঁধানো খাতার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকত অর্থাৎ সেই সব কবিতার বন্দিদশা ঘুচত না। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আমার প্রতিভার পরিচয় ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এর পরিণাম কী হয়েছিল শুনবে? আমি ক্লাসের চৌকাঠে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপের ঢেউ আছড়ে পড়ত আমার উপর, অনেক রকম মন্তব্য শুনতে হোত। কেউ বলত, লহ প্রণাম কবিবর, আবার কেউ কেউ আরো ভয়ঙ্কর মন্তব্য ছুঁড়ে আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করত না। প্রত্যেকের মুখেই দেখতে পেতাম বিদ্রূপের হাসি।

আমি মেসোমশাইয়ের কথা শুনে ঠোঁটের উপর হাসি টেনে এনে বললাম, সে কথা এখনো মনে করে বসে আছেন! আমার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল, আমার লেখাকে কেন্দ্র করে কম বিদ্রূপবাণ নিক্ষিপ্ত হয়নি তবে শুধুমাত্র বিদ্রূপ নয় প্রশংসাও পেয়েছি।

তোমার কথা স্বতন্ত্র; তুমি আজ প্রতিষ্ঠিত। সেদিন যারা তোমাকে বিদ্রূপ করেছিল আজ তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ নিশ্চয়ই তাছাড়া তাদের ঐ কাজের জন্য তোমার

কোনো ক্ষোভ নেই সম্ভবত, থাকার কথা নয়, বরং তারাই আজ তোমার করুণার পাত্র। আমার জীবনে সাফল্য আসেনি তাই কখনই বলতে পারব না সেদিনের সেই খোঁচার কথা একবারও মনে হয় না। হয়ত এত বছর পর ভুলে যাওয়া যেত কিন্তু যায়নি কিছু পূর্ব পরিচিত মানুষের জন্য। সেই সব মানুষদের সাথে দেখা হোলেই সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে ছাড়ে না, এখনো তাদের বক্তব্যের মধ্যে কী আছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না আমার। এখনো আমার কষ্ট হয়। কষ্টটা অন্য জায়গায়। সেদিনের খোঁচা হজম করে যদি কাব্য সাধনাকে ব্যাহত হতে না দিতাম তাহোলে হয়ত সাফল্য আসতে পারত আমার জীবনে। হয়ত বলবে আপনার জীবনে সাফল্য আসতে পারত এ কথা মনে হোল কেন। যদি এরকম প্রশ্ন কর তাহলে বলব এ ধারণা আমার এমনি হয়নি, এ ধারণার জন্ম দিয়েছে যে তাকে তুমি নিঃসন্দেহে রূপবতী আখ্যা দিয়ে বসতে পার। তার কথা তোমাকে বলতে পারি তবে আজ নয় অন্য আরেকদিন। দু'চার কথায় তাকে আমি তোমার কাছে মেলে ধরতে পারব না। তার কথা না শুনলে তুমি বুঝতে পারবে না সেই রূপবতীর কথা আমার কাছে কত মূল্যবান।

মাসিমা দীর্ঘ সময়ের পর দৃষ্টিটা বাইরের জগৎ থেকে বাসের অভ্যন্তরে ফিরিয়ে এনে বললেন, বুঝলে কিছু ?

আমি অমিত বিস্ময়ে তাকালাম মাসিমার দিকে। আমার এভাবে তাকানোটাই যথেষ্ট অর্থবোধক তবু মাথা দুলিয়ে জানালাম বুঝিনি কিছুই। বুঝে উঠতে পারছিলাম না মেসোমশাই কী বলতে চাইছিলেন এবং মাসিমাই বা প্রশ্নটা করলেন কেন। শুধু বুঝলাম একটা রহস্যাবৃত ঘটনা জড়িয়ে আছে ঐ কথার মধ্যে। একটা সন্দেহ মনের জানালা দিয়ে উঁকি দিল। যদিও মাসিমাকে দেখে মনে হয়েছে সুখের স্তবক হৃদয়ের পাত্রে এখনো বর্তমান তবু মেসোমশাইয়ের রূপবতী হয়ত কখনো না কখনো দুশ্চিন্তার ছায়া ফেলতে পারে তার মনে। আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে অবশ্যই দুশ্চিন্তার এবং সেই সঙ্গে কষ্টের ছায়া ফেলেছে কখনো।

কিছু বুঝলে না ত'? আমার হাতের শাঁখা দুটো সেই রূপবতীর হাতে থাকার কথা ছিল। এখন কিছু ভাবি না কিন্তু এক সময় ভাবতাম যার জন্য রোজ সিঁদুর ছোঁয়াই সিঁথিতে তাকে আরো একজন কাছে পেতে চেয়েছিল। সবই ত' খুলে বললাম এরপর বলতে পারবে না বোঝনি। —এ পর্যন্ত বলে মাসিমা হাসলেন।

আমার অনুমান অভ্রান্ত। বুঝলাম হৃদয়ঘটিত ব্যাপার। মাসিমা যাই বলুন-না কেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈর্ষা কিম্বা আক্রোশ ছিল না মেসোমশাইয়ের সেই রূপ-বতীর উপর। এই বৃদ্ধ দম্পতির দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কোনো ফাটল আছে বলেও মনে হোল না। বরং তাঁদের দাম্পত্য সুখ এত বছর পর যেন আঁচে বসানো দুধের মত ঘন। মনে মনে ভাবছি ওরকম একটা ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা শোভন নয় তাছাড়া বয়সটা একটা বড় প্রতিবন্ধক, যাকে ইচ্ছে করলেই যখন তখন অতিক্রম করা যায় না।

তুমি যা ভাবছ একক তা হয়ত আমি অনুমান করতে পারছি—শুনবে ?

আমার মুখের উপর চোখ রেখে মাসিমা এবং মেসোমশাই মিটিমিটি হাসতে থাকলেন।

মাসিমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বললাম, বলুন।

ভাবছ যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন না কেন তোমার মেসোমশাই—তাই না ?

আমি প্রশ্নের উত্তর দে'য়ার জন্য মুখ খুলবার সুযোগই পেলাম না তার পূর্বে মাসিমা আরো একটা প্রশ্ন করে বসলেন, ভাবছ রূপবতীর চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি অনেক দিন, খুব জ্বলেছি এরকম কিছুই ভাবছ—না ?

এবারও কিছু বলার সুযোগ পেলাম না মাসিমা আবারও বেজে উঠলেন, বিশ্বাস কর কখনো মনে হয়নি আমি ঠকেছি। অবশ্য সেরকমই মনে হোত যদি উনি সবিস্তারে সমস্ত ঘটনা না জানাতেন। শোনার পর তোমার মেসোমশাইকে ত' বটেই সেই সঙ্গে রূপবতীকেও আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। আর এই কারণেই রূপবতীর উপরও রাগ করতে পারিনি।

মাসিমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি এখনো।

পাবে। কাহিনীটা শোন আগে তারপরও যদি তোমার কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পার।—এ পর্যন্ত বলেই মেসোমশাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, কৈগো একককে বল না তোমাদের কাহিনীটা।

মেসোমশাই বললেন, বলব সে কথা ত' আগেই জানিয়েছি ওকে তবে এখন নয়।

তার কথার পর মাসিমা বললেন, আমি একটা গোপন কথা প্রকাশ করব ?

মেসোমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন, তোমার গোপন কথা এখনো আছে ! আমার ত' এতদিন ধারণা ছিল যে কোনো প্রতিষ্ঠানের উচিত ছিল তোমাকে তাদের প্রচারের কাজে লাগালো, আশি কোটি লোককে জানানোর সব থেকে ভাল মাধ্যম।

বাজে বোক না, ভারতবর্ষ বলে পুরুষরা মেয়েদের যা খুশি বলে পার পেয়ে যাচ্ছে।

কথাটা বলার সুযোগ পেলেন না বলে মাসিমা যে একটু রেগেছেন তা তার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পেল।

সেটা ঠিক অন্য দেশে শুধু নাক ডাকার জন্যই স্বামী পাল্টায়, এ ধরনের কথা বললে হয়ত হাজতবাসই করতে হোত।

হয়েছে এবার থামবে ?

মাসিমার কথার পর আমি বললাম, আপনার গোপন কথাটা কিন্তু শোনা হোল না।

মুড নষ্ট করে দিয়েছে তোমার মেসোমশাই।

মেসোমশাই হাসলেন, বললেন, আমি ত' জোক করছিলাম সিরিয়াস হোচ্ছ কেন ?

আমরা কথা বিনিময় করতে করতে ফিরে আসলাম হরিদ্বারে। ফেরার পথে অনেক কথা হোল মাসিমার সঙ্গে কিন্তু তার সেই গোপন কথাটা জানা হোল না, কিছুতেই বললেন না।

আমরা যখন হরিদ্বারে ফিরলাম তখন সূর্য তার সোনালী রং হারিয়ে ফেলেছে। আকাশকে দেখে মনে হচ্ছে বিবাহিতা রমণীর অলিক, তার মাঝে সিঁদুরের টিপ হয়ে আছে সূর্য। শুধু তাই নয় সমস্ত আকাশে যেন সোহাগের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। সেই লজ্জা ঢাকার জন্য যেন কালো শাড়ির আঁচলটা নামিয়ে আনছে কপালের উপর। দূর দিগন্তে গাছ-গাছালির মধ্যে পক্ষিশাবকদের অধীর প্রতীক্ষারও অবসান, মা-বাবা পাখির দল ফিরে আসছে আস্তানায়। ডানার ঝাপ্টানি, শিশু পাখিদের আনন্দোচ্ছ্বাস, মা-বাবা পাখিদের স্নেহের বীজন ছড়িয়ে দিয়ে তাদের কাছে টানার প্রয়াস আর সেই সঙ্গে কূজনে ভরে উঠল বাতাস। এরই মধ্যে হয়ত কোনো মাতৃহীন পক্ষিশাবক অনাহারে চিৎকার করে চলেছে, বিরামহীন এরকমই একটা চিৎকার যেন শুনতে পাচ্ছি আমি। হরিদ্বারের চারপাশের পর্বতশ্রেণীর ধূসর কূটে যেন রূপকথার সাম্রাজ্যের বিস্তার, না জানি কত দুর্বার দানব অপেক্ষা করে আছে পাহাড়গুলির অপর প্রান্তে, তমিস্রার আস্তরণ অতিক্রম করে তারা হাজির হবে পর্বত-শিখরে। এসবই কল্পনা তবু এভাবে না দেখলে কাব্য হয় কী করে এবং রূপকথারই বা সৃষ্টি হয় কী করে!

রাত্রে হরিদ্বারকে বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। দূর্, একথা বলি কী করে কারণ ঠিক কখন আমাদের যাত্রা শুরু তাই ত' জানতে পারিনি। সম্ভবত মাঝরাতে কোনো একসময় হরিদ্বারের সীমানা পেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। ট্রেনে রাত্রে দু'চোখের পাতা এক করার অভ্যেস আমার না থাকলেও পরপর কয়েক রাত্রি জাগরণের ফলে দু'লোচনের দীপশিখা জ্বেলে রাখতে পারিনি। যতক্ষণ অনড় কম্পার্টমেণ্টে বসে দু'চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখেছিলাম হরিদ্বারের প্ল্যাটফর্মের উপর ততক্ষণ কত কী যে চোখে পড়েছে তা দু'চার কথায় বলা সম্ভব নয় তবু বলি, কখনো দেখেছি জটাধারী সন্ন্যাসী প্ল্যাটফর্মের একপাশে বসে কল্কে ফুঁকছে আবার কখনো দেখেছি যাত্রীদের ব্যস্ততা। এক একটা ট্রেন আসছে আবার এক একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে। যখনই কোনো ট্রেন আসছে তখনই কোনো চিমনি থেকে যেভাবে গলগল করে ধোঁয়া নির্গত হয় সেভাবে ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টগুলো থেকে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে আসছে। যতক্ষণ জেগেছিলাম ততক্ষণ অনেক কিছুর মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রেখেছিলাম। কোনো একসময় দু'চোখের পাতা এক হয়েছিল আর সেই সময়ের মধ্যেই একসময় আমাদের ট্রেন হরিদ্বারের সীমানা অতিক্রম করে এসেছিল। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙেছিল যখন তখন ট্রেন দুরন্ত গতিতে কুয়াশার আস্তরণ বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে অমৃতসরের দিকে। রূপের ডালি সাজিয়ে ঊষা যখন এসে হাজির হোল তখন চন্দ্রা এবং চন্দ্রার মা এসে বসল আমার পাশে। বসেই চন্দ্রা ওর মা'র সাথে আমাকে পরিচয় করাল। বলল, মা'র সঙ্গে তোমার ত' আলাপ

হয়নি এখনো তাই নিয়ে আসলাম। অবশ্য মা'ই তোমার সাথে পরিচিত হতে চাইলেন। —চন্দ্রা কথা বলতে বলতে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য ঘন হয়ে বসল।

চন্দ্রার মাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আপনার মেয়ে আমার বন্ধু এ সংবাদ আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না যদি না পেয়ে থাকেন তাহোলে বলি আপনি আমার বন্ধুর মা, হিসেব মত আপনাকে মাসিমা বলা উচিত কিন্তু আমার আর আপনার মধ্যে বয়সের ব্যবধান খুব বেশি হবে বলে মনে হয় না—বৌদি ডাকতে পারলে ভাল হয়। আপনার কী অভিমত!

অবশ্যই বৌদি বলবেন, আমার কী ভাগ্য বলুন ত' আমার মেয়ের বন্ধু একজন প্রখ্যাত লেখক। আচ্ছা আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে চন্দ্রা ওর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাসির পাত্রী হয়ে উঠবে না ত'?

কেন?

কে বিশ্বাস করবে একক গুপ্ত ওর বন্ধু।

আমার আগামী উপন্যাস ওকেই উৎসর্গ করব, সেখানেই ওর সাথে আমার পরিচয়েব কথা জানিয়ে দেব।

আপনাকে দেখে কিন্তু বোঝাই যায় না আপনিই একক গুপ্ত।

কেন?

আমরা নামি-দামী লেখকদের যেভাবে ভাবি তার সঙ্গে আপনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না।

আমাকে যতটা দাম দিচ্ছেন ততটা দামি কি না জানি না তবে আমি নিজেকে খুব বেশি দামি কখনই মনে করি না, তাছাড়া আমি যেরকম আছি সেরকমই থাকতে চাই।

সত্যি বলছি এককবাবু আপনি ব্যতিক্রম।

আমরা যখন কথা বিনিময় করছি তখন চন্দ্রার বাবা এসে যোগ দিলেন আমাদের সাথে। উনি আসতেই বৌদি অর্থাৎ চন্দ্রার মা বললেন, তুমিও এসে গেছ!

এককবাবুর সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে পোষণ করতে কী আমি পারি না?—চন্দ্রার বাবা কথা বলতে বলতেই আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে পাশে এসে বসলেন।

আমি জানালাম তার সাথে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে আমারও ছিল। শুনে খুশি হলেন, বললেন, আমি ইঞ্জিনীয়ার, লোহা-লক্কর নিয়ে আমার কাজ। লোহা নিয়ে কাজ করতে করতে মনটাও বোধহয় লোহা হয়ে গেছে, সাহিত্য পড়বার ইচ্ছে সেই সঙ্গে অবকাশও নেই, যা একটু-আধটু পড়ি তা ক্রাইম অথবা রহস্য গল্প, ভাল সাহিত্য পড়ি না বললেই চলে তবু যে ক'খানা পড়েছি তার মধ্যে আপনার দু' একটা লেখা ছিল। অনুগ্রহ করে বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করবেন না করলে অসুবিধায় পড়ব। আপনাদের সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না বললেই চলে। তা সত্ত্বেও একটা কথা

বলতে পারি, আপনার লেখা ভাল লেগেছিল। আমার অর্ধাঙ্গী কিন্তু আপনার লেখার ভক্ত। বোধহয় সবকটি বই ওর পড়া।

চন্দ্রার বাবার এই স্বীকারোক্তি আমার ভাল লাগল। বললাম, আমার সৌভাগ্য কী জানেন আপনি এত কম বই পড়েন এটা ভাল লাগছে না ঠিক কিন্তু যে অল্প সংখ্যক বই পড়েছেন তারমধ্যে আমার দু'-একটা বই স্থান পেয়েছে এবং তা আপনার ভাল লেগেছে।

দুরন্ত গতিতে ট্রেন বাতাসের পর্দা ছিঁড়ে এগোচ্ছিল। একটানা একটা যান্ত্রিক শব্দ যেভাবে বাড়ছিল তাতে বুঝতে পারছিলাম ট্রেনের গতি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিছুক্ষণ পূর্বে ঊষার অধরে যেন খুশির বিস্তার ছিল কিন্তু মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই সে খুশি অন্তর্হিত হোল। ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল আকাশ। কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত আকাশে। একটু আগে মসীলিপ্ত আঁধার ছিল জানালার বাইরে, মিনিট দু'-তিন পর বৃষ্টি নামল, খুব জোরে নয় ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে থাকল। ঠাণ্ডা বাতাস বৃষ্টির জলকে জড়িয়ে নিয়ে যেন হামাগুড়ি দিয়ে শার্সির নিচের সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে কম্পার্টমেণ্টে ঢুকছে। আমার কথার পৃষ্ঠে কিছু একটা বলল চন্দ্রার বাবা, ট্রেনটা তখন ব্রীজের উপর, প্রচণ্ড গমগম শব্দের মধ্যে ডুবে গেল তার কথা। চন্দ্রা চোখ দুটো শার্সির গায়ে ঠেকিয়ে, অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে ব্রীজটাকে দেখবার চেষ্টা করছে। চন্দ্রার মা ওকে সরে আসার নির্দেশ দিলেন। দু একটা ছাড়া কোনো কথাই বোঝা গেল না তবু মেয়েকে কী বললেন সেটা অনুমান করতে অসুবিধা হোল না। শার্শির নিচের ফাঁক দিয়ে জল চুঁইয়ে চন্দ্রার জামার অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়েছে। আমি ওকে সরিয়ে আনলাম জানালার কাছ থেকে। ইতিমধ্যে ট্রেন ব্রীজটাকে অতিক্রম করল। আবার আমাদের শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক হোল। চন্দ্রা জামা ভেজানোর জন্য আমাদের কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল। চন্দ্রার বাবা-মা কিছুটা বিরক্ত হয়ে ওকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। ওরা চলে যেতেই আমার স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া কিছু করণীয় থাকল না। বৃষ্টি এতক্ষণ ঝিরঝির করে পড়ছিল হঠাৎ যেন উন্মাদের মত লাফিয়ে নামল। বৃষ্টি অন্ধকারকে যেন শতগুণে বাড়িয়ে তুলল। কিছুক্ষণ বৃষ্টির উপর চোখ রেখে নিজের মধ্যে ডুবে থাকলাম। খুব বেশিক্ষণ নয় দশ-বারো মিনিট তারপর উঠে এসে চাচিজীর কাছে গিয়ে বসলাম। আমি আসব এটা যেন উনি আগে থেকেই জানতেন, যেন আমার প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন। আসতেই বললেন, এসো,—বলে কিছুটা সরে বসার জায়গা করে দিলেন।

আমি বসে বললাম, আপনার এবং আপনার গুরুজীর জন্মভূমিতে যাচ্ছেন অনেক বছর পর—নিশ্চয়ই প্রচণ্ড খুশি আপনি?

আমার প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, এটা কী একটা প্রশ্ন হোল! এত বছর পর দেশে ফিরলে কার না আনন্দ হয় বল! অনেক বছর পর যাচ্ছি গিয়ে দেখব হয়ত অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিচিতরা কে কোথায় আছে তা-ও জানি না তাছাড়া

তাদের অনেককেই আজ দেখলেও চিনতে পারব কি না জানি না এবং তারাও যে আমাকে চিনতে পারবে এরকম নিশ্চয়তাও নেই, কত বছর—কত বছর দেশ ছাড়া। গুরুজী এখন কিরকম আছেন তা ও জানি না। —চাচিজী কথা বলতে বলতেই অতীতের মধ্যে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেলেন। বুঝতে পারছিলাম ওনার মধ্যে তোলপাড় করছে পুরনো অনেক স্মৃতি। অনেকক্ষণ নিজের মধ্যে ডুবে থাকলেন চাচিজী। আমি নীরবতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করে বসে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঐ ভাবে বসে থাকার পর চাচিজীকে দেখলাম বহু শতাব্দী পেরিয়ে যেন আসলেন বর্তমানের প্রাঙ্গণে, বললেন, সত্যি একক আজ আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না, অবশ্য কতটুকু সময়ই বা থাকতে পারব সেখানে! সম্পূর্ণ দুটো দিনও নয়, এই সময়ের মধ্যে একটা দিন গুরুজীর সান্নিধ্যে থাকতে চাই। বাদ বাকি সময়টাতে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদের খুঁজে পেতে চেষ্টা করব।

আমাদের সঙ্গে জালিয়ানাবাগ, স্বর্ণমন্দির এবং দুর্গামন্দিরে যাবেন না?

কী করে যাব বল?

না চাচিজী সেটা করবেন না, আপনি না থাকলে আমার ভাল লাগবে না।

এটা কী তোমার মনের কথা?

সম্পূর্ণ অকৃত্রিম।

তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে থাকব তবে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে ছেড়ে দিও। এতদিন বাদে এসে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের খুঁজে না দেখাটা অন্যায় হবে।

চাচিজী আজ একটা ঘটনা মনে পড়ছে — শুনবেন?

বল।

আপনার মাকে ত' আপনি অনেক ছোট বয়সে হারিয়েছেন কিন্তু নিজে মা হয়ে বুঝতে নিশ্চয়ই পারছেন এত ছোট্ট কথাটা কত ব্যাপক। কী বিরাট তার পরিধি, স্নেহ-মায়া-মমতার এত বড় আধার আর হয় না। আমার মাকেও হারিয়েছি অনেক ছোট বয়সে, কতই বা বয়স হবে তখন আমার খুব বেশি হোলে বারো কিম্বা তেরো। ঐ ক'টা বছর মা যেন আমাকে আঁচলের নিচে রেখে দিতে চাইত। আমার যখন বয়স দশ-এগার তখন এমন একটা ঘটনা ঘটে যা আজও আমি ভুলতে পারিনি। এন্টালির পদ্মপুকুরে থাকতাম আমরা। যেখানে থাকতাম তার পাশের ফ্ল্যাটে থাকত একটা তিনজনের পরিবার— আমার বয়সের একটা ছেলে এবং তার মা-বাবা। সেই ছেলে-টার ছিল অদ্ভুত ধরনের এক প্রবণতা, ওর কার্যকলাপ আজও আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। ও প্রায়ই আমাকে ডেকে নিয়ে যেত ওদের ফ্ল্যাটে। গল্প করত, খেলত এবং মাঝে মাঝে আমাকে বিভিন্ন ধরনের উপহার দিত। প্রথম প্রথম আমি নিতে চাইতাম না কিন্তু ওর বারবার অনুরোধে আমাকে নিতেই হোত। একদিন একটা ছোট্ট বাক্স আমার হাতে দিয়ে বলল, এটা বাড়ি গিয়ে খুলবি। —সেদিন ঘরে ফিরে বাক্সটা

খুলে আশ্চর্য হয়ে যাই, বাক্সের মধ্যে একটা দামি পেন। ঐ বয়সে পেনের দাম সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু ওটা যে যথেষ্টই দামি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। সেদিনই বাবা বাড়ি ফেরার পর আমাকে ডাকলেন তার ঘরে। আমি ঢোকার সাথে সাথে যেন ফেটে পড়লেন, একক তুই কী সঞ্জয়বাবুর ফ্ল্যাট থেকে পেনের একটা বাক্স নিয়ে এসেছিস? বাঁদর ছেলে শেষ পর্যন্ত চুরি করতে শুরু করেছিস, দাঁড়া আজ তোর পিঠের ছাল আমি ছাড়িয়ে নেব। — আমি বিস্মিত হয়ে বলি, ওটা আমাকে রঞ্জু দিয়েছে। কিন্তু বাবা বিশ্বাস করলেন না, বললেন, মিথ্যে কথা। —বলেই টেবিলের উপর থেকে বেত নিয়ে আমাকে পেটাতে শুরু করলেন। আমি সেদিন প্রতিবাদ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম, আসলে বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমার অপরাধটা কোথায়। এর আগে বাবা আমাকে কোনোদিন ঐ ভাবে মারেননি, পিঠের চামড়া কেটে রক্ত ঝরছিল। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল বলে মা ঢুকতে পারছিল না কিন্তু দরজার অপর প্রান্তে মা'র কান্নাজড়ানো প্রচন্ড চিৎকার ভেসে আসছিল। সেদিন রাত্রে প্রচন্ড জ্বরের কবলে পড়ে আমি শয্যাশায়ী হোলাম, সমস্ত শরীর কাঁপছিল, বেহুঁস হয়ে পড়েছিলাম বিছানায়। শুনেছি সমস্ত রাত মা চোখের জল ফেলেছে আর ভগবানকে ডেকেছে। পরের দিন জ্বর কমে গিয়েছিল কিন্তু বাবার সাথে মা দিন সাতেক কথা বলেনি। বাবা পরে বুঝতে পেরেছিলেন আমি নির্দোষী ছিলাম। তিনিও কম কষ্ট পাননি। অনেক ভাবে সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মাকে, মা বুঝেছিল কি না বলতে পারব না কিন্তু বাবার কথার উত্তর দেয়নি; এত কথা বললাম কেন জানেন? আজ আপনাকে আমার অনেকটা মায়ের মত মনে হচ্ছে।—আমার কথা শেষ হোতেই চাচিজীর চোখের উপর চোখ পড়ল, দেখলাম তার চোখ দুটো বড় বেশি উজ্জ্বল, চোখের তারায় আলোর প্রতিফলন দেখে মনে হোল লবণাক্ত নীর জমে আছে সেখানে, প্রশ্ন করলাম, আপনি কাঁদছেন?

আমার প্রশ্ন শুনে প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না, উপরের চোখের পাতা নামিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করলেন সত্যি চোখে জল জমতে শুরু করেছে কি না, যখন বুঝলেন আমার বক্তব্যের মধ্যে সত্য আছে তখন বললেন, চোখে যখন জল আছে তখন কাঁদছি না একথা বলি কী করে তবে যে অশ্রু তুমি দেখতে পাচ্ছ তাকে নিঃসন্দেহে আনন্দাশ্রু বলতে পার। আনন্দের বন্যা যখন মানুষের মনকে প্লাবিত করে ফেলে তখন তার বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। ঘনীভূত আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তখন এভাবেই হয়।

চাচিজীর কথা শেষ হোতেই আমি বললাম, যে ঘটনাটা জানালাম তা সম্পূর্ণ নয়, শুধু আমার একটা অনুভূতি বোঝানোর জন্য ঘটনার কিছুটা অংশ ব্যক্ত করলাম। এর পরবর্তী অংশটা শুনবেন?

বল, চুপ করে থাকলে মনে হয় আমরা ফুরিয়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণই শুধু মনে হয় আমরা বেঁচে আছি।

আমি আমার বক্তব্য শুরু করার পূর্বে ভাবলাম একটু আড়ালে গিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া গিলে আসব কি না, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা আছে কি না দেখে নিলাম। দেয়াশলাইতে হাত ঠেকে যাওয়ার সামান্য শব্দ হোল। সম্ভবত চাচিজী শব্দটা শুনতে পেলেন সেই সঙ্গে আমার মন-বাসনা তার কাছে অজ্ঞাত থাকল না, বুঝলাম তার কথাতে, বললেন, তুমি নিঃসংকোচে এখানে বসেই খেতে পার আমি কিছু মনে করব না। —তার কথার পরও ধরাতে পারলাম না, একটা সংকোচ আমাকে ঘিরে থাকল। উনি আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, এত সংকোচ কেন আমি বলছি তুমি ধরাও—কৈ ধরাও। —এরপর আমি দ্বিধা কাটিয়ে ধরিয়ে ফেলি।

একটু অস্বস্তি হচ্ছে—না ? পরে ঠিক হয়ে যাবে, এবার বল।

আমি ঘন ঘন কয়েকটা টানে সিগারেটের অর্ধেকটা শেষ করে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলাম তারপর শুরু করলাম বলতে সেই অসমাপ্ত ঘটনা। —সেদিনের সেই ঘটনার পর রঞ্জুর সাথে দেখা হোতেই আমি ওকে কাছে ডেকে বলি, রঞ্জু বাবার কাছে মার খেয়েছি বলে আমার কোনো দুঃখ নেই, কষ্টটা কোথায় জানিস ? মা-বাবা কষ্ট পাচ্ছেন বলেই আমার কষ্ট, বাবা বুঝতে পেরেছেন আমি নির্দোষী আর বুঝেছেন বলেই যেন অপরাধীর মত আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।—রঞ্জু কিছুক্ষণ বোবা-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে তারপর একসময় অপরাধীর মত মুখ নত করে বলল, সত্যি কাজটা আমার ঠিক হয়নি, এবারের মত ক্ষমা করে দে আর কোনোদিন এ ভুল করব না। —সত্যি এরপর আর কখনো কিছু করেনি যাতে আমি বিপদে পড়ি কিন্তু আমার সঙ্গে না করলেও ওর অভ্যেস থেকেই গেল। স্কুলের বন্ধুদের নামে মাস্টার মশাইয়ের কাছে মিথ্যে অভিযোগ করে মার খাওয়াত। আমি লক্ষ্য করতাম এ ধরনের কাজের মধ্যে ছিল ওর পৈশাচিক আনন্দ। ওকে ঐ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত রাখার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, ফল কিছু হয়নি। এই রঞ্জুই একদিন জড়িয়ে পড়ল এক ভয়ংকর অপরাধের মধ্যে। পড়ে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিল ঐ অপরাধের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। এরপর অর্থাৎ এই ঘটনার পর ওর জীবনে আসল পরিবর্তন। আজ ও একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। বিখ্যাত আইনজীবি রজনীকান্ত সমাদ্দারই সেদিনের রঞ্জু।—এ পর্যন্ত বলার পর চাচিজীকে বললাম, আমি ত' একাই বকে মরছি আপনি কিছু বলুন। আমার কর্ণদ্বয়কে সজাগ রাখি মানুষের কথা শুনব বলে, মানুষের মুখ-নিঃসৃত বচন আমাকে ভরিয়ে রাখে আর আপনার কথা যেন আমার কাছে সুধার পাত্রের মধ্যে ঠোঁট স্পর্শ করিয়ে রাখার মতই সুখদায়ক।

কী বলব ? তোমার মত সাজিয়ে কথা বলতে পারি না, যা বলি তা এলোমেলো ভাবে শুধু নিজের কথা, নিজেকে বাদ দিয়ে কোনো কথা গুছিয়ে বলতে পারি না। একটু আগে তোমাকে একটা কথা বলেছি—মনে আছে ? যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণই

মনে হয় বেঁচে আছি, যা বলেছি তা ঠিক তবু তোমার মতন সাজিয়ে কথা বলতে পারি না বলে কথার ফুলঝুরি হয়ে উঠতে পারি না, এটা যেমন সত্যি সেরকম কথা না বলে নীরবতার কক্ষে অর্গল তুলে বসে থাকি না এটাও ততটাই সত্যি তবে কী জান যা বলি তা ঠোঁট বিযুক্ত না করেই বলি। কথাটা শুনে অবাক হোচ্ছ না? ভাবছ মুখ বন্ধ রেখে আবার কীভাবে কথা বলা যায়! কী একথাই ভাবছ ত'? আমি নিজের সঙ্গে কথা বলি যাকে ইংরেজীতে বলে 'মনলগ'। প্রায় সব সময়ই নিজের সঙ্গে কথা বলছি, নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি এবং নিজেই তার উত্তর খুঁজে বেড়াই। আমার ত' অনেক কথাই তুমি শুনেছ, আজ আমার মনে হয় কিছুই বলার নেই, যেদিন একা ছিলাম, নিজেকে একা মনে হোত সেদিন অনেক কথা ছিল, অনেক কিছু বলার ছিল অথচ সেদিন কেউ এসে বলেনি, দিলরী তোমার কথা বল। শুধুমাত্র গুরুজীকে জানিয়েছিলাম আমার কথা। আজ আমি সব পেয়ে গেছি। সব পাওয়ার পর ত' কোনো কথা থাকে না একক।

আমি চাচিজীর কথা শেষ হতেই বললাম, কথার কী শেষ আছে? নেই; কথার সিঁড়ি বেয়েই ত' সুখের নাগাল পায় মানুষ আবার কথাই মানুষকে ঠেলে দেয় অশান্তির সমুদ্রে, আসলে কথা ত' একটা মাধ্যম মাত্র। অনেক কিছু জানবার অনেক কিছু বুঝবার মাধ্যম। এই যে আপনাকে আমি জানলাম অথবা আপনি আমাকে জানলেন সে ত' কথার জন্যই।

চাচিজীকে যা বললাম তার বাইরে অনেক কিছু জড়ো হয়ে আছে মনে। মানুষের মনের মধ্যে ডুব দিয়ে যা পেতে চাই তা ত' শুধু কথার জন্যই পাই, কথার আঁকশি দিয়ে একটু একটু করে এক একটা মনকে নিয়ে আসি নাগালের মধ্যে। অনেক কথা জড়ো হয়ে এক একটা মানুষের মনের ছবি হয়ে যায়। এক একটা কথা যেন বর্ণালীর মত মানুষের মনের শত-সহস্র রংকে বিচ্ছুরিত করে। আমি সযত্নে তা লিপিবন্ধ করি। এক একটা চরিত্র যেন শুধুই কথা, কথার মালঞ্চে বিচরণ করাই তার কাজ, তার লুকোবার জায়গাগুলোতেই যেন উন্মুক্ত গবাক্ষ আর এই কারণেই সে নিজেকে জাহির করে বসে থাকে। এছাড়া আর যারা তারাও আমার কথার জালে আবদ্ধ। কথার জাল বুনেও সৃষ্টি করি অনেক চরিত্র তবে সেসব চরিত্রগুলো যে পুরোপুরি কল্পনার সিন্দুক থেকে বেরিয়ে আসে তা নয়। না দেখা দৃশ্যকে এবং সেই সঙ্গে চরিত্রগুলোকে দেখাই কথার দর্পণে।

কী ভাবছ একক?—প্রশ্ন করলেন চাচিজী।

বলার মত কিছু ভাবছি না।—বলে দু'লোচনের দীপশিখা দিয়ে কম্পার্টমেন্টের বাইরের জগতকে আরতি করতে থাকলাম।

॥ সাত ॥

অমৃতসরে পৌঁছলাম আমরা দশটা পঁয়তাল্লিশে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের এক-ঘণ্টা পরে। পৌঁছেই ব্যস্ততার সাথে স্নান-খাওয়ার কাজটা সারতে হোল। দুপুরের

খাদ্য পেটে পড়ার পর অনেকের ইচ্ছে ছিল একটু গড়িয়ে নিতে কিন্তু সে সুযোগ হোল না, বিকাশবাবু জানালেন যে জন্য আসা তা গড়িয়ে নিতে গেলে—হবে না। এক্ষুনি না বেরোলে স্বর্ণমন্দির, জালিয়ানাবাগ এবং দুর্গামন্দির দেখা সম্ভব হবে কি না বলা শক্ত। আর এই কারণে খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হোল আমাদের। বেরিয়েই একটা টাঙায় উঠলাম আমরা তিন বন্ধু এবং সুরেখা ও চাচিজী। অন্য কয়েকটা টাঙায় অন্যান্য যাত্রীরা। হঠাৎ কোনো একটা টাঙা থেকে ভেসে আসল ভারী বেসুরো কণ্ঠস্বর—পথের ক্লান্তি ভুলে······বল মা কতদূর আর কতদূর। বাইরে বেরোলে অনেকেই অনেক কিছু বাসস্থানে রেখে আসে, আর এই কারণেই প্রত্যেকে অনেক সহজ সরল হয়ে ধরা দেয়, কৃত্রিমতার বেড়াগুলো সরে যায়। ফলে সত্যিকারের চেহারাটা যেটাকে আড়াল করে রাখতে হয়, সেটা বাইরে বেরোলে খুব সহজেই প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

একক এর পূর্বে ত' কখনো এদিকে আসনি, আসলে জানতে যা দেখতে চলেছ তা আর কোথাও নেই।—চাচিজী টাঙায় ওঠার পর প্রথম কথার ভাণ্ডারের দরজাটা খুলে দিলেন।

স্বর্ণমন্দিরের কথা বলছেন ত' ?

হ্যাঁ, এ ধরনের মন্দির আর একটিও নেই ভারতবর্ষে একথা তোমাকে ইতিপূর্বে জানিয়েছি কিন্তু শুধুমাত্র এ কথাতেই ঐ মন্দির সম্পর্কে সব বলা হয় না। এমন অপূর্ব দেবদেউল সম্বন্ধে যা কিছুই বলি না কেন তা অতি নগণ্য বলে মনে হবে। তোমার মত ভাষাবিদও এর সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। দেখ তারপর আমার অনুমান ভুল না নির্ভুল সে সম্বন্ধে বোল। এই মন্দির আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই আমি গুরুজীর দেখা পেয়েছিলাম।

অমৃতসরের লোকসংখ্যা কম নয়, কলকাতার মত না হোলেও রাস্তায় হেঁটে চলেছে অনেক লোক। কখনো অপ্রশস্ত আবার কখনো চওড়া রাস্তা অতিক্রম করে চলেছি আমরা স্বর্ণমন্দিরের দিকে। এখানের রাস্তা-ঘাট কলকাতার মত হোলেও একটা বৈষম্য চোখে পড়ার মত, রাস্তার দু'ধারে দোকানপাট কলকাতার মত অগুনতি নয়, বরং বলা চলে এখানে দোকানপাট নেই বললেই চলে। পরে জেনেছিলাম দোকানপাট সর্বত্র ছড়ানো-ছেটানো নয়—সবই মণ্ডিতে অর্থাৎ সব ধরনের দোকান বাজারে অবস্থিত। এছাড়া আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ার মতন, অসংখ্য মানুষজন রাস্তার দু'ধারে কিন্তু তাদের আচার-আচরণ খুবই সংযত। আরো অনেক কিছুই চোখে পড়ছিল যার সঙ্গে কলকাতার শহুরে জীবনের যে চিত্র দেখতে অভ্যস্ত আমরা তার সঙ্গে মেলে না।

চাচিজী কথা বলতে বলতে নিজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, তাকে আজ অন্য রকম মনে হচ্ছিল, ঠিক কী রকম তা হয়ত সঠিকভাবে ব্যক্ত করতে পারব না তবে একটা কথা বলতে পারি এ চেহারার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার পরিচয় হয়নি, অনেকটা যেন কোনো মূল্যবান হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফিরে পাওয়ার আনন্দ ওনার চোখে-

মুখে দেখতে পাচ্ছিলাম এবং এছাড়া আরো কিছু ছিল তার চেহারায়। একসময় আমাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমরা যে রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছি তার আদি চেহারাটা ছিল অন্যরকম। শুধু রাস্তাই নয় বাড়ি-ঘর-দোরের চেহারাও ছিল অন্যরকম, এত প্রশস্ত রাস্তা এবং বাড়ি দেখে প্রথমে চিনতেই পারিনি। এই রাস্তার শেষ প্রান্তে একটা দোকান ছিল, সেই দোকানের পাশ দিয়ে ছিল একটা অপ্রশস্ত গলি, গলির ভেতর বাঁ দিকের তৃতীয় বাড়িটায় থাকতাম আমরা। এখন সেই দোকানও নেই এবং সেই গলিও নেই।—এ পর্যন্ত বলেই চাচিজী এক দৃষ্টিতে রাস্তার বাড়িগুলো নিরীক্ষণ করতে থাকলেন। আজকের এই বিবর্তন তাকে ব্যথিত করেছে বুঝতে পারলাম। হয়ত অনেক আশা ছিল তার সেই পুরনো বাড়িটাকে দেখতে পাবেন যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতীতের অনেক স্মৃতি। অল্প কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানের পর অস্পষ্টভাবে চাচিজী নিজেকেই যেন বললেন, সেদিন যেটা বর্তমান ছিল আজ তা অতীত, আজ যেটা বর্তমান সেটাও একদিন অতীত হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যৎ! তাও একদিন অতীত হয়ে যাবে অথচ অতীত অতীতই থাকবে।—এরপর সম্ভবত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অতীত কী সব সময়ই মৃত! মানুষের কাছে তার কী কোনো প্রয়োজন নেই!

সুরেখা প্রশ্নের জবাব দিল, বলল, না মা অতীত মৃত নয়, অতীত আমাদের সব কিছু, অতীত—স্মৃতি, যে স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই আমরা। বর্তমানকে কাজে লাগাই ভবিষ্যতকে সুন্দর করার জন্য, সেই সুন্দর ভবিষ্যতই একদিন সুন্দর বর্তমান হবে, তারপর সেই বর্তমানই একদিন অতীত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চলার পথের পাথেয় হবে।

চাচিজী সুরেখার কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন, ঠিক-ঠিক অতীত ভবিষ্যৎ বংশধরদের চলার পথের পাথেয়। অতীত মৃত নয়, অতীত ত' ইতিহাস।

এবার আমি বললাম, আর ইতিহাস আমাদের সঠিক পথে চলার নির্দেশ দেয়। মানুষের বর্তমান যেরকম আছে সেরকম ভবিষ্যৎও আছে এবং অতীতও আছে। আর এই অতীত আছে বলেই মানুষ আজ সাফল্যের সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতিক্রম করে চলেছে। পশুদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই, শুধু বর্তমানকে নিয়ে তারা বেঁচে আছে এবং সেইজন্য তারা হাজার হাজার বছর ধরে একটা জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

আমার কথা শেষ হতেই চন্দ্রা গলা নামিয়ে বলল, দি এন্ড, আমরা এসে গেছি, নো মোর কচ-কচানি এ্যান্ড নেমে পড়া।

ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম আমি, বললাম, তোমার কথা শুনে এক ভারতীয় যেভাবে এক ইংরেজকে বুঝিয়েছিলেন তার হাতের হ্যারিক্যানটা কী ভাবে ভেঙেছে সে কাহিনীটা মনে পড়ে গেল।

বল শুনব।

আমি আরো একবার হাসলাম তারপর জানালাম কাহিনীটা। এক ভারতীয়

যখন কর্মরত তখন তার হ্যারিক্যানটার উপর দুটো ঝগড়ারত চিল এসে পড়ে ফলে তার হাতের হ্যারিক্যানটা মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। তার উর্ধ্বতন কর্মচারিটি ছিল ইংরেজ। হ্যারিক্যানটা ভাঙার কারণ যখন ভারতীয়র কাছে সে জানতে চাইল তখন ভারতীয় ঘটনাটা এভাবে জানাল—টু কাইট ইস ডুয়িং ফাটাফাটি ইন দি স্কাই এ্যান্ড অবশেষে ফলন এবাভ দি হ্যারিক্যান, ফলে হ্যারিক্যান ড্রপ অন দি মেঝে এ্যান্ড ব্রোকন।

আহা আমার অবস্থা যেন ওরকম, আমি ত ইচ্ছে করে ওভাবে বললাম।

চন্দ্রার কথার সমাপ্তির পর আমি কিছু বলতে পারলাম না কারণ ইতিমধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমাদের সবকটি টাঙা পরপর দাঁড়িয়ে পড়েছে। টাঙা থামতেই আমরা নেমে পড়লাম। নেমেই যা দেখলাম তা নিঃসন্দেহে বলা যায় আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বর্ণমন্দিরের সম্বন্ধে যা শুনেছি তা দেখার পর মনে হোল চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে মাত্র চার আঙুলের ব্যবধান হোলেও দূরত্ব অসীম। যা শুনেছি তা অতি নগণ্য। ভেতরে প্রবেশ করার পর মনে হোল এত বড় এবং এমন অপূর্ব মন্দির আমার দু'লোচনের দর্পণে কখনো প্রতিফলিত হয়নি। এরকম একটা বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করেছিল তা ভাবতেই পারা যায় না। স্বর্ণাভ দেউলটি সূর্যের সোনালী আলোতে ঝলমল করছে। মূল মন্দিরের চারপাশে জল, সেই জলে মন্দিরের প্রতিবিম্ব তিরতির করে কাঁপছে। জলের চারপাশে পাথর বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। এই চত্বরের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছলাম যেখান থেকে একটা সড়ক জল অতিক্রম করে মন্দির পর্যন্ত গেছে অর্থাৎ এই একটি মাত্র সেতুর সাহায্যেই মূল মন্দিরে আসা যায়। দেউলটিতে পৌঁছে যে শিল্পকর্ম অবলোকন করলাম তা এককথায় অতুলনীয়। মনে মনে সেইসব অপরিচিত নামগোত্রহীন শিল্পীদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালাম যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এই মন্দির হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যের সাম্রাজ্যের সম্পদ। আমরা স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়ে আসলাম যখন তখন রোদ অনেক ছোট হয়ে গেছে। রাস্তায় পা দিয়েই পরম বিস্ময়ে দু'লোচনের পাপাড়দ্বয়কে মুহূর্তের জন্যও যুক্ত করতে পারলাম না। এমন একজনকে দেখতে পেলাম যার দেখা এখানে পাব ভাবতেই অবাক লাগছিল। নীতার থাকার কথা বাংলাদেশের কোন অখ্যাত গ্রামে অথচ তাকেই দেখতে পাচ্ছি এখানে! প্রথমে নীতাকে আমি চিনতে পারিনি। না পারারই কথা—ফোলানো-ফাঁপানো চুল, লম্বা নখে চকচকে পালিশ, চোখে ফোটোক্রোমাটিক গ্লাস, পরনে ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের দামী সিনথেটিক শাড়ি। উর্ধাঙ্গে লো-কাট ব্লাউজ, সেই ব্লাউজ টপকে বেআব্রু যৌবন ভীষণভাবে দৃষ্টিকে আহত করে। এ যেন আমার চেনা নীতা নয়, অন্য কেউ। রাস্তায় পা দিতেই চোখ চলে এসেছিল ওর উপর। খুব চেনা-চেনা ঠেকছিল কিন্তু তখনই ওকে ঐ পরিবেশে এবং চেহারার মধ্য থেকে আবিষ্কার করতে পারিনি। যদিও চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল তবু ওর দিকে খুব বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারিনি। যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যৌবনের সম্ভার আর আমন্ত্রণ তার দিকে বেশিক্ষণ চোখ রাখা

সুশোভন নয়। ওকে চেনা-চেনা মনে হোলেও ও একটু বাদে নিজে এগিয়ে এসে কথা না বললে আমি কথা বলতে ভরসা পেতাম কি না সন্দেহ।

এককদা তুমি এখানে?—নীতার দৃষ্টিতে আমি ধরা পড়তেই ও এগিয়ে এসে প্রশ্নটা করল।

আমার চোখে বিস্ময় তখনো অন্তর্হিত হয়নি তাই ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছুটা বিলম্ব হোল। পরে যখন বুঝলাম এভাবে নিরুত্তর থাকা ঠিক নয় তখন বললাম, নীতা ত'! আমারও তোমার সম্বন্ধে একই প্রশ্ন, এছাড়া আরো অনেক প্রশ্ন মনে ভিড় করে আছে। ভাবতে পারছি না আমি তোমাকেই দেখছি কি না!

হ্যাঁ আমিই সেই নীতা—নীতা সেন। তোমার প্রশ্নগুলো আমি অনুমান করতে পারছি সেসব প্রশ্নের উত্তর তুমি পাবে তবে তার পূর্বে আমার উত্তরটা আশা করছি।

আমার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়ানোর সংবাদ ত' তোমার অজানা নয়। তুমি ত' জানই চারদেয়ালের মধ্যে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না আর এই কারণেই এখানে দেখতে পাচ্ছ আমাকে। এবার তুমি বল।

দু'চার কথায় আমার কোনো কিছুই তোমাকে জানাতে পারব না, এক কাজ কর তোমার ঠিকানাটা আমাকে জানাও, আমি তোমাকে খুঁজে নেব।

কিছুই কী বলা যাবে না? নিদেনপক্ষে এ কথাটা জানাও তোমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি কেন!

না, কিছুই এখন বলব না যথাসময়ে জানতে পারবে। —এ পর্যন্ত বলে ও আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ব্লাউজের গর্ভে দৃষ্টি নামাল এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ভেসে উঠল।

একটা অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করল, আমি দৃষ্টি দিয়ে ওর শরীর লেহন করছিলাম না কিন্তু চোখ পুরোপুরি ওর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতেও পারছিলাম না। মাঝে মাঝেই দৃষ্টি ঘুরে-ফিরে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল বুকের উপত্যকায়। এক অদম্য কৌতূহলের উৎসস্থলে চোখ চলে আসছিল এবং সেই সঙ্গে বার বারই হোঁচট খাচ্ছিল, আমি নিজের উপর বিরক্ত না হয়ে পারছিলাম না। যখন নীতা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে দৃষ্টি নামাল তখন অস্বস্তি যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেল। ভীষণ ভাবে ভেতরে যেন শৈত্যপ্রবাহের মত কিছু প্রবাহিত হোল, কেঁপে উঠলাম আমি, কোনো রকমে ঠিকানাটা জানিয়েই পিঠ প্রদর্শন করতে চাইছিলাম কিন্তু নীতা বুঝতে পেরেই আমার হাত চেপে ধরে বলল, দাঁড়াও যেও না, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে ওর চোখের উপর চোখ রাখলাম, কী বলে তার জন্য অপেক্ষা করে থাকলাম।

বিয়ে করেছ?

না। আর কিছু জিজ্ঞেস করো না আমার প্রতীক্ষায় সহযাত্রীরা অপেক্ষা করে আছে।

ঠিক আছে যাও আর আটকাব না তোমাকে। —বলেই নীতা আর দাঁড়াল না দ্রুত পা ফেলে কিছুটা গিয়ে একটা গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ল। ওকে অনুসরণ করে আমার দৃষ্টি চলে এসেছিল গাড়িটার অভ্যন্তরে। দেখলাম গাড়ির ভেতর আরো একজন একটা হাত স্টিয়ারিং-এর উপর রেখে বসে আছে, তার অন্য হাতে জ্বলন্ত একটা চুরুট। নিঃসন্দেহে বলা যায় নীতার জন্যই অপেক্ষা করছিল ও উঠতেই স্টার্ট দিল, আমি ফিরে এলাম আমাদের গ্রুপে। ফিরে আসতেই বিয়াস প্রশ্ন করল, মেয়েটা কে ? —বিয়াস প্রশ্ন করলেও এ প্রশ্ন অনেকের এটা অনুমান করতে পারলাম। বললাম, বলব তবে এক্ষুনি জানতে চেয়ো না কিছুক্ষণ পর তোমাকে সবিস্তারে সব কিছু জানাব। —এপর্যন্ত বলার পরই অন্য প্রসঙ্গে চলে আসলাম। দুর্গামন্দিরে যাবার সময় জানালাম নীতার কথা।

ব্রজেশ্বরবাবুর পাঁচটি মেয়ে আর একটা ছেলে। মেয়েদের মধ্যে সব থেকে বড় যে জন তার নাম ঋতা। ঋতার দু'বছরের ছোট নীতা। এরপর সীতা, কবিতা আর সবিতা। ব্রজেশ্বরবাবু ছিলেন রেলের বুকিং ক্লার্ক। একার আয়ে চলত আটটা প্রাণীর ভরণ-পোষণ, ছেলে বড় হয়ে এ সংসারের হালটা ধরবে এরকম একটা আশা পোষণ করতেন তিনি কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। ছেলে অনেক দিন আগে থেকে অন্য পথে চলতে শুরু করেছিল। তখন ওর একমাত্র পরিচয়—মস্তান। ব্রজেশ্বরবাবুর যা কিছু ছিল তা দিয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু অন্য চারটা মেয়েকে কী ভাবে পাত্রস্থ করবেন তা ভেবে উঠতে পারছিলেন না। সমস্যার হাত থেকে কিছুটা নিস্কৃতি দিল এক তরুণ, শুধু শাঁখা সিঁদুরেই নিয়ে গেল নীতাকে। এই সেই নীতা।

বিয়াস আশা করছিল আরো কিছু বলব আমি কিন্তু ঐ পর্যন্ত বলেই যখন আমি মুখ বন্ধ করলাম তখন ও বলল, বুঝলাম কিন্তু নীতার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক ছিল ?

আমি ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, অবৈধ।

বিয়াস চোখ পাকিয়ে বলল, বাজে কথা বলার জায়গা পাওনি, তোমাকে চিনতে কী আমার বাকি আছে! বল ওর সাথে তোমার কীভাবে পরিচয় ?

ব্রজেশ্বরবাবু বাবার বন্ধু ছিলেন। ওদের বাড়ি প্রায়ই যেতাম, শুধু বাবার বন্ধু বলে যে যেতাম তা নয়, নীতাকে একটু-আধটু সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন কাকাবাবু। সে অনুরোধ রক্ষা করার জন্যই সপ্তাহে দু'একদিন যেতাম ওদের বাড়ি।

কী ধরনের সাহায্য ?

তুমি ত' উকিলের মত জেরা করতে আরম্ভ করলে, বিয়াস তুমি কী জানতে চাইছ বল ত' ?

তোমাকে।

একটু আগেই ত' বললে তুমি আমাকে জান।

জানি তবে সম্পূর্ণভাবে জানি একথা বলতে পারছি না।

সাহায্য করতাম মানে পড়া-টরা একটু-আধটু দেখিয়ে দিতাম এই আর কী।

এবার নীতার কথা বল।

কী বলব ?

ও কী তোমাকে নিয়ে কোনো স্বপ্ন দেখত ?

ঘুমের মধ্যে কাদের স্বপ্ন দেখত তার তালিকা আমাকে কোনদিন দেয়নি সুতরাং জানার সম্ভবনা আমার ছিল না।

বাজে কথা রাখ তোমাকে ভালবাসত ও ?

হঠাৎ তোমার এরকম ধারণা হোল কেন জানতে পারি ?

জানি না ওকে দেখে মনে হোল ওর দৃষ্টির মধ্যে কিছু যেন দেখতে পেলাম। শুনলে ত' এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

বাসত মনে হয়।

বাসত ?

আমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঠোঁটের প্রান্ত চেপে হাসলাম।

বিয়াসই আবার কথা বলে উঠল, মনে হয় নয় বুঝলাম বাসত, বেচারি।

বেচারি বলছ কেন ?

বোঝ না কেন বলছি ? তুমি কী রক্তমাংসের মানুষ !

তবে আমি কী ?

সে তুমিই জানো তুমি কী তবে রক্তমাংসের মানুষ নও এটা ঠিক।

আর কিছু বলবে ?

বলব। তোমাকে আমি পুরোপুরি আবিষ্কার করতে চাই।

তাহোলে তোমাকে আমার প্রেমে পড়তে হবে এছাড়া পুরোপুরি আবিষ্কার করবে কীভাবে ?

তোমার রসিকতা করার অভ্যেসটা অনেক দিনের—না ?

কেন ?

বিয়াস আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ফেলল, বলল, রসিকতা ছাড়া কী বলব—আমি যেমন জানি তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না সেরকম তুমিও জান আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি না।

তবে আর আবিষ্কার করবে কীভাবে বিয়াস ?

আমার কথার পর হয়ত বিয়াস কিছু বলত এবং তার উত্তরে আমিও নীরব হয়ে থাকতাম না কিন্তু বিয়াস মুখ খোলার আগে চন্দ্রা চলার গতি স্তব্ধ করে আমাদের সাথে যুক্ত হোল। ও আসাতে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে হোল, এরপর কথার তরীটা চড়ায় এসে যে আটকে গেল তা নয় কথা চলতেই থাকল তিনজনের মধ্যে, তবে ধারাবাহিকভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গে কোন কথা হোল না। আমরা কথা বলতে বলতে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করে আসার পর আমাদের টাঙাগুলোর

সন্ধান পেলাম। বিকাশবাবু স্বর্ণমন্দির থেকে বেরোবার পরই জানিয়েছিলেন বিশেষ কারণবশত পুলিশ মন্দিরের কাছে টাঙা দাঁড় করাতে দিচ্ছে না, ফলে টাঙাগুলো দাঁড়াচ্ছে মন্দির থেকে অনেকটা দূরে। আর এই কারণেই আমাদের অনেকটা হেঁটে আসতে হোল। সবাই টাঙায় ওঠার পর আবার শুরু হোল আমাদের যাত্রা। মাত্র পাঁচ-সাত মিনিট চলার পর টাঙার চাকার আবর্ত থেমে গেল। আমরা পৌঁছে গেলাম দুর্গামন্দিরে। এ মন্দির স্বর্ণমন্দিরের অনুকরণে নির্মিত। হুবহু স্বর্ণমন্দিরের মত শুধু তফাৎ বলতে মন্দিরটা ছোট এবং হিরণ্যসদৃশ নয়। দুর্গামন্দিরের পর আমরা আসলাম জালিয়ানাবাগে। এই সেই ঐতিহাসিক জালিয়ানাবাগ যেখানে অসংখ্য নির্দোষ মানুষের উপর ইংরেজরা চালিয়েছিল বর্বরোচিত আক্রমণ। ইংরেজদের গুলি বর্ষিত হয়েছিল হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার উপর। এই বাগানটাতে দেখতে পেলাম একটা বিরাট প্রশস্ত কূপ যা একদিন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল সেইসব আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মৃতদেহে। সেইসব মানুষদের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। বাগিচার একপাশে একটা ঘরের কাছে চাচিজী আমাদের নিয়ে আসলেন। সেই ঘরের দেয়ালে আজও গুলির ক্ষত অক্ষত।

জালিয়ানাবাগ থেকে বগিতে যখন ফিরলাম তখন দিনের আলো আর নেই বললেই চলে। ফিরে আসার প্রায় ঘণ্টা দেড়-দুই বাদে নীতা এসে হাজির। ও যখন আসল তখন বিয়াসের সাথে আমি কথা বলছিলাম। নীতাকে দেখেই বিয়াস উঠতে যাচ্ছিল আমি ওর হাত ধরে আটকালাম প্রথম তারপর নীতাকে বললাম, আমাব বন্ধু বিয়াসের সঙ্গে পরিচিত হও প্রথমে তারপর অন্য কথা।

পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর নীতা বলল, তোমরা কালই চলে যাচ্ছ তাই আজ চলে আসলাম, যদি কাল না আসতে পারি অথবা আসতে পারলেও তোমাদের সাথে দেখা যদি না হয় এই ভেবে চলে আসলাম। তোমরা এরপর কোথায় যাবে?

ভূস্বর্গে, তুমি?

ঠিক নেই মিঃ বাঘবনের উপর নির্ভর করছে সব কিছু, যদি ভাল লাগে দু'চারদিন অমৃতস্বরে থেকে যেতে পারেন আবার ভাল না লাগলে হয়ত কালই কোথাও চলে যেতে হবে।

তুমি এখনো মিঃ রাঘবনের পরিচয় ব্যক্ত করনি নীতা।

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার জি-এম।

এ পরিচয়ে আমি কী বুঝব? তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?

বলব, সে কথা জানাব বলেই ত' এসেছি আজ, তোমার বন্ধুর উপস্থিতিতে বলা যাবে ত'?

বিয়াস বলল, আমি বরং কিছুক্ষণ পরে…

আমি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, না, তুমি যেও না।—এরপর নীতাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, বিয়াসের উপস্থিতিতে যদি তোমার কোনো কিছু জানাতে অসুবিধা হয় তাহোলে সে কথা বলার প্রয়োজন নেই।

নীতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল, বলল, আমি সেজন্য বলিনি—আমার কোনো অসুবিধা নেই।—এ পর্যন্ত বলেই ও গুছিয়ে বসে বলল, আজ তুমি আমাকে মিঃ রাঘবনের সঙ্গে দেখছ আবার কয়েকদিন পরে হয়ত অন্য কারো সাথে দেখবে। তবে যাদের সঙ্গে দেখবে তারা সকলেই ভি-আই-পি। এমনকি হয়ত কোনো এম-পির সঙ্গেও দেখে ফেলতে পার। ভাবছ এটা কী করে হোল—না? যে নীতার এখন কোনো গ্রামের পুকুর-ঘাটে বসে বাসন মাজার কথা সে এ জায়গায় আসল কী ভাবে। তুমি ত' দেখে এসেছিলে আমার বিয়ে কিন্তু এরপর কী বিপর্যয় ঘটেছিল তা বোধহয় তোমার জানা নেই। বিয়ের পর তোমার সঙ্গে এখানে এই প্রথম দেখা তাই আমার দুরবস্থার সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানোনা বলেই আমার ধারণা। যদি তাড়া না থাকে সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারি।

তুমি বলতে পার।

নীতা সামান্য একটু সময়ের ব্যবধানের পর পুনর্বার মুখ খুলল, বলল, বিয়ের পর বেশ কিছুদিন সুখেই ছিলাম। দু'জনের সংসার। প্রভাতের অর্থাৎ আমার প্রয়াত স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বলতে বিশেষ কেউ ছিল না। থাকলেও আমি জানতাম না শুধু ওর দূর সম্পর্কের এক ভাইকে চিনতাম। সেই ভাই কলকাতায় থাকত। মাঝে মাঝে তার আবির্ভাব ঘটত আমাদের বাড়িতে। দু'একদিনের জন্য আসত। সুপ্রকাশ ছিল অত্যাধুনিক ও পুরো মাত্রায় শহুরে। ওর পরিচিতির গণ্ডিটাও ছিল বড়। অনেক তাবড়-তাবড় মানুষের সঙ্গে ছিল তার পরিচয়। এসব জেনেছিলাম অনেক পরে, প্রভাতের মৃত্যুর পর। আজকে যে জায়গায় আমি এসে দাঁড়িয়েছি সে কথা বলতে গেলে সুপ্রকাশের কথা বলতেই হবে কিন্তু তার পূর্বে প্রভাতের কথা বলে নি। প্রভাতের সঙ্গে সুখেই ছিলাম কি না বলতে পারব না তবে মানিয়ে নিয়ে চলছিলাম। আমার স্বামী ছিল নির্ভেজাল ভদ্রলোক এবং সহজ-সরল, কোনো কিছুর বিরুদ্ধেই যেন তার কোনো অভিযোগ ছিল না। এইরকম একটা মানুষের সঙ্গে আমি মানিয়ে নিয়ে চলছিলাম একথা বলার কারণ জানতে চেও না, এই মুহূর্তে সে কথা তোমাকে জানাতে পারব না। এবার জানাই আমার ভাগ্যের কথা, নিয়তির প্রচণ্ড লোভ ছিল আমার শাঁখা-সিঁদুরের উপর। একদিন রক্তাক্ত অবস্থায় প্রভাতকে কয়েকজন ধরে এনে বাসাতে দিয়ে যায়। তাদের কাছ থেকেই জানতে পারি একটা গাড়ির নিচে চলে এসেছিল ও। যদিও শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় কেটে গেছিল তবু খুব মারাত্মক মনে হয়নি ওকে দেখে। দেখে যাই মনে হোক শরীরের ভেতরে সাংঘাতিক কিছু নিশ্চয়ই হয়েছিল কারণ মাত্র দুটো দিনের ব্যবধানেই প্রভাত চলে গেল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হোল। কী করব কোথায় যাব কোনো কিছুরই ঠিক নেই। একটা কথা বলা হয়নি আমার বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে বাবা মারা গেছিল, বোনেরা তখন আমার অমানুষ ভাইয়ের উপরই নির্ভরশীল। সেখানে ওরা যেভাবে ছিল সেভাবে থাকার কথা আমি ভাবতেই পারলাম না। এসময় সুপ্রকাশের কাছ থেকে বাঁচার প্রতিশ্রুতি পেলাম। ও আমাকে

নিয়ে গেল কলকাতায়। ওর চরিত্রে অনেক দোষ ছিল তা সত্ত্বেও ওকে আমি শ্রদ্ধা করি, ও যা করে তা বুক উঁচু করেই করে, যাই করুক মিথ্যে বলে ঠকায় না। আমাকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়নি। ও কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পর সরাসরি একটা প্রশ্ন রেখেছিল আমার কাছে, বলেছিল, তুমি সম্পর্কে আমার বৌদি তোমাকে আমি কী পরিচয়ে এখানে রাখব ?—ওর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি কারণ কী উত্তর দেব তা নিজেই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে ও বলেছিল আমি যদিও অবিবাহিত তবু তোমাকে অসম্মানিত হতে দেখতে না চাইলে যে পরিচয়টা দেয়া উচিত সেটা আমি দিতে পারছি না, যদি তুমি রাজী হতে এবং আমার যদি কোনো অসুবিধা না থাকত তাহোলে তোমাকে বিয়ে করে সমস্যার সমাধান করা যেত, ভেব না তোমার বৈধব্যের এবং অসহায়তার কথা ভেবে এ কথা বললাম। আসল কথাটা কী জান আমি বিয়ে করতে পারব না, কোনো মেয়েই আমার স্ত্রী হয়ে আসবে না কখনো, বাঁধা পড়তে আমি চাই না, কেন চাই না সে কথা তোমাকে বলা যাবে না। কী করবে বল ?—এবারও আমি কিছু বলতে পারলাম না। নিরুত্তর থেকে সাত-পাঁচ ভাবতে থাকলাম। বেশ কিছুক্ষণ সুপ্রকাশও চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকল। তারপর একসময় বলল, তোমার যতদিন না কোনো ব্যবস্থা করতে পারছি ততদিন আমার এই একটি মাত্র ঘরে আমাদের থাকতে হবে অবশ্য তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও। একঘরে থাকার পরিণাম কী হবে তা আশা করি তোমার অজানা নয়, ভয় নেই একটা রাত ভাবার সুযোগ তুমি পাবে। এই একটা রাত তোমাকে স্পর্শ করব না একথা ইচ্ছে করলে বিশ্বাস করতে পার। করা উচিত। আমার অন্য কোনোরকম উদ্দেশ্য থাকলে এত কথা বলার প্রয়োজন ছিল না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত যেন আমার চোখের সামনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দুলতে থাকল, উচিত আর অনুচিতের সংঘর্ষ চলতে থাকল মনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম, বুঝলাম যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে হার অনিবার্য। এ হার অনাদিকাল থেকেই মেয়েদের ভাগ্যের লিখন। আস্তে আস্তে শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালাম, পায়ে পায়ে সুপ্রকাশের নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললাম। এরপর ? এরপর নিজেকে মনে হয়েছিল স্ত্রী সিম্পাঞ্জীর মত, স্ত্রী সিম্পাঞ্জীদের কথা তুমি জান কিনা জানি না যদি না জেনে থাক তাহোলে তাদের কথা তোমাকে বলতে পারি।

আমি জানালাম জানা নেই। শুনে নীতা আবার মুখ খুলল, পুরুষ সিম্পাঞ্জীরা যখন কোনো কিছু শিকার করে আনে তখন স্ত্রী সিম্পাঞ্জীরা তাদের কাছে টানবার চেষ্টা করে। প্রলোভিত করে। আদিম খেলা খেলার জন্য উৎসাহিত করে। আসল উদ্দেশ্য পুরুষ সিম্পাঞ্জীকে শারীরিকভাবে ক্লান্ত করে ফেলা। অপেক্ষায় থাকে কখন পুরুষ সিম্পাঞ্জীর বিধ্বস্ত এবং ক্লান্ত শরীরে ঘুম বাসা বাঁধতে শুরু করবে। ঘুমিয়ে পড়লেই তার শিকার করা বস্তুটির উপর থাবা

বসাবে।—এ পর্যন্ত বলেই নীতা রুমাল দিয়ে খুব সন্তর্পণে কপালের উপর জমে ওঠা কয়েক ফোটা ঘামের বিন্দুকে বিতাড়িত করে প্রসঙ্গ থেকে সামান্য সরল। বলল, সুপ্রকাশ আমাকে বাঁচার রাস্তা দেখাল। লক্ষ্মীর আরাধনা করার জন্য আমাকে কী করতে হবে জানাল। আমার কথা শুনে ঘেন্না হচ্ছে—না? ভাবছ বাইরে বেরিয়েছ আনন্দ করতে আর এই সময়েই একটা 'হোড়' তার খারাপ হয়ে যাওয়ার গল্প ফেঁদে বসল, বল ভাবছ কি না?

বিয়াস নীতার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, একক এ কথা ভাবতেই পারে না আর আমার কথা যদি বলেন তাহোলে ভাবতে হবে আপনার জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম। এই পরিণতির জন্য আপনাকে দায়ী করা চলে না, ঘুণ-ধরা সমাজই এরজন্য দায়ী। এই সমাজের পরিবর্তন না হোলে যুগে যুগে আপনার মত কত মেয়ে যে বহুবল্লভা হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

বিয়াস যতক্ষণ কথা বলছিল ততক্ষণ নীতা একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল, কী দেখছিল বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ ঝড়ের মতন উঠে দাঁড়িয়ে বিয়াসের দিকে ফিরে বলল, বিশেষ এক প্রয়োজনে আমাকে এক্ষুণি উঠতে হচ্ছে কিছু মনে করবেন না।—বলেই কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল। ওর এই চলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক তাই বিয়াস আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে চোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম।

পরের দিন প্রত্যূষে একটা ছেলের মারফৎ নীতার একটা চিঠি পেলাম। ছেলেটাকে যে নীতার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করব তার উপায় নেই কারণ ছেলেটা ওকে চেনেই না। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম এক ভদ্রমহিলা ওর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে চিঠিটা কাকে পৌঁছে দিতে হবে জানিয়ে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল এখনো সেখানে আছে কি না ও জানে না। ওর কথা শুনে দ্রুত রাস্তায় বেরিয়ে এসে নীতাকে খুঁজতে থাকলাম। পেলাম না। না পেয়ে ফিরে এসে চিঠিটা পড়তে শুরু করলাম। নীতা লিখেছে—

প্রিয় এককদা,

ভেবেছিলাম সম্বোধনে তোমার নামটা লিখব না, যদি না লিখতাম তাহোলে নিশ্চয়ই দেখেই তোমার ভুরু কুঁচকে যেত। চিঠির প্রারম্ভে আমি একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি আমার চিঠিটা সম্পূর্ণ না পড়েই ছিঁড়ে ফেল না। এই চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি এই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না তবে অনেক দূরে কোথাও। না মিঃ রাঘবনের সাথে নয়, একা। আজ একটা কথা জানাবো বলেই এই চিঠিটা তোমাকে লিখছি, জানি না পড়ে তুমি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে বসবে কি না কারণ আমি যে কথা জানাবো সে কথা তোমার মত প্রতিষ্ঠিত কথাশিল্পী বুঝবে বলে ভাবতে গিয়েও ভাবতে পারছি না। যদি বোঝ এই আশায় বলছি আমাকে তুমি অসতী ভেব না, আমি অসতী নই। সকলের কাছে আমি একটা খারাপ মেয়ে—বেশ্যা। এরকম

একটা পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি তা ভেব না। লৌকিক বিয়ে হয়েছিল আমার কিন্তু আমি জানি তার অনেক আগে আমার বিয়ে হয়ে গেছিল। মনে মনে অনেকদিন আগেই একজনকে পতিত্বে বরণ করেছিলাম ; মনই ত' আসল, মনের ভেতর যে ছবি আছে যে ছবির কাছে আত্মনিবেদন করে বসে আছি সেই ত' আমার ইহকাল পরকাল। যাকে আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছিলাম সেই ছিল আমার স্বামী আর প্রভাত ছিল তার প্রতিবিম্ব। মনে মনে সে স্বামীর কাছে উৎসর্গ করেছি দেহ-মন-প্রাণ। দীর্ঘদিন ধরে একজনই আমার কায়ার সাথে মিলিত হয়েছে, অনেক রাতের অনেক মানুষ আমার কাছে একজন হয়ে ওঠে। তাকেই দেখতে পাই মানসচক্ষে আর এই কারণেই অন্যান্য বারবণিতাদের মত, যীশুখ্রীস্টর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থার মত অত্যাচারিত হই না, পড়ে থাকি না বিছানায়, জেগে উঠি, উৎসর্গ করি নিজেকে যেভাবে স্ত্রী নিজেকে উৎসর্গ করে তার স্বামীর কাছে। সেইদিন এই কারণেই সুপ্রকাশের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলাম। আসলে আমার কাছে প্রভাতও যা সুপ্রকাশও তা, রাতের অন্ধকারে ওরা সকলেই হয়ে যেত সেই একজন। হয়ত প্রশ্ন করবে তার সঙ্গে আজকের চলে যাওয়ার সম্বন্ধটা কোথায়! যদি কর তাহোলে বলব আছে। আজ মনে হচ্ছে অনেকদিনের ঘুম যেন ভেঙে গেল, এই দেহকে অপবিত্র করতে পারব না, পর পুরুষের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতে পারব না তাই চলে যাচ্ছি অনেক দূরে। বার বার মনে হোচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা না হোলেই ভাল হোত।

—নীতা

বিয়াস আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল কখন জানতে পারিনি, চিঠি পড়া শেষ হতেই সামান্য ঘাড় ঘোরালাম আর তখনই চোখ পড়ল ওর ওপর। বললাম, তুমি! কতক্ষণ ?

এই এলাম এক মিনিটও হয়নি—কার চিঠি ?

পড়ে দেখো।—বলে চিঠিটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম।

পড়ব ?

পড়বার জন্যই ত' দিলাম, নীতার চিঠি।

বিয়াস আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে চোখ বোলাতে শুরু করল। পড়া হয়ে যাওয়ার পর আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, একক এর আগে এতখানি নিখাদ ভালবাসা কারো মধ্যে থাকতে পারে তা জানা ছিল না। নীতার পরিচয় সকলের কাছে একটা নষ্ট মেয়ে ছাড়া কিছু নয় অথচ তার মনের খনিতে এত রত্নসম্ভার তা কল্পনা করাই শক্ত। এই ভালবাসা তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ! কীভাবে পারলে! মন বলে কী তোমার কিছু নেই ?

কথা শেষ করে বিয়াস এমন এক দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকাল যে-দৃষ্টির মধ্যে কী যে ছিল তা বুঝে উঠতে পারলাম না, মনে হোল অনেক অব্যক্ত কথা জমাট বেঁধে আছে তার চোখের তারায়। বিয়াস আমার দিকে তাকিয়েছিল এবং সেই

সঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাকে এবং নীতাকে নিয়ে ভাবছিল। আমিও নীতার কথা ভাবছিলাম। ওর কথা ভাবতে গিয়ে এখন অনেক কথাই মনে হোচ্ছে—জং ধরা লোহা কখনো ধারাল ইস্পাতের ফলা হয়ে উঠতে পারে না, নীতাকে কোনোদিন জং ধরা লোহা ভেবেছিলাম কি না বলতে পারব না তবে ইস্পাতের ফলা যে নয় ও এবং হয়েও যে উঠতে পারবে না এটা আমার মনে হোত। আমার মস্তিষ্কের গবেষণাগারে যে সব চরিত্রগুলো বিশ্লেষিত হোত তাদের সম্পর্কে একটা কথাই শুধু ভাবতাম—নির্ভুল বিশ্লেষণ। এর আগে একাধিক বার নয় শুধু একবার সুরেখার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বাসের এবং দম্ভের মিনারটার ভিত নড়ে উঠে-ছিল, আজ আবার পুনরাবৃত্তি হোল। আমার বিশ্বাস ছিল মানুষের মনের ছবি আমার কাছে আসলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন মনে হোচ্ছে এতদিনের ধ্যান-ধারণা ভুল। আমি নীতাকে চিনতে পারিনি, ওর মধ্যে খুঁজে দেখার কিছু আছে তা আমার কখনো মনে হয়নি। ও আমাকে ভালবাসত এটা জানতাম তবে সে ভাল-বাসার শেকড় এত গভীরে প্রবেশ করেছিল তা জানতে পারিনি ইতিপূর্বে। ওকে দেখে ভালবাসার গভীরতা অনুমান করা যেত না। ওর বিয়ের আগে ও অনেক কথাই বলেছিল কিন্তু সে সব কথা আমার মনে দাগ কাটেনি। তখন ভেবেছিলাম ও যা বলছে তা ইমোশনে বলছে, ঐ কথার জন্য চিন্তিত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, দু'দিন বাদেই মুছে যাবে মন থেকে। সে সময় ও কী কী বলেছিল তা আজ পুরোপুরি মনে নেই তবে কয়েকটা কথা আজও ভুলে যাইনি। ও বলেছিল, এককদা মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়—আমার ত' বিয়ে হয়ে গেছে এরপর ঘটা করে যে বিয়ের আয়োজন করা হচ্ছে তাকে কী বিয়ে বলা যায়!—আমি বলেছিলাম তবে কী বলবে তাকে?—আমার প্রশ্ন শুনে ও হেসেছিল, হেসেই যে ছিল এ কথা জোর দিয়ে বলা ঠিক হবে না বোধহয় কারণ ওটা হাসি না হয়ে কান্নাও হোতে পারে। খাদের মধ্য থেকে কোনো কথা উঠে আসলে যে রকম মনে হয় অনেকটা সে রকম স্বরে ও বলেছিল, না, ওটা বিয়ে না অন্য কিছু। একটা শবকে নিয়ে যাওয়ার ঘটা, শবকে নিয়ে গিয়ে কী করবে ওরা বলতে পার?—আমি উত্তর দিতে পারিনি। শুধু মূক হয়ে থেকে ওর বক্তব্য শুনেছি। সেই শেষ এরপর ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সেদিনের পর আবার আমাদের দেখা হোল গতকাল। সত্যি কথা বলতে কী ওর কথা আমার মনেই ছিল না এতদিন। আমি নীতাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে দৃষ্টি পুনর্বার স্থাপিত করলাম বিয়াসের মুখের উপর, ওর চোখ তখনো সরে যায়নি আমার মুখাবয়বের উপর থেকে। বললাম, তোমার আঁখিতে আমি কী দেখতে পাচ্ছি বিয়াস?

কী দেখতে পাচ্ছ সে কথা তুমি বুঝতে পারছ না?

পারলে প্রশ্ন করতাম না।

ভাল করে চেয়ে দেখ ত' এমন কোনো মানুষের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ কি না যাকে স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রীক ছাড়া অন্য কোনো আখ্যা দে'য়া যায়!

আমার কথা বলছ ? আমি এতই খারাপ !

সত্যি কথাটা শুনবে ?

বল।

আমি তোমাকে কী বলব সেটা ভেবে ঠিক করতে পারছি না, কোনো এক দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে মনে হয় তোমাকে খারাপই বলি আবার একথাও মনে হয় তোমার মত ভাল একজন না থাকলে বিয়াসের একজনও বন্ধু থাকত না।

বিয়াস তোমার মত কোনো রূপসী সঙ্গে থাকলে প্রত্যেকেরই ভাল লাগার কথা তার উপর এরকম একজন বুদ্ধিমতীর সান্নিধ্য পেলে ত' কথাই নেই। তোমার বচন শুনে কী মনে হচ্ছে জান ? মনে হচ্ছে তোমার বচন যেন অমৃতের নির্ঝর, এই নির্ঝরে ডুবে থাকি।

শুধু এই !

তবে আর কী ?

একটা পৌরাণিক উপাখ্যান শোনাই আগে তারপর তোমার প্রশ্নের জবাব দেব। ব্রহ্মার চারটে মাথা কেন জান ?

জানি তবু তোমার কাছ থেকে শুনি।

বিশ্বকর্মা যখন উর্বশীকে সৃষ্টি করল তখন ব্রহ্মার চোখ তার উপর পড়ল। এমন রূপবতীকে কী না দেখে পারা যায় ! যখন উর্বশী তার রূপ-যৌবনের সম্ভার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তখন ব্রহ্মার ইচ্ছে হোল তাকে দু'চোখ ভরে দেখে কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে কষ্ট হচ্ছিল তাই যাতে একভাবে বসে চারপাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে রাখা যায় তারজন্য চারটে মস্তক গজিয়ে উঠল তার ঘাড়ে। দেবতারা পর্যন্ত সুন্দরীদের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারেনি অথচ আমার রূপের আকর্ষণে তোমার মত মানুষকে কাছে টানা যায় এ বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছ অনেক আগেই। আমি তোমার কাছে থাকলে ভাল লাগে এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

তুমি আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই ভাল লাগে এটা বিশ্বাস না করার কারণ নেই বিয়াস।

তোমার কথাতে আমি আশ্বস্ত হতে পারছি না।

পারছ না ?

না। তোমার বান্ধবী বিয়াস কাছে থাকলে তোমার ভাল লাগে না এটা বলা ঠিক হয়নি আমার আসলে আমি বলতে চাইছি আমি এমন এক পুরুষকে দেখছি যার সঙ্গে এ পর্যন্ত দেখা কোনো পুরুষের মিল খুঁজে পাচ্ছি না। আমার রূপ-যৌবনে তোমাকে আকৃষ্ট করতে পারছি না বলে যে আমার মনে ক্ষোভ একথা ভেব না, আমাকে কখনই সেই পর্যায়ে নিয়ে যেও না এটা আমার অনুরোধ, আমি বলতে চাইছি কোনো সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য তোমার দৃষ্টির স্পর্শ পায় না কেন ? এককের বন্ধু হয়ে ওঠার পূর্বে বিয়াসও শুধু এক রূপবতী রমণী ছিল এবং সেই সময়ই তোমার আচরণ আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে।

যদি বলি একথা ঠিক নয়। এ কথার সঠিক উত্তর দিতে হোলে আমার কী করা উচিত জান?

কী?

আচ্ছা বিয়াস যদি তোমার মুখটা আমার তালুদ্বয়ের মধ্যে বন্দী করি এবং আমার অধর নামিয়ে আনি গোলাপের পাপড়ির মত পেলব ঠোঁটদ্বয়ের উপর তাহোলে?

তাহোলে আহত হব, বন্ধুত্বটা অটুট থাকবে না এ সত্ত্বেও বলছি যদিও এরপর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের তবু আমি খুশি হব। খুশি হব কেন জান? খুশি হব এজন্য যে মানুষটা রক্ত-মাংসের মানুষ অন্য কিছু নয়।

সত্যি আহত হবে?

হ্যাঁ, কারণ যে একক গুপ্তকে আমি আবিষ্কার করেছি তাকে খুঁজে পাব না বলে। ওসব কথা থাক একক আমি জানি তুমি সেরকম কিছু করতে পারবে না আর তাছাড়া আমিও ওভাবে তোমাকে দেখতে চাই না।

একটা গল্প শুনবে বিয়াস?

বল।

এক সময় এক প্রভাবশালী অসৎ মানুষের অত্যাচারে অনেকে অস্থির হয়ে উঠেছিল। প্রত্যেকেই ভাবছিল কী ভাবে ঐ মানুষটাকে কিছুটা সংযত করা যায়। একদিন একজন মানুষটাকে সংযত করার একটা পন্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হোল। সে যা ভাবল তা অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটা পেশ করল সকলের কাছে এবং তা অনুমোদিত হতে বিলম্ব হোল না। এবার বলি প্রস্তাবটা কী ছিল—সকলে মিলে সেই অসৎ মানুষটার গুণগান করতে হবে, বলতে হবে মানুষটার মত পরোপকারী এবং সৎ মানুষ খুবই বিরল। এভাবে হয়ত মানুষটাকে অসৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখা সম্ভব হোতে পারে। এ কাহিনীটা কেন বললাম জান? বললাম তোমার কথা ভেবে। আমি যা বলছি তা যাতে না করে বসি তার জন্য বেশ একটা ভাল আবরণ দিয়ে রাখছ।

বাজে কথা। তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না, করি না বলেই বলতে পারছি তোমার সেই বৌদির কথা যা বলেছ, নীতার কথা যা জানলাম এবং অনীতা রাহার যে কাহিনী শুনিয়েছ তাতে তোমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাববার সুযোগ তুমি রাখনি একক।

আমাদের কথোপকথন যে ভাবে চলছিল সে ভাবে হয়ত আরো কিছুক্ষণ চলত যদি না চাচিজী এসে পড়তেন। উনি এসেই আমার কাছে জানতে চাইলেন তিনি গুরুজীর কাছে যাচ্ছেন আমার তার সঙ্গী হবার বাসনা আছে কি না। জানালাম আছে। বিয়াস চাচিজীর উদ্দেশ্যে বলল, তোমার গুরুজীকে জিজ্ঞেস কোর ত' এমন মানুষ তিনি দেখেছেন কি না যার মন বলে কিছু নেই, যদি থেকেও থাকে ত' পাথরের মতই কঠিন। শুনেছি তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী আমার হয়ে

তার কাছে একটা অনুরোধ জানিও—তোমার সঙ্গে যে মানুষটা যাচ্ছে তার মন বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে তিনি যেন সে মনের পরিবর্তন ঘটান।

চাচিজী বললেন, কী হোল একক তোমার উপর হঠাৎ চটল কেন বিয়াস ?

আমি তার প্রশ্নটাকে পাশ কাটাতে চাইলাম, বললাম, গুরুজীর ওখানে কী শুধু আমরা দু'জনই যাচ্ছি ?

সুরেখা যাবে আমাদের সঙ্গে।—এ পর্যন্ত বলেই বিয়াসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুই যাবি ?

না।

কেন ? যাবি না কেন ?

ইচ্ছে করছে না।

এরপর চাচিজী আর বাক্য বিনিময় না করে শুধু তাকে অনুসরণ করার কথা জানিয়ে কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে গেলেন। আমিও দু' একটা কথা বিয়াসের সঙ্গে বলেই নেমে এলাম।

আমরা যখন গুরুজীর ওখানে পৌঁছলাম তখন সূর্য মধ্য গগনে, আকাশ থেকে অগ্নি বর্ষণ হচ্ছে। আমাদের শরীর ঘামে ভিজে উঠেছে। সুরেখার ফর্সা মুখটা ঘামে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে। গরমের উত্তাপে সমস্ত অমৃতসর এখন জর্জরিত অথচ গুরুজীর বাসস্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে এই উত্তাপ অনেকাংশেই কম মনে হোল। অমৃতসরের প্রায় শেষ প্রান্তে গুরুজীর আশ্রম। তরুলতা পরিবেষ্টিত একটা কক্ষ, এখানেই থাকেন গুরুজী। ঘরটাতে পা রাখতেই চোখে পড়ল এক অতি বৃদ্ধর উপর। একটা তক্তপোষের উপর শুয়ে আছেন সিলিং-এর দিকে চোখ বেখে। চোখ রেখে বললাম বটে কিন্তু খুব কম সময়ের জন্য চোখ খোলা থাকছিল, বেশির ভাগ সময়ই চোখ বন্ধ থাকছিল, যখন এক-আধবারের জন্য খুলছিলেন তখন তার দৃষ্টি সিলিং ছুঁয়ে থাকছিল। তার মুখের আকৃতি শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফের অরণ্যে আর লম্বা চুলের আড়ালে আত্মগোপন করে ছিল। বৃদ্ধর দু' পাশে দু' জন যুবক মানুষটার মুখের কাছে ঝুঁকে বসে ছিল। আমাদের প্রবেশ করতে দেখে তাদের একজন বৃদ্ধ মানুষটার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে কিছু বলল। সে কথা যেভাবে বলল তাতে আমাদের কানে কিছুই পৌঁছয়নি তবু বুঝতে অসুবিধা হোল না আমাদের আগমন বার্তা তার কানে পৌঁছে দে'য়া হোল। যার কানে আমাদের আগমন বার্তা পৌঁছে দে'য়া হোল তিনিই যে গুরুজী সেটা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোল না আমার। গুরুজী আস্তে আস্তে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন, চাচিজীকে দেখতে পেয়ে বললেন, এসো দিলারী তুমি ভাল সময়েই এসেছ, আমি এবার চললাম, ডাক এসে গেছে। উনি কথাগুলো তার মাতৃভাষায় বলছিলেন, যা বললেন তা আমার বোঝার কথা নয় সুরেখা বলে না দিলে বুঝতাম না। আমি জানতে চাওয়ায় সুরেখা তার কথা বাংলায় তর্জমা করে শোনাল। পরবর্তী সমস্ত কথাই ও তর্জমা করে যেতে থাকল।

না গুরুজী ও কথা মুখেও আনবেন না।—চাচিজী আহত কণ্ঠে বললেন।

গুরুজী কথাটা শুনে হাসলেন, বললেন, আমার কাজ শেষ আর ত' থাকা চলে না দিলারী। প্রত্যেকের মাথার উপর কর্তব্যের বোঝা চাপানো আছে কর্তব্য যেদিন শেষ হবে সেদিনই তার ডাক আসবে যাবার জন্য। এ হচ্ছে এক ঘাট থেকে নৌকায় উঠে আরেক ঘাটে যাবার মতন। যেদিন আমরা জন্মালাম সেইদিনই প্রথম নৌকো ভাসালাম অন্য পারের সন্ধানে। এই পথ অতিক্রম করার পথে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত উত্থান-পতন। তারপর পেঁছেই নৌকার অর্থাৎ দেহের কাজ শেষ। আসল ত' আত্মা, আত্মা অবিনশ্বর, আত্মা কখনো মরে না দিলারী। এই যে আমি আমার জীর্ণ দেহটা ত্যাগ করতে যাচ্ছি এতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে জানি কিন্তু আমি ত' খোলস ছাড়তে যাচ্ছি মাত্র, দেহ আমাকে ঘাটে পেঁছে দিচ্ছে এবার এটার আর প্রয়োজন নেই।

এক নাগাড়ে কথা বলছিলেন গুরুজী হঠাৎ আমাদের যেন এই প্রথম দেখলেন অন্তত তার শেষের কথাটা শুনে আমার তাই মনে হোল। আমাদের উপর চোখ রেখে বললেন, এরা ?—প্রশ্নটা চাচিজীর উদ্দেশ্যে।

চাচিজী সুরেখাকে দেখিয়ে বললেন, এই আমার বড় মেয়ে সুরেখা।—এরপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, এ হচ্ছে একক গুপ্ত, আপনি একে চিনবেন না তবে বাংলাদেশের পাঠক একে চেনে—সাহিত্যিক। এটা অবশ্য ওর পরিচয় কিন্তু আমি আপনাকে ওর অন্য পরিচয় দেব, ওর আমি চাচিজী। অবশ্য চাচিজী বললেই সব কথা বলা হয় না আসলে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরো বড়, ঐ তিন অক্ষরের কথাতে তা বোঝানো যাবে না।

গুরুজী চাচিজীর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলছিলেন ততক্ষণ আমার আর সুরেখার মুখের উপর দৃষ্টি বিস্তার করে রেখেছিলেন, এমন কি এখনো তার দৃষ্টি আমাদের মুখের উপর থেকে সরেনি। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল, সুরেখারও হচ্ছিল হয়ত। ওভাবে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি হওয়াটা স্বাভাবিক আর এই কারণেই অনুমান করতে পারছিলাম সুরেখারও অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার মনে হোল গুরুজী আমাদের মধ্যে কী যেন খুঁজে চলেছেন। হঠাৎ হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি খুব শ্লথ গতিতে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হিন্দীতে বললেন, বোস তোমাকে কয়েকটা কথা বলব।—এ পর্যন্ত বলেই আমার বসার অপেক্ষায় থাকলেন। আমি কোথায় বসব যখন ভাবছি তখন পাঞ্জাবী যুবকদ্বয়ের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বৈঠিয়ে।—আমি তার পরিত্যক্ত স্থানটা দখল করে অপেক্ষা করতে থাকলাম গুরুজীর বক্তব্য শোনার জন্য।

তোমার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনেকের মধ্যে নেই। কী তা জানতে চেও না কারণ সঠিকভাবে তা আমি বর্ণনা করতে পারব না, শুধু বলতে পারি যা আছে তা সকলের নেই। এটা নিঃসন্দেহে তোমার গুণ তবে দোষও আছে এবং তা খুব কমও নয়। তুমি নিজের চারপাশে একটা সীমারেখা টেনে রেখেছ যার বাইরে যেতে

চাওনি কোনোদিন এবং তাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করনি বলে তোমার বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে যে তাকে অতিক্রম করার সাহস তোমার নেই।—এ পর্যন্ত বলে আবার কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম তার বক্তব্য শেষ হয়নি, আরো কিছু বলবেন। ঠিক তাই তিনি আবার মুখ খুললেন, বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব, আমার নির্দেশও বলতে পার। মনের জঠরে তুমি একজনের পদধ্বনি শুনতে পাবে, তার জন্য তোমার মনের দরজা উন্মুক্ত রেখো।

কে সে! কার পদধ্বনি শুনতে পাব! আমার সীমারেখাই বা কী! অজস্র প্রশ্ন ভিড় করে থাকল মনের মধ্যে কিন্তু তা নিয়ে গুরুজীকে প্রশ্ন করতে ভরসা পেলাম না।

গুরুজী এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন এবার চাচিজীর দিকে ফিরে বললেন, তোমার আরো একটা মেয়ে আছে না? সে কোথায়?

আসেনি, শরীর-টরীর ভাল নেই হয়ত—আসতে চাইল না।—চাচিজী গুরুজীর পায়ের কাছে বসে খুব আস্তে আস্তে পা টিপছিলেন। গুরুজী তাকে সরে তার কাছে এসে বসতে বললেন। চাচিজী তার নির্দেশ মত উঠে এসে বসলেন মাথার কাছে।

তোমার মেয়েকে ডাক।—কথাটা বলে গুরুজী চোখ বন্ধ করলেন। চাচিজীর নির্দেশে সুরেখা আসতেই উনি চোখ খুললেন, চোখের কোণ দিয়ে বিছানার একটা পাশ দেখিয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। সুরেখা বসার পর বললেন, সুরেখা তোমার নামটা খুব সুন্দর, চেহারা আরো সুন্দর এবং মনের ভেতরের যে ছবি দেখতে পাচ্ছি তাকে নিঃসন্দেহে বলা চলে কাঁচের মত স্বচ্ছ, অন্তরীক্ষের মত অসীম আর পারাবারের মত গভীর। আমি তোমার মনের মধ্যে একটা অঙ্কুর দেখতে পাচ্ছি, ভালবাসার অঙ্কুর। আমার ধারণা এটা অনেক বড় হবে। ডালপালা বিস্তার করবে সমস্ত মন জুড়ে। সে ভালবাসার স্বাদ তুমি গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু তা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে অনেক দূর থেকে। পৃথিবী যেভাবে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে অনেকটা সেরকমভাবে। পৃথিবী সূর্যকে স্পর্শ করতে না পারলেও তার উষ্ণ স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় না, তোমার ক্ষেত্রেও ঘটবে সেই একই ব্যাপার। ঝিলম আর সুমারীর গল্পটা তোমার মা কী তোমাকে জানিয়েছে?

সুরেখা খুব আস্তে আস্তে মাথাটা দোলালো, যেভাবে দোলালো তাতে বোঝা গেল জানায়নি।

শুনবে?

আপনি অসুস্থ এ সময়······

সুরেখাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে গুরুজী বললেন, দেহের অসুখের কথা বলছ, দেহ আর কতক্ষণ। যে দেউল থেকে বিগ্রহ হারিয়ে যেতে বসেছে সে দেউল দিয়ে কী হবে! সে দেউল ক্ষত না অক্ষত তা নিয়ে ভেবেই বা কি হবে! আমার কথা

থাক তোমাকে ঝিলাম আর সুমারীর গল্পের কিছুটা বলি। ঝিলাম ছিল হিমাচল প্রদেশের যে সব আদিবাসী সম্প্রদায় আছে তাদেরই এক গোষ্ঠির একজন। পাঞ্জাবের এক অভিজাত পরিবারের কন্যা সুমারী। এই কন্যাটি সেই হিমাচল প্রদেশের আদিবাসী যুবককে মন সমর্পণ করে বসে। দুজন পরস্পরের ভাষা জানে না তবু তাদের মনের আদান-প্রদানের অন্তরায় হয় না ভাষা। মানব-মানবীর প্রেমের ভাষা বুঝি অন্য যা নির্বাক থেকেও অনেক বেশি সোচ্চার, মনের ভাষা প্রতিফলিত হয় মুখের আকৃতিতে আর চোখের তারায়। দু'জনই তা যেন পড়তে পারে অতি সহজে। সুমারী উচ্চশিক্ষিতা না হোলেও ওর কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল। ঝিলাম বইখাতা দেখেছে কিন্তু তার ভেতর যা আছে তা ওর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরকম একটা বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও যত দিন অতিবাহিত হচ্ছিল ততই যেন উভয়েই পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছিল। সুমারী জানত না ওর মাথার উপর একটা অভি-শাপের খড়গ ঝুলে আছে। কোনোদিন তাদের পরিবারের কোনো মহিলা যদি অন্য কোনো জাতের কোনো পুরুষের দ্বারা অঙ্গ-স্পর্শিত হয় তাহলে তার জীবনসঙ্গীর জীবনাবসানের সম্ভাবনা আছে। এই অভিশাপ সুমারীকে স্পর্শ করেছিল। কীভাবে স্পর্শ করেছিল তা তোমার মা'র কাছ থেকে শুনে নিও কারণ সুমারী তোমাদেরই পরিবারের একজন ছিল। তোমার মায়ের জীবনেও বোধহয় একই অভিশাপ নেমে এসেছিল এবং হয়ত এই কারণেই··· । কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে গুরুজী নীরব হোলেন।

সুরেখাও কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবতার দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকল।

সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর গুরুজী চাচিজীকে বললেন, দিলারী তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, শুধু তোমাকেই বলব সে কথা।

ওনার কথা শুনে বুঝলাম আমাদের আর সেখানে থাকা চলে না। সুরেখাও বুঝল সম্ভবত কারণ তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। পূর্বের স্থানে ফিরে এসে আমাকে বলল, বুঝলেন কিছু ?

বললাম, না তবে শেষের বক্তব্য অর্থাৎ চাচিজীকে উনি যা বলেছেন তা বুঝেছি মনে হয়।—কী বুঝেছি তা সুরেখাকে জানিয়ে বললাম, এ কথাই বলেছেন ত' ?

হ্যাঁ, আমাকে যা বলেছেন তা বুঝেছেন ?

কিছুটা বুঝেছি কিছুটা অনুমান করেছি।

সুরেখা সবিস্তারে জানাল সবকিছু। জানিয়ে বলল, চলুন বাইরে যাওয়া যাক।

আমিও চাইছিলাম কক্ষটা ত্যাগ করতে সুতরাং সুরেখার কথা শুনে একমুহূর্ত বিলম্ব না করে দরজার দিকে অগ্রসর হোলাম। সুরেখা আমাকে অনুসরণ করে বাইরে এসে বলল, এখানেই অপেক্ষা করি মা না আসা পর্যন্ত।

গুরুজীর ঘরের বাইরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার মধ্যে অনেক গাছ-গাছালি। বেশির ভাগই ফুলের গাছ। কিছু ভূমিতে কিছু টবে সযত্নে লালিত-

পালিত হচ্ছে। নিঃসন্দেহে জায়গাটা মনোরম। কয়েকটা চেয়ারও আছে। তারই একটাতে বসে সুরেখাকে বসার অনুরোধ জানালাম প্রথমে তারপর ওর বসার পরে বললাম, গুরুজীকে দেখে মনে হয় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, সত্যি কী তাই ?

মা বলেন ওনার তৃতীয় নয়ন আছে, তিনি সব কিছু দেখতে পান—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তার কাছে অজানা থাকে না। উনি আজ পর্যন্ত যাকে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। উনি যা কিছু বলেন তা নিজে থেকেই বলেন প্রশ্ন করে কোনো কিছু জানা সম্ভব নয়, বলেন না। একমাত্র মাকে বলেন। সম্ভবত মাকে সব থেকে বেশি স্নেহ করেন এই কারণেই মা কোনো কিছু জানতে চাইলে ফিরিয়ে দেন না।

আপনি বিশ্বাস করেন ?

অবিশ্বাস করি একথা বলতে পারছি না।

এ কথায় কী বুঝব ?

লেখেন যখন তখন না বোঝার কথা নয়।

বুঝলাম যে উত্তর আমি ওর কাছ থেকে শুনতে চাইছিলাম সে উত্তর পাওয়ার সম্ভবনা নেই। নেই বলে প্রসঙ্গ থেকে সরে আসতেই হোল আমাকে। বললাম, সুরেখা একটা কথা—আপনাকে আবিষ্কার করা সম্ভব নয় একথা কেন মনে হচ্ছে তা জানতে পারি কী ?

নিজেকেই কী আবিষ্কার করতে পেরেছেন ? আমার ধারণা আমরা কেউই কাউকে আবিষ্কার করতে পারি না। আপনার কী ধারণা আপনি সকলকে আবিষ্কার করতে পারবেন ?

না, সকলকে পারব এটা ভাবি না।

যাদের পারবেন না তাদেরই একজন আমি কি না এটাই বুঝতে পারছেন না তাই ত' ?

তা বোধ হয় নয়।

তাহলে কী ?

আপনাকে আবিষ্কার করি এটা সম্ভবত আপনি চাইছেন না।

আমার মত একজন নগণ্যকে আবিষ্কার করার প্রয়াস না-ই বা চালালেন এককবাবু।

আপনার এ কথার আড়ালে কী আছে বুঝতে পারছি না, যদি আপনি ভেবে থাকেন আমি ঐ কথাটার মধ্য দিয়ে বিশেষ কিছু বোঝাতে চাইছি তাহলে বলব ভুল বুঝছেন আমাকে, আর যদি সত্যি নগণ্য মনে করেন নিজেকে তাহলে বিস্মিত হব।

সুরেখা ঠোঁটের প্রান্ত চেপে হাসল। আস্তে আস্তে ওর দৃষ্টি স্থির হয়ে আমার মুখের উপর চেপে বসতে শুরু করল। সামান্য বিরতির পর বলল, একটা সত্যি কথা সহ্য করতে পারবেন ?

না শুনেই উত্তর দেব ?

বেশ শুনুন আপনার একটা অহংকার আছে, সব মানুষকে জেনে ফেলতে পারবেন এরকম একটা ধারণা আপনার আছে।

তা কী আমি কখনো প্রকাশ করেছি! বরং বৈপরীত্যের সুরই বেজেছে আমার কণ্ঠে।

বলেছেন ঠিকই তবু আমার মনে হয় আপনি আপনার মনের কথা বলেননি।

চাচিজী গুরুজীর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা আমাদের কাছে চলে এলেন। আর এই কারণেই সুরেখার কথার উত্তরটা ব্যক্ত করার সুযোগ জুটল না আমার। চাচিজী এসেই বললেন, তোমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না আমি এবেলা এখানেই থাকব। আমাদের ট্রেন ছাড়ার পূর্বে আমি ফিরে আসব, আমার জন্য ভেব না তোমরা।—এপর্যন্ত বলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্থান ত্যাগ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন।

আমি আর সুরেখা চাচিজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা টাঙা ঠিক করে উঠে পড়লাম। ওঠার পর সুরেখাকে বললাম, আপনার একটা প্রশস্তি গাইছি।—বলে কথাটা বলার পূর্বে ওর প্রতিক্রিয়া বুঝবার চেষ্টা করতে থাকলাম। ভাবান্তর হোল কি না বুঝতে পারলাম না, সুরেখা যেভাবে রাস্তার উপর দৃষ্টি বিস্তার করে বসে ছিল সে ভাবেই বসে থাকল। আমি দু'এক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণের পর বললাম, আপনার মধ্যে কী আছে জানি না তবে চোখের দিকে তাকালে যা দেখতে পাই তাকে সমুদ্রের গভীরতা বললে বাড়িয়ে বলা হবে কি না বুঝে উঠতে পারছি না।

আর কিছু ?

আবিষ্কারের কথা তোলার সাহস আমার আর নেই শুধু একটা অনুরোধ আপনার কাছে—একটু সহজ হয়ে আসুন আমার কাছে। একটা শিশুর হাতে কোন দুর্বোধ্য বই থাকলে তার কী অবস্থা হয় ভাবুন ত' একবার।

একক গুপ্তর কাছ থেকে এ কথাগুলো লিখিয়ে নিতে পারলে সুরেখা কাপুর হয়ত বেশ কিছু দিন মাটিতে পা না রেখেই হাঁটতে পারবে। আপনার লেখা আমি পড়েছি, পড়ে যেটুকু বুঝেছি আপনাকে তাতে বলতে পারি আমাকে না বোঝার কথা নয়। তাত্ত্বিকরা অবশ্য বলেন কেউই একটা জীবনে অন্য কাউকে বুঝতে পারে না, সেই তত্ত্বর কথার উপর ভিত্তি করে যদি বলে থাকেন তাহলে আপনি একক গুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমাকেই শুধু নয় কাউকেই বুঝতে পারবেন না, এ তত্ত্ব ব্যতিরেকে সুরেখাকে বুঝতে পারবেন না এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত। আসলে ওটা একটা সূক্ষ্ম তত্ত্ব কিন্তু এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের বাইরে আমরা অন্য একটা ব্যাপার ভেবে থাকি, একজনকে আরেকজনের বোঝা যদি যথেষ্ট বলে মনে হয় তাহলে সেই একজন অন্যজনকে চিনতে পেরেছে বলে দাবী করে, একটা ভুলকে উপেক্ষা করতে হয় অ্যাডজাস্টমেণ্টের জন্য কিন্তু তারও একটা সময়-সীমা আছে। যদি আমার বক্তব্যকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য বলে মনে না করেন তাহলে বলতে পারি সে সময়-সীমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করলে বোঝার প্রশ্ন ওঠে না।

সময়-সীমা কী সকলের ক্ষেত্রে এক ? আমার মনে হয় তা নয়, সমস্তটাই নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের মানসিক গঠনের উপর।

আপনার সঙ্গে আমি একমত কিন্তু সে সময়-সীমারও একটা ন্যূনতম সময় আছে। এটা প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই এ কথা বললে ভুল বলা হবে।

বিয়াস এবং আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় আমার প্রায় একই সঙ্গে অথচ এই সময়ের মধ্যে বিয়াস আর আমি পরস্পরকে বুঝেছি, পরস্পরের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি।

সুরেখা এতক্ষণ রাস্তার উপর দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে কথা বলছিল, সেখান থেকে দৃষ্টি আমার মুখে তুলে এনে বলল, হয়ত বিয়াসকে আপনি বুঝতে পেরেছেন এবং বিয়াসও হয়ত বুঝতে পেরেছে আপনাকে কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে যে সকলকে বোঝা সম্ভব এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই, তাছাড়া আপনারা যে পরস্পরকে বুঝেছেন তা ত' শুধু আপনাদের ধারণা। বন্ধুত্ব কথাটা এসেছে সম্ভবত বন্ধন থেকে, এক ধরনের বন্ধনের নাম বন্ধুত্ব, এটা অবশ্যই আমার ধারণা। একজন আরেকজনকে বুঝতে পারলেই যে বন্ধুত্ব হবে সেরকম কোনো নিয়ম কোথাও লিপিবদ্ধ করা নেই। এই অদৃশ্য বন্ধনে দুটি মন যখন বাঁধা পড়বে তখন বন্ধুত্ব হতে পারে। এ বন্ধন কখনো বন্ধুত্ব, কখনো প্রেম, কখনো মায়া, কখনো স্নেহ আবার এ বন্ধন কখনো শুধু মনের সাথে, কখনো দেহের সাথে এবং কখনো দেহ-মনের সাথে অর্থাৎ এ বন্ধনের অনেক রূপ—কখনো নিষ্কাম, কখনো জৈবিক। হৃষিকেশে আপনি আমার বন্ধুত্ব কামনা করেছিলেন কিন্তু তখন আমি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে পারিনি বলে মনে মনে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন! আসলে আমি তখন আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারিনি, বোঝাতে চাইনি বললেই বোধহয় ঠিক বলা হবে কারণ আমার ধারণা ছিল নিজেই হয়ত রিয়েলাইজ করতে পারবেন।

তাহলেই দেখুন নিজেকে কতটা নির্বোধ প্রতিপন্ন করে বসে আছি। আপনি নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ মহিলা, এখন বুঝতে পারছি আপনার দৃষ্টি জহুরীর দৃষ্টি। সব কিছু যাচাই করে নেন কষ্টিপাথরে ফেলে, বিশ্লেষণী শক্তিরও তারিফ না করে পারছি না।

আত্মপ্রশংসা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আপনার সম্বন্ধে আরো একটা কথা বলার ইচ্ছে আছে যদি অভয় দেন ত' বলি।

নির্ভয়ে বলুন।

বিয়াস প্রথম দিনই আপনার সম্বন্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল, বলেছিল, সুরেখার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত হীম-শীতল।

আপনারও কী সেই অভিমত ?—সুরেখা আমার কথা শুনে হেসে ফেলল।

না, অতটা খারাপ ধারণা আমি পোষণ করি না।

তার মানে খারাপ ধারণা পোষণ করেন। বিয়াসের কথা বলছেন ? ওর কথা আপনি বুঝে উঠতে পারবেন না, ওর কথার ধরনই ঐ রকম।

অমৃতসরের রাস্তায় জনমানবের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা চোখে পড়ছে, এ সময় লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ সম্ভবত আদিত্যের উগ্র মূর্তি। তপ্ত সমীরণ আমাদের চোখে-মুখে আছড়ে পড়ছে। সুরেখার কপাল চুঁইয়ে গড়িয়ে পড়ছে ঘাম। আমার অবস্থাও অনুরূপ। লবণাক্ত নীরে ভিজে উঠেছে সর্বাঙ্গ। একটা সিগারেট বার করে দু'ঠোঁটের মাঝে রেখে ভাবতে থাকলাম অগ্নি সংযোগ করব কি না। দু' দু'বার দেশালাইর কাঠি জ্বাললাম ধরাবার জন্য কিন্তু সিগারেটের কাছে এনেও না ধরিয়ে নিবিয়ে দিলাম।

কী হোল ধরালেন না ?—শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে সুরেখা প্রশ্ন করল।

ইচ্ছে করছে না। এক এক সময় এরকম হয় আমার কোনো কিছুই ভাল লাগে না।

এই একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমার দারুন মিল আছে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অরবিট আছে, আমার মনে হয় আপনার আর আমার বোধ হয় কোনো কক্ষপথই নেই। আমরা যেন কক্ষচ্যুত গ্রহ, মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত খুব কাছাকাছি গ্রহ দুটো ভাসতে থাকবে তারপর যেহেতু তাদের কোনো কক্ষপথ নেই—ছিটকে যাবে অন্য কোনো গ্রহের আকর্ষণে, এভাবে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহের সান্নিধ্যে আসা আর সরে সরে যাওয়া ছাড়া যেন তাদের আর কোনো বিকল্প নেই।

আপনি যা বললেন তা হয়ত ঠিক, হয়ত কোনো সুনির্দিষ্ট পথ আমাদের নেই, এছাড়া আরো একটা কথা আমার মনে হয়—অনেক কিছুর অস্তিত্বের কথা আমার মনে থাকে না যেমন এখন প্রচণ্ড গরমে শরীর জ্বলছে বলে শরীরের অস্তিত্ব বুঝতে পারছি তা না হোলে শরীর যে আছে সেটাই ভুলে থাকি অনেক সময়।

এবার একটা কথা —তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের সেই সংজ্ঞাটার কথা মনে না রেখে এবং নিজেকেও আবিষ্কার করা সম্ভব নয় আপনার সেই কথার কেন্দ্রবিন্দুতে না পেঁছে যদি বলি আমরা যেহেতু দুটো কক্ষচ্যুত গ্রহ সেহেতু বেশিক্ষণ পাশাপাশি থাকব না, যতক্ষণ আছি ততক্ষণ পরস্পরকে আবিষ্কার করার প্রয়াস চালাতে পারি কী ?

আপনাকে আমি কিছুক্ষণ পূর্বে কী ভেবেছিলাম তা প্রকাশ করতে পারব না তবে যা ভেবেছিলাম তার উপর দাঁড়িয়ে যে যে কথা বলেছি তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি প্রথমে তারপর বলছি বিশ্বাস যদি আমাদের অশ্মের মত কঠিন রূপ নিয়ে থাকে মনে তাহলে যে সময়টুকু পাশাপাশি আছি সে সময়ের মধ্যে আবিষ্কারের প্রয়াস চালাতে পারি, চালাতে পারিই বা বলছি কেন আবিষ্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে, কী হয়নি ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি বলি এ অধমের মনের যা দৈন্যদশা তাতে সুরেখা কাপুরকে 'রিড' করতে পারব ত' ? পারব এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

এ কথার পর আমার কী বলতে ইচ্ছে করছে জানেন ? বলতে ইচ্ছে করছে একক গুপ্ত এক ভয়ঙ্কর মানুষ। সে কোনো অজানা গ্রহের মানুষ যার কথার তরঙ্গ খুবই

অচেনা ভয়ঙ্কর কিছু, কথার গভীরতায় টেনে নামিয়ে ডুবিয়ে মারার পরিকল্পনা সর্বক্ষণ, নিজেকে অণু বলে জাহির করে অন্যের দুর্বলতার জায়গাটা খুঁজে বেড়ায়, নিঃসন্দেহে বলতে পারি খুঁজে বেড়ানো কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, কী তার উদ্দেশ্য তা আমি বুঝেছি।

এতটাই ভয়ঙ্কর আমি। এত বড় একটা মিথ্যে অভিযোগ আমার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মিথ্যে ?

নয় ?

প্রমাণ যদি চাই, পারবেন দিতে ?

একজন নগন্য নারীকে অনন্যা বলে অভিহিত করছেন কেন ? তার ভেতর এমন কিছু নেই যা একক গুপ্ত বুঝে উঠতে পারবে না। এরপরও প্রমাণ চাইবেন ?

আমাকে এতটাই অবিশ্বাস আপনার ! এরপর আর কোনো কিছু বলতে পারব না, ভরসা পাব না।

আমি এবং সুরেখা দু'জনই কথার গোলকধাঁধায় যেন হারিয়ে গেলাম। শুধু সুরেখাদেরই যে বুঝতে চাইছিলাম তা নয় আরো একটা কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এমন কিছু যা আজও আবিষ্কার করতে পারিনি, কী তা জানা নেই, একটা কিছু যা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। যুগ যুগ ধরে মুনি-ঋষিরা বলে চলেছেন অহম্‌কে জান, এটা সেই নিজেকে জানার জন্যই ছোটা কি না জানি না। মনে আমার প্রশ্ন আমি অর্থাৎ অহম্‌কে কী জানা যায় ! অহম্ ত' বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে একটা বিন্দু আবার এরকমই এক বিন্দু থেকেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম। শমের বুকে অসি না বিদ্ধ করে অহম্ নামক বিন্দুকে খোঁজা যায় না। যাদের অভিধানে অহম্ কথার অর্থ দেহ আর মন তাদের ভাললাগার জগতটা অনেক বড়। বিরামহীন ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল মনের সৈকতে হঠাৎ সুরেখার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, পথ ফুরিয়ে এসেছে এবার আমাদের নামতে হবে।

ওর কথার পর মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই আমরা আমাদের আস্তানায় পেঁৗছে গেলাম।

॥ আট ॥

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে গাড়ি ছাড়ল, গাড়ির গতি বৃদ্ধি পাওয়ার পর বিন্নাস আসল। এসেই আমার পাশের আসনটা দখল করে বলল, গুরুজীর ওখানে কতক্ষণ ছিলে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট। তুমি গেলে না কেন ?

কী জানি তখন ইচ্ছে ছিল না যাবার কিন্তু তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর মনে হয়েছিল গেলেই পারতাম। মা ত' তোমাদের সাথে ফিরে আসেনি কখন আসবে কিছু

বলেছে ? ট্রেন ছাড়ার পূর্বে ঠিক কখন ফিরতে পারবেন তা বললে না। তোমার সঙ্গে সুরেখার দেখা হয়নি ?

হয়েছে, কথা হয়নি। তোমরা ত' দু'জন একসঙ্গে ফিরলে- একটা প্রশ্ন করলে সদুত্তর পাব ?

করে দেখ।

ফেরার সময় নিশ্চয়ই তোমাদের দু'জনের মধ্যে কথা বিনিময় হয়েছে এবং আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয় তাহলে বলতে পারি সে সব কথা অশান্ত সমীরণের মত প্রবাহিত হচ্ছিল, অনেক দিনের অনেক কিছু তোমাদের দু'জনের মনেই আশ্রয় নিয়ে আছে এ কথা বোধ হয় আমার থেকে বেশি আর কেউ জানে না, আমার ধারণা সে সব কথার উত্তর খুঁজেছ, পেতে চেয়েছ একে অন্যজনের কাছ থেকে, নিজেদের দেখতে চেয়েছ পরস্পরের কথার আয়নায়। অনুমানের শিখরে দাঁড়িয়ে বলতে পারি সে সব কথা কখনো কখনো ঝড় হয়ে উঠেছিল।

আর কিছু ভাবনি ?

কী বলতে চাইছ ?

দু'জনে বিজনে রূপসীর মনে নিজেরে যে খোঁজে সেজন একক হতে পারে না !

না পারে না।

কেন ?

এ প্রসঙ্গ থাক একক অনেক আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে এ বিষয়ে।

আচ্ছা বিয়াস তুমি ত' বলছ আমার আর সুরেখার অনেক অব্যক্ত কথা তুমি বুঝতে পেরেছ কিন্তু নিজের কথা তুমি বলনি, তোমারও নিশ্চয়ই অনেক অব্যক্ত কথা আছে যে কথা মনে হয় এখনো জানতে পারিনি আমি, সুরেখার সঙ্গে কথা বিনিময়ের পর বুঝেছি তোমাকে বুঝিনি।

যখন যা মনে পড়েছে বলেছি এ নিয়ে অভিযোগ করা তোমার উচিত হয়নি। তোমার আর সুরেখার অনেক অব্যক্ত কথা আমি বুঝতে পেরেছি এটা কখনো তোমাকে বলেছি বলে মনে পড়ছে না, আমাকে নির্বোধ প্রতি-প্রশ্ন করার চেষ্টা করছে কেন ? আমার অব্যক্ত কথা ভেবে দেখি কী বলিনি এবং কী তোমাকে বলা যেতে পারে তবে তার আগে বল সুরেখা কী বলেছে যাতে ভাবতে পারলে আমাকে বোঝনি !

সুরেখার সঙ্গে আমার যে যে কথা বিনিময় হয়েছে তা ওকে জানালাম। শুনে ও হেসে ফেলল, বলল, ও বলল বলেই তোমার ধারণা হোল অল্প সময়ের পরিচয় বলে তুমি আমাকে এবং আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি ! আমার মনে হয় এটা তুমি বিশ্বাস করনি সুরেখার বক্তব্যটা জানাবে বলেই বললে। সে যাক এবার আসি আমার অব্যক্ত কথা প্রসঙ্গে--কী জানানো হয়নি তোমাকে বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু একটি কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে তোমার মত আমি নই এবং সুরেখার মতও নই, আর দশটা মেয়ের মতও হয়ত নই। নিজের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারব না। এ ব্যতিরেকে আর অব্যক্ত কথা এ মুহূর্তে কিছু মনে পড়ছে না।

আমি সুরেখাকে বুঝে উঠতে পারিনি। বিয়াসকেও যে পুরোপুরি বুঝেছি তা নয়। সুরেখা যে মন্তব্য করেছিল তা মিথ্যে নয়, বিয়াসকে যতটা সহজ মনে হয়েছিল ততটা সহজ ও নয়. ও নিজের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে সেটা মিথ্যে নয় ও দশটা মেয়ের মত নয় আবার সুরেখার মত গভীরতা ওর মধ্যে নেই। সুরেখাকে বোঝা না গেলেও এটা অনুমান করা সহজ ও স্বতন্ত্র, বিয়াসের সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা চলে না. ও এক এক সময় এক এক রকম। বহুরূপীর মত যেন রং বদলের খেলা দেখতে পাই ওর মধ্যে। কখনো কথার জটিলতার মধ্যে টেনে নামিয়ে আনে আমাকে আবার কখনো স্থূল রসিকতাও করে। ওর সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় ও এমন একজন যে প্রত্যেকের মত হয়ে যেতে পারে আবার সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে নিজের জায়গায়। ওর কাছ থেকে একটা গল্প শুনেছিলাম, ওরই গল্প। ও যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী তখনকার কথা। একটা ছেলে ওকে প্রেম নিবেদন করেছিল। ছেলেটা সে সময় কলেজের গণ্ডি অতিক্রম করেনি। ও ছেলেটার প্রস্তাব শুনে মনে মনে হেসেছিল কিন্তু প্রত্যাখ্যান করেনি শুধু বলেছে, আপনি আমাকে জীবন-সঙ্গিনী করতে চাইবেন ত? যদি সেরকম পরিকল্পনা আপনার থাকে তাহলে আমার একটা শর্ত আপনাকে মেনে নিতে হবে—পারবেন? ছেলেটার তখন মনের অবস্থা অবর্ণনীয়, শুনে যেন দু'হাতে স্বর্গকে স্পর্শ করার সুখ ওরঅন্তরে তাই কোনো কিছু না ভেবেই জানাল বিয়াসের যে কোনো শর্ত ও মেনে নেবে। বিয়াস জানাল তার শর্তের কথা—কলেজের শিক্ষা দু'জনের শেষ হওয়ার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রয়াস চালাতে হবে. দু'জনের একজন অন্তত কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারলে ভালবাসার দু'য়ার খুলে দিতে পারবে বিয়াস, তার পূর্বে ওসব কিছু চিন্তা করার অবকাশ ওর নেই। ছেলেটা জানিয়েছিল ওর নির্দেশ সে মেনে নিতে অরাজী নয় তবে মাঝে মধ্যে ওর সঙ্গলাভ থেকে যাতে সে বঞ্চিত না হয় তারজন্য অনুরোধ জানিয়েছিল, বিয়াস রাজী হয়নি, বলেছে, না, যে শর্তের কথা বললাম সে শর্ত পালিত না হোলে আমাকে পাওয়ার কোনো সম্ভবনা নেই। এ কথার পর আর কিছু বলার সুযোগ ছিল না ছেলেটার, নিরুপায় হয়ে ওর প্রস্তাবে সম্মত হতে হয়েছিল ওকে। সম্মত হোলেও ছেলেটা শেষ পর্যন্ত বিয়াসের অপেক্ষায় বসে না থেকে অন্য একটা মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করে ফেলে। বিয়াসকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ভালবাসতে যাকে পারনি তাকে ওরকম আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলে কেন? যদি সত্যি ও তোমার অপেক্ষায় থাকত তাহলে কী করতে?

আমার প্রশ্ন শুনে হেসেছিল, বলেছিল, ভালবাসা কী কেউ চেয়ে নেয়। ভালবাসাও জন্ম নেয়, কবে কখন জন্ম নেয় তা যার মধ্যে জন্মে নেয় সে নিজেও জানতে পারে না। ছেলেটা আমাকে ভালবাসেনি এ কথা ওকে সরাসরি বললে ও বিশ্বাস করতে পারত না। ঐ সময় ওর মধ্যে যেটা ছিল তাকে মোহ বললেই ঠিক বলা হবে। মেয়েদের প্রতি ছেলেদের আকর্ষণ সহজাত, ওর মধ্যে যেটা ছিল সেটাও তাই, আরো একটা কথা—ঐ আকর্ষণের উৎসটা কোথায় জান? উৎসস্থলটা হচ্ছে দেহ। ভালবাসা

চার অক্ষরের কথা হোলেও তার গভীরতা পরিমাপ করা মুখের কথা নয়, ভালবাসার ছিটেফোটাও দেখতে পাইনি ওর মধ্যে। আমি ইচ্ছে করলেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম. যদি সেরকম কিছু করতাম তাহলে ভালবাসা কী তা কখনো ও জানতে পারত না। ভালবাসা কথাটার মধ্যে যে গভীরতা আছে তা বোঝার মত মন তৈরি হোত না। ওরকম কিছু না করলে ওর ভুলটা ভেঙে দেয়া যেত না। তোমার আরো একটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে- না ?

আমি বললাম, হবে না, আমি জানি তুমি কী বলবে।

বিয়াস আমার চোখে চোখে রাখল প্রথম তারপর বলল, কী বলব ?

বললাম, ভালবাসা না থাকলে কারো জন্য এত দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থাকা অসম্ভব এই বলবে ত' ?

বিয়াস আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে বলল. ঠিক, ঠিকই অনুমান করেছ।

বিয়াস শুধু এ ঘটনাই নয় অনেক কিছু মেলে ধরেছিল আমার কাছে, সে সব ঘটনা শুনতে ওকে আমি কিছুটা পড়ে ফেলতে পারছিলাম, বুঝতে পারছিলাম ওকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে রোদ আর ছায়ার মত চেনা-অচেনার খেলা চলছিল. কখনো বড় বেশি অচেনা মনে হচ্ছিল ওকেই।

বিয়াস এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছিল আর আমি নীরব হয়ে কখনো ওর কথা শুনছিলাম কখনো হারিয়ে থাকছিলাম অনেক কিছুর মধ্যে। সম্ভবত ও কথা বলতে বলতে আমাকে লক্ষ্য করছিল কারণ হঠাৎ ও প্রশ্ন করল কোথায় খোয়া গিয়েছিলে ?

বললাম, যদি বলি তোমার মধ্যে, বিশ্বাস করবে ?

কিসের সন্ধানে ! কী পাবে আমার মধ্যে ? মণি-মুক্ত কিছু নেই ছাইয়ের গাদা বলতে পার।

'যেখানে দেখ ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।' কথাটা বলে দু'ঠোঁটের মাঝে টেনে আনলাম আমার ভুবন জয় করা হাসিটাকে। আমার হাসির সঙ্গে যে বিশেষণটা আমি যুক্ত করলাম তা আমার দ্বারা সংযুক্ত নয়—অনেকের অভিমত। বিয়াস সে ভাবে দেখে না, ওর মতে এ হাসি ভয়ঙ্কর, গা জ্বালানি।

পাবে না, বিন্দুমাত্র সম্ভবনা নেই পাওয়ার।

বিয়াসের কথা শেষ হয়েছে কী হয়নি চন্দ্রা এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে তারপর বলল, আমাকে বসার কথা বলবে না এককদা ?

বললাম, বলব না আবার এতটা দুঃসাহসী হব ভাবলে কী করে ? জানো না আমার শরীর খুবই পলকা, মসি ছেড়ে অসি ধরার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, শুধু তাই নয় শীর্ণ দুটো আঙুলের ডগায় কোনো রকমে কলম ধরে রাখতে পারি, যত জোর আর জারিজুরি বল সবই কাগজের উপর। বিশ্বাস কর চন্দ্রা গলায় এমন জোর নেই যে একটু প্রাণ খুলে ঝগড়া করি।

তার মানে আমি ঝগড়াটে।—চন্দ্রা দু'চোখে আগুন ছোটাল।

আমি সে কথা কখন বললাম ?

তুমি কী আমাকে বোকা ঠাউরেছ ? এটুকু বোঝার মত বুদ্ধির অভাব এটা ভাবলে কী করে ?

বিয়াস কিছুটা সরে জায়গা করে চন্দ্রাকে বলল, বোস চন্দ্রা। এককের কথায় রেগে যেও না মানুষটা মোটেও সুবিধের নয়, প্রত্যেকের দুর্বলতার জায়গাটা খুঁজে বেড়ায়. তুমি যতই রাগবে ও ততই রাগাবে তোমাকে।

চন্দ্রা বসল। ওর মুখের উপর থেকে মেঘ সরল। দুটি সরল চোখ তুলে আমার মুখের উপর দৃষ্টি ছাড়িয়ে বলল, তুমি এরকম এককদা! ওঃ তুমি দেখছি আমার থেকেও বিপদজনও।

তুমি বিপদজনক ?

কেন আমি বলিনি বাবা আমাকে কী বলেন ? টমবয় ত' আর অকারণে বলেন না।

থাক সে কথা এবার বলত সকালের পর থেকে তোমার দর্শন মেলেনি কেন ?

বাবা-মা'র সাথে বেরিয়েছিলাম। অমৃতসরের মণ্ডিতে তুমি গেছ এককদা ?

এখনো সুযোগ হয়নি যাবার, তোমরা মণ্ডিতে যাচ্ছ জানলে সঙ্গী হতে পারতাম।

যেতে ? বিশ্বাস হয় না। মণ্ডিতে যাবার পর মনে হয়েছিল অনেক কিছু কিনব তবে অর্থাভাবে হয়ে ওঠেনি, অবশ্য একেবারে কিছু না কিনেই যে ফিরে এসেছি তা ভেব না।

কী কিনলে ? প্রশ্ন করল বিয়াস।

মা-বাবা অনেক কিছু কিনেছেন সে সব বলছি না, আমি যা কিনেছি তা দেখবে না বলব ?

বিয়াস ওর প্রশ্নের উত্তর দিল, বলল, এখন বল পরে দেখব।

একটা সিগারেট-কেস আর একটা ব্যাগ কিনেছি, তোমাদের জন্য এছাড়া আর যা কিনেছি তা আমার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের জন্য। পথের আলাপ যাতে পথ ফুরলেই শেষ হয়ে না যায় তার একটা ব্যবস্থা করে রাখলাম।

আমি বিয়াসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে চন্দ্রাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, বুঝলাম না খুলে বল।

ও দুটো জিনিস যখন তোমরা ব্যবহার করবে তখন নিশ্চয়ই আমার কথা মনে পড়বে সুতরাং ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবে না।

বললাম, ভুলে যাব এটা ভাবলে কী করে চন্দ্রা ?

বিয়াসদির কথা বলতে পারছি না তবে তোমাকে বিশ্বাস নেই। নামি মানুষ আমার মত একজন সাধারণ মেয়ের কথা কতক্ষণ মনে রাখবে কে জানে!

যতক্ষণ শ্বাস থাকবে ততক্ষণ তোমার তথা আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকবে এটা ইচ্ছে করলে বিশ্বাস করতে পার।

আমাদের তিনজনের মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকল। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সোনাবৌদি এসে যুক্ত হোলেন আমাদের সাথে।—আপনারা না থাকলে

ঘোরার আনন্দ অনেক অংশেই ব্যাহত হোত।—আসন গ্রহণ করেই মুখ খুললেন তিনি। যখন কথা বলেন তখন বোঝার উপায় থাকে না তার অন্তরে একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধে আছে। তীর বেঁধা পাখির যন্ত্রণা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমি বিস্মিত হই যখন দেখি লোকচক্ষুর সামনে ব্যথার বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় না তার। সেদিন হঠাৎই হরিদ্বারে তিনি ধরা পড়ে গেছিলেন তা না হোলে তার অন্তরের ব্যথা আমার কাছেও অপ্রকাশিত থাকত। অফুরন্ত হাসিখুশির আড়ালে একরাশ কান্না লুকিয়ে আছে সেটা জানবার সুযোগ একবারই পেয়েছিলাম। এরপর আর কখনো তা প্রকাশিত হয়নি, হোলে কী হবে তার সান্নিধ্যে কখনই আমি স্বাভাবিক হয়ে কথা বলতে পারি না। বিয়াসকে জানিয়েছিলাম তার কথা। ও জেনেছিল বলে ওর কথাতেও স্বভাবিকতা বজায় থাকছিল না। আর এই কারণেই আমাদের কথা যেন থেমে থেমে বাজছিল। একটা অস্বস্তি যেহেতু আমাদের দু'জনকেই গ্রাস করেছিল সেহেতু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছিলাম না আমরা। শুধুমাত্র চন্দ্রা কথার গালিচা বিছিয়ে রেখেছিল বলে বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হোল। একসময় সোনাবৌদি উঠে পড়লেন, তার উঠে পড়ার পর বিয়াসও উঠে দাঁড়াল। ভাঙা হাটে চন্দ্রাও বসে থাকতে চাইল না, এরপর আবার আসর বসল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তবে সে আসর মেসোমশাই আর মাসীমাকে নিয়ে। আমি যেটুকু রূপবতীর কথা জানতে পেরেছিলাম তাতেই অসম্ভব রকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম আজ সুযোগ পেতেই সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বসলাম। মেসোমশাইকে উদ্দেশ করে বললাম, রূপবতীর কথা যদি জানতে চাই তাহলে কতটা অন্যায় হবে আমার।

মেসোমশাই হেসে ফেললেন, বললেন, আমি জানতাম তুমি কখনো না কখনো জানতে চাইবেই, তুমি জানতে না চাইলেও ওর কথা তোমায় বলতাম, যাকে রূপবতী বলে জেনেছ তার নাম রূপবতী নয়- বনানী। যে নাম বার বার শুনেছ সে নামকরণ করেছে তোমার মাসীমা। কিসের আকর্ষণে ও আমার হৃদয়ে স্থান চেয়েছিল তা জানতে আমার খুব বেশি বিলম্ব হয়নি, ও আমার মধ্যে কিছু খুঁজে পেয়েছিল, অনেক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। ওর ধারণা ছিল আমি কাব্য সাধনা অব্যাহত রাখলে মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পারব। বনানী বলত, আপনি থেমে যাবেন না বিশ্বাস করুন চেষ্টা করলে প্রতিষ্ঠা পাবেনই,—তোমাকে একটা কথা বলে রাখি বনানী আমাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু ভালবাসলেও আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসেনি· আমিও হয়ত ওকে ভালবেসেছিলাম, হয়ত বললাম এই জন্য যে সত্যি ভালবেসেছিলাম কি না সেটা বুঝে উঠতে পারিনি তখনো, পরে মনে হয়েছিল বেসেছিলাম, না বাসলে যেদিন ওর বিয়ের কথা শুনলাম সেদিন বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করতাম না। আরতি বনানীকে চিনত, আরতি কে সে কথাই তোমাকে জানাইনি—না? আরতি তোমার মাসিমা। আমি জানতাম না ওরা পরস্পরের পরিচিতা, জেনেছিলাম অনেক পরে। তোমার মাসিমার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর এবং বিয়ের পূর্বে আমার আর বনানীর মেলামেশার সংবাদ আরতি

জানতে পারে। জেনেও বুঝে নিতে চেয়েছিল আমাদের সম্পর্কটা কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ ও জানতে চেয়েছিল ওর কোনো ভয়ের কারণ আছে কি না, ও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল, বনানীর সঙ্গে দেখা করেছিল, দেখা করে কী বলেছিল এবং এরপর কী ঘটেছিল তা তোমার মাসিমার মুখ থেকেই শোন। এ পর্যন্ত বলে মাসিমাকে বললেন, কী হয়েছিল বল না এককেকে।

মাসিমা সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুললেন না, আমি ভাবলাম মেসোমশাইয়ের মত সহজে মনের দরজা উন্মুক্ত করতে পারবেন না হয়ত কিন্তু সামান্য সময়ের ব্যবধানের পর সে অনুমান মিথ্যে প্রমাণিত করে সবিস্তারে সবকিছু জানালেন।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর মাসিমা বনানীর সঙ্গে দেখা করে জানতে চেয়েছিলেন তার যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে তার মনের কতটা জায়গা জুড়ে ও আছে। কতটা এগিয়েছে সে। দু-চার কথাতেই বুঝতে পেরেছিলেন ও অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এরপর আর কিছু বলার থাকে না, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে আসছিলেন যখন তখন বনানী তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, দাঁড়ান। শুনে মাসিমা দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তখনও বুঝে উঠতে পারেননি একমুঠো খুশিকে আঁকড়ে ধরতে পারবেন। বনানী যখন জানালো তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে কোনো এক ইঞ্জিনীয়ার ছেলের সঙ্গে তখন মাসিমা যেন ফুসফুস পূর্ণ করে বাতাস নিতে পারলেন। শুনে সুখের তরঙ্গের মধ্যে ডুবে গেলেন। এ পর্যন্ত জানিয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে আঁচলের কোণ দিয়ে মুছে আবার ওটা চোখের উপর আটকে বলতে শুরু করলেন, তখনো বুঝতে পারিনি আমার জন্য কত বড় আত্মত্যাগ করল বনানী। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে যেটা জানিয়েছিল সেটা ছিল সম্পূর্ণ বানানো। পরে যখন এটা জানতে পেরেছিলাম তখন ওর জন্য আমার কষ্ট হয়েছিল। নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি তোমার মেসোমশাই আর আমি একই পাড়াতে থাকতাম। পরস্পরকে আমরা ভাল করেই চিনতাম। কিন্তু কথোপকথন এক-আধবার বিনিময় হোলেও খুব বেশি পরিচয় ছিল না। একটা সত্যি কথা শুনবে? আমি তোমার মেসোমশাইকে মনে মনে কামনা করতাম। এখনকার মত সেকালের মেয়েরা এগিয়ে এসে কোনো ছেলেকে মনের খবর চট করে দিয়ে বসতে পারত না, এই কারণেই মনের ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারিনি। যেদিন জানলাম তোমার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে সেদিন খুশির ঝরনা হয়ে উঠেছিলাম। বিশ্বাস কর একক যেদিন বনানীর আত্মত্যাগের কথাটা জানতে পেরেছিলাম সে সময় থেকে একটা কষ্ট আমাকে কুরে কুরে খেয়েছে।

বনানীর সম্বন্ধে অনেক কথা জানালেন মাসিমা কিন্তু এত কথার পরও সেই কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে গেছিল, জেনেছিলাম পরে। পরে এ কাহিনী আমার কাছে পরিবেশিত হয়েছিল। সেদিন কেন সব কিছু খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারেননি সে কথাও জানতে পেরেছিলাম পরে। একঘন্টা কিংবা তারও বেশি সময়

ছিলেন মাসিমা-মেসোমশাই তারপর চলে গিয়েছিলেন। তারা চলে যাবার পর আমি যেভাবে বসেছিলাম সেভাবেই বসে থাকলাম নিজের মধ্যে ডুবে।

পরের দিন খুব ভোরে আমরা জম্মুতে পৌঁছলাম। ট্রেন থেকে নেমে আমাদের বিশ্রাম করবার সুযোগও জুটল না, নামার সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠতে হোল। বাস যেন আমাদের ওঠার অপেক্ষাতেই ছিল উঠে পড়তেই বিলম্ব না করে ছেড়ে দিল। কিছুটা সমতল সড়ক অতিক্রম করে পাহাড়ী রাস্তা ধরল। উঁচু-নীচু মসৃণ পাহাড়ি পথ। পথের একপাশে খাড়া পাহাড় আর অন্যপাশে গভীর খাদ। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝাউয়ের বন। দীর্ঘ ঝাউ স্পর্শ করে আছে আকাশকে। মাঝে মাঝে চোখ পড়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে অশান্ত ঝরণা। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই শুধু পাহাড়, সেই পাহাড়ের চূড়ায়-চূড়ায় রুপালী বরফ। সেই বরফ সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে। অন্যপাশে খাদের নিচে পাহাড়ী নদী। হিংস্র গর্জন করতে করতে পাথর বিদীর্ণ করে ছুটে চলেছে, দেখে মনে হয় কোনো ভয়ংকর দর্প নখ বিস্তার করে নিজেকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সমস্ত কিছু তছনছ করে দেবার উদ্দেশ্যে, দেখে বুক কেঁপে ওঠে। এই ভয়ংকর রূপেরও একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে, চোখ ফেরানো যায় না, শুধু নদীই নয় দু'লোচনকে আকর্ষণ করে আরো অনেক কিছু, চোখ যায় কুয়াশাবৃত নদীর দু'কূলে। যে আমার নদীর দু'কূলে আশ্রয় নিয়ে আছে তা শুধু কুয়াশা নয়—উন্মত্ত নদীর বুক থেকে ছিটকে আসে শীকর। এই জলকণা কুয়াশার সঙ্গে নদীর দু'কূলের বাতাসকে আলিঙ্গন করে আছে। নিচে নদী, আর উপরে অম্বরের সাথে সদা আলাপে রত পাইন যার পাতার পাতায় যেন ছড়িয়ে আছে তরল হিরণ্য। অশান্ত সমীরণে পাইনের হৃদপিণ্ডে কাঁপ ধরে, শিরশির শব্দ করে কাঁপতে থাকে গাছের পাতা আর তখনই মনে হয় গলিত সোনা যেন চুঁইয়ে নামে এক পাতা থেকে আরেক পাতায়, সেখান থেকে ঝরে ঝরে পড়ে পাহাড়ের কঠিন অশ্মের গায়ে। কুমারী হৃদয়ের মত রহস্যময় এই গিরীশ, যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধু সবুজ আর শুভ্রের সমাহার। কখনো কখনো চোখ পড়ে পর্বতের ক্রেষ্টে রংয়ের খেলা। অসম্ভব উজ্জ্বল সেই রংয়ের খেলা যখন বরফের উপর চলতে থাকে তখন মনে হয় প্রকৃতির এই রূপ দু'চোখের দ্বার খুলে আমার ভাললাগার ভাণ্ডারকে ভরিয়ে রাখি অনন্তকাল ধরে। নিজের উপর রাগ হয়—ভাষার ভান্ডার এতই অপূর্ণ যে এমন রূপ যা দু'চোখে মেখে থাকে তা লিপিবদ্ধ করতে পারব না বলে, শুধু মনে হয় এখানেই সুরলোক এখানেই স্বর্গ। দু'চোখ মেলে এতদিন অনেক কিছু দেখেছি, দেখে মনের বৃন্তে ভাললাগার কুঁড়িটি পাপড়ি একটু আধটু মেলেছে কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেই কুঁড়ির প্রতিটি পাপড়ি যেন মেলে দিতে শুরু করেছে, অসম্ভব ভাললাগার তরঙ্গের মধ্যে ডুবে গেলাম আমি।

বিয়াস আমার পাশের আসনে বসে আছে কিন্তু ওর উপস্থিতির কথা অনেকক্ষণ আমি ভুলে ছিলাম। প্রকৃতির এই রূপের হাট দেখে ওর অবস্থাও অনুরূপ তা না হোলে বিয়াস এতক্ষণ মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকার যে পাত্রী নয় তা আমার ভাল-

ভাবেই জানা। শুধু বিয়াস কিম্বা আমিই নই প্রত্যেকেই যেন কথার সিঁড়ির ধাপে পা রাখতে অনিচ্ছুক। বুঝতে অসুবিধা হোল না আমার মত তাদের দৃষ্টিও স্পর্শ করে আছে বাসের জানালার বাইরের পৃথিবীকে।

কী অপূর্ব! বিধির রূপের সাজিতে আর কী আছে জানি না তবে যা দেখতে পাচ্ছি তা অসাধারণ, অনবদ্য।—হঠাৎ যেন জেগে উঠল বিয়াস।

সত্যি অপূর্ব। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু পাহাড়। দূরের পাহাড়ের রূপ দেখে মনে হয় কোনো যুবতী রূপসীর শরীরে যৌবনের সম্ভার বড় বেশি ভরাট, মনে হয় অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার আধখানা মুখে বিচিত্র হাসি ভেসে আছে, আরো অনেক কিছুর প্রলেপ তার মুখে, কী প্রবল আকর্ষণ তা বলে বোঝানো শক্ত, সেই আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে কেউ তা ভাবাই যায় না। কাছের পাহাড়ের আকর্ষণও কম না—দু-চোখকে টেনে রাখে। পাহাড়ের গায়ে নাম না জানা পাহাড়ী ফুলের শরীরে রংয়ের ছড়াছড়ি। প্রজাপতির দলও আসে রংয়ের বৈচিত্র নিয়ে, রং বাহারী বীজন বিস্তার করে বসে ফুলের উপর। রেণু নিয়ে চলে যায় আরেক ফুলে। প্রকৃতির সাম্রাজ্যের সম্পদ লুঠ করে নেবার জন্য কেউ এখানে আসে না, কোনো জন-মানবের পদচিহ্ন নেই, নির্জনতা এখানে পাহাড়ের মতই কঠিন। শুধু মাঝে মাঝে সেই নির্জনতার বুকে সামান্য আঘাত হানে কিছু মিলিটারি ট্রাক আর যাত্রীবোঝাই গাড়ি। আমাদের কিছুক্ষণের জন্য সংগ দিচ্ছে মিলিটারি জীপ এবং ট্রাক অথবা যাত্রী বোঝাই বাস। এইসব সঙ্গীরা কখনো হারিয়ে যাচ্ছে কোনো পাহাড়ের বাঁকে আবার কখনো তারাই সংগী হচ্ছে পুনর্বার। এক এক সময় চোখে পড়ছে প্রশস্ত পাহাড়ি ঝরণা পাথরের বুক বেয়ে নেমে আসছে একটা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত তার পরই সেই দুর্বার জলরাশি কয়েক শ' ফুট নিচে লাফিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে এই নির্ঝর কিছুটা নেমে আসার পর শত ধারায় বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ পর্বতমালা আমার দুচোখকে ক্রমাগত আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে তার রূপ বর্ণনা করার ভাষা আমার জানা নেই, একথা আগেই জানিয়েছি, শুধু বলতে পারি পৃথিবীর সৌন্দর্যের নির্যাস ছড়িয়ে আছে তুষারাবৃত এই পর্বতমালার মাধ্য। যুগ যুগ ধরে কত মানুষ উৎসর্গ করে চলেছে নিজেদের জীবন এ চির অজানা গিরিশের রহস্যের আবরণটা উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে। দুর্বার আকর্ষণ কঠিন পাথরের বুকে, হাজার হাজার মানুষের কৌতুহলেব শেকড় স্পর্শ করে আছে এই কঠিন প্রস্তরের খানা-খন্দরে।

বিয়াস বেশ কিছুক্ষণ মৌনব্রত পালন করার পর আবার অধরদ্বয়কে বিযুক্ত করল, একক দেখ এই নদীটা কত সরু হয়ে গেছে, এর অর্থ আমরা এখন অনেক উপরে উঠে এসেছি।

ওর কথা শুনে দৃষ্টি নামিয়ে আনলাম খাদের মধ্যে। অশান্ত খরস্রোতা যে নদীকে এতক্ষণ দেখে এসেছি সে নদীকে এখান থেকে দেখলে বোঝা শক্ত সেই নদী কতটা দুর্বার, তার ফুলে-ফেঁপে থাকা রূপটা চোখে পড়ে না। এখান থেকে তাকে

একটা শীর্ণ সর্পিল রেখার মত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একটা রূপোলী পথ পাহাড়ের কোনো গোপন স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করে বাঁক নিয়ে দিক পরিবর্তন করতে করতে আবার কোনো পাহাড়ের বাঁকে হারিয়ে গেছে। এমন কি এটা যে একটা নদী সেটা না জানা থাকলে বিশ্বাস করা যেত কি না বলা শক্ত। এই নদী যে প্রশস্ত এবং দুর্বার তা বিশ্বাস করা আরো কঠিন।

আমি জানালার ওপাশ থেকে চোখ সরিয়ে বিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই নদীর নাম জান বিয়াস?

না, কী নাম?

খুনীনালা।

খুনীই বটে, যা ভয়ঙ্কর চেহারা দেখেছি!

এই নদীকে সন্দেহের চোখে না দেখে উপায় নেই। যে রূপ অবলোকন করেছি তাতে অনুমান করতে পারছি অনেক মানুষের প্রাণপাখিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জলপ্রবাহের সঙ্গে। সম্ভবত এই কারণেই এই নদীর নাম খুনীনালা।

চন্দ্রা আমার পেছনের সীটে বসেছিল এবং এতক্ষণ আমাকে রীতিমত অবাক করে নীরব থেকেছে, হঠাৎ ঝুঁকে বিয়াসের নিকটবর্তী হয়ে বলল, এই বিয়াসদি অনেকক্ষণ এককদার পাশের আসনটা দখল করে আছ আর নয় এবার ছাড়—আমি বসব। মানুষটাকে এত চুপচাপ থাকতে দেয়া যায় না।

বিয়াস হাসল, বলল এখানে বসার ইচ্ছে? সে কথা আগে জানালে আমি বসতাম না।

রাগ করে বলছ না ত?

রাগ করব! এতে রাগ করার কোন কারণ থাকতে পারে বলে ত' মনে হচ্ছে না, কথাটা বললে কেন বল ত'?

দূর আমি কী মনে করে কিছু বলি কখনো. তুমিও যেমন আমার কথার কারণ খুঁজছ।

বিয়াস উঠে চন্দ্রার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন করে নিল।

চন্দ্রা আমার পাশে এসেই মুখ খুলল, এককদা আমাদের শ্রীনগরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

জম্মু থেকে শ্রীনগর বারো ঘণ্টার পথ, আমরা কতক্ষণ বাসে আছি তা ভেবে দেখ তাহলেই বুঝতে পারবে আর কতটা পথ পাড়ি দিতে হবে আমাদের।

মাত্র আড়াই-তিন ঘণ্টার রাস্তা অতিক্রম করেছি এর অর্থ আরো ন' সাড়ে-ন' ঘণ্টার পথ পড়ে আছে! এতটা পথ আমি শুধু পাহাড় দেখে কাটাতে পারবো না—গল্প বল।

কী গল্প শুনবে অচিনপুরের রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাহিনী?

আহা আমি যেন কচি খুকী, আমার বয়স কত জান? সতের ছুঁই ছুঁই, তাছাড়া আর ক'মাস বাদেই কলেজে যাব, অনেকে আমাকে আপনিও বলে।

তাহলে তোমাকে এখন লেডি বলা চলে ?

চলেই ত', শাড়ি পরলে তুমিও প্রথমে আপনি যে বলতে না একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। সে যাক, একটা গল্প ফেঁদে বস ত' শুনে পথের ক্লান্তি দূর করি— ন' সাড়ে-ন' ঘণ্টার পথ এখনো যেতে হবে একথা ভাবতেই আমার কান্না পাচ্ছে।

গল্প লিখতে পারি কিন্তু বলতে ত' পারি না চন্দ্রা। লেখা আর বলার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে, লেখক হোলেই যে বাগ্মী হোতে হবে এরকম ধারণা থাকা ঠিক নয়।

গল্প লেখার গল্প শুনব আমার মনে হয় তা বলতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।

গল্প লেখার গল্প! সেটা কী ? মনে মনে এক একটা ঘটনা সাজাই তারপর তা লিপিবন্ধ করি।

সবই কী কল্পনা ?

সবই যে কল্পনা এ কথা বলা ঠিক হবে না আবার পুরোপুরি বাস্তব এটাও ঠিক নয়, সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় দুয়ের সংমিশ্রণ। ধর কারো চেহারা সুন্দর কিন্তু মনটা সেরকম নয়, এরকম ক্ষেত্রে সেই চেহারার সাথে একটা সুন্দর মন জুড়ে দি আবার কখনো হয়ত এমন একটা চরিত্র সৃষ্টি করতে চাই যার চেহারাটা আদৌ সুন্দর নয় কিন্তু মনটা তার বিপরীত, সে ক্ষেত্রে তোমার মত মনের সাথে আমার মত চেহারা জুড়ে দিয়ে সৃষ্টি করি ·

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে চন্দ্রা বলল, আহা তুমি বুঝি অসুন্দর !

না, খুব বেশি নয় শুধু অন্ধকারে আমাকে প্যাঁচারাই খুঁজে নিতে পারে আর অন্য সময় আমার স্বজাতিরা বুঝে উঠতে পারে না আমি তাদের পূর্বপুরুষদের অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে কী করে এই বিংশ শতাব্দীতেও বর্তমান।

অনেক হয়েছে এবার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও ত' এই ট্যুরের পর সত্যি কী আমার কথা তোমার মনে থাকবে ?

মনে থাকবে না আবার, এমন বন্ধুকে ভুলে যাব এ কথা মনে একদম ঠাঁই দেবে না।

চন্দ্রার সঙ্গে আমার কথা চলতে থাকল সেই সঙ্গে দৃষ্টি ছড়িয়ে থাকল প্রকৃতির রাজ্যের আনাচে-কানাচে।

বাসের যাত্রীরা তন্ময় হয়ে প্রকৃতির রূপের বৈচিত্র্যের ছবি তুলে রাখছিল চোখের ক্যামেরার সাহায্যে, কারো মুখেই প্রায় কথা ছিল না। শুধু দু'চার জন ফিস ফিস করে যা দু'চারটা কথা বলছে তা-ও খুব সন্তর্পণে। যেন জোরে কথা বললেই অন্যদের ধ্যান ভঙ্গ হবে। খুব যে বেশিক্ষণ ঐভাবে কথা বলছিল তা নয় কিছুক্ষণের মধ্যেই কথার ঢেউ বড় হোতে শুরু হোল। নীরবতার প্রাচীর ক্রমশঃই ভেঙে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করল। মাসিমা সোনাবৌদির সাথে গল্প গল্প জুড়ে দিয়েছেন, ওদের কিছু কিছু কথা আমার কানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এই মুহূর্তে ওদের মধ্যে যে কথো-

পকথন চলছে তা আমাকে কেন্দ্র করে। ওদের ঠিক পেছনের আসনে সুরেখা আর সুরজিৎ। সুরেখার দৃষ্টি খোয়া গেছে জানালার বাইরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে। সুরজিৎ মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলছে আর সে কথার জবাব দে'য়ার জন্য দু'-একবার শুধু ঘাড় ঘোরাচ্ছে সুরেখা।

চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যেন কথার বাজনাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমি, দু এক মিনিট দেখে চন্দ্রা বলেছিল, কী হোল চুপ করে গেলে কেন?—কথা বলার সময় ওর মনের ক্ষোভ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

বললাম, এই হিমালয় দেবালয়, অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে গিরীশকে ঘিরে, যদি শুনতে চাও সে সব উপাখ্যান তাহলে তা বলতে পারি তোমাকে তবে এখন নয়, এখন শুধু দুচোখের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখ, দু'চোখ ভরে দেখ প্রকৃতি কত সুন্দর, অরণ্য কত নিবিড় আর পাহাড় কত বিশাল।

সত্যি কথা বলতে কী আমার কথা বলতে ভাল লাগছিল না, তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছিল প্রকৃতির সাম্রাজ্যে।

মেঘ-মুক্ত আকাশ। দৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত শুধু পর্বতমালা। এইসব পর্বতের বুক চিরে রাস্তা তৈরি হয়েছে কিন্তু এ রাস্তার অস্তিত্ব দূর থেকে বোঝার উপায় নেই, ঘন ঝাউয়ের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। একটু আগে কোন পর্বতটা অতিক্রম করে এসেছি তা বোঝারও উপায় নেই, এরপর কোন পাহাড়টাতে গিয়ে হাজির হব তা-ও অজানা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস ছুটে চলেছে এক নাগাড়ে। সোঁ সোঁ করে বাতাস ছুটে আসছে; যাবার সময় সমীরণ কান স্পর্শ করে চুল উড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এক এক সময় চোখে পড়ছে এক একটা প্রস্তরখণ্ড এমনভাবে পাহাড়ের বুকে ঝুলে আছে যে তা দেখলে মনে হয় এই বুঝি গড়িয়ে পড়বে আমাদের উপর। এরকম যখনই মনে হচ্ছে তখনই একটা ভয়ঙ্কর ছবি ভেসে উঠেছে মনের মধ্যে। বাসের একটু ব্যবধানে পাহাড়ের ঢাল, নিচে গভীর খাদ, ঐ খাদের মধ্যে বাসটার গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য তারপরই মানস চক্ষে যেন দেখতে পাই খাদের মধ্যে পড়ে থাকা আমার রক্তাক্ত দেহ সেই সঙ্গে অন্যান্যদেরও। সেই সব দেহ বিধাতাও বোধহয় সনাক্ত করতে পারবে না কার দেহ কোনটা। যখনই এরকম মনে হয়েছে তখনই অনুভব করছিলাম শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কিছু ওঠা-নামা করছে। একটা শিরশিরানি সমস্ত দেহের মধ্যে বিরাজ করছে।

আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারব না। দেখার কথা বলছ! দেখার সঙ্গে কথা না বলার কী সম্বন্ধ আছে বুঝতে পারছি না।—চন্দ্রা এ পর্যন্ত বলেই অন্য কথা পাড়ল, বলল, শীলভদ্রকে দেখ এককদা।

কে শীলভদ্র?—আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে।

বাবার সঙ্গে যে গল্প করছে। তার আরো একটা নাম আছে—হেড লাইট।

আমার চোখে বিস্ময়। প্রশ্ন করলাম, এগুলো কী ভদ্রলোকের নাম?

না, ভদ্রলোকের কী নাম জানি না, যে নাম তুমি শুনলে তা আমি রেখেছি,

শুধু ওনারই নয় আরো অনেকের নামকরণ করেছি, ঐ যে ডান দিকের সামনের সীটে সাদা শাড়ি পরে বসে আছেন তার নাম ইন্দিরা গান্ধী। ওর পাশের ছেলেটার নাম পটলডাঙার টেনিদা। বিয়াসদির ঠিক পেছনের আসনে যে ভদ্রমহিলা আছেন তার নাম শ্রীমতি ভয়ঙ্করী।

অদ্ভুত ব্যাপার! এসব নামকরণ করার অর্থ?

শীলভদ্র নাম রেখেছি কেন জান? ভদ্রলোক বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং কলকাতার একটা কলেজের প্রিন্সিপল। ভদ্রলোকের মাথায় সুবিশাল টাক আছে বলে আরো একটা নামাকরণ না করে পারিনি। পটলডাঙ্গার টেনিদা মানেই গল্পের কোল্ড-স্টোরেজ, যে ছেলেটার নাম টেনিদা রেখেছি তার সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবে ওরকম একটা নামাকরণ না করলে তার উপর রীতিমত অবিচার করা হোত। অন্যান্যদেরও করা হয়েছে অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করে।

তাহলে ধরে নেয়া যেতে পারে এ কাজে তুমি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছ-কী বল?

তা ঠিক, তবে কী জান যতই পারদর্শিতা থাক না কেন তোমার মত অত সুনাম অর্জন করতে পারব না।

অতটা না হোলেও কিছুটা খ্যাতি তোমার কপালে জুটছে তাই ত'?

অবশ্যই, আমার ক্লাসের বন্ধুদের কাছে এই প্রতিভার জন্য আমি খুবই জনপ্রিয়।

আচ্ছা এবার আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও এ অভ্যেসটা তোমার কতদিনের?

মনে করাই শক্ত অনেক দিনের। স্কুলের সমস্ত দিদিমনিদের নামকরণ করেছি, এবার ভাবছি পরিচিতদের একজনকেও বাদ দিলে চলবে না প্রত্যেকের উপর সদয় হোতে হবে। তুমিই বল এককদা এটা না করলে তাদের উপর অবিচার করা হবে না?

আমি কথা শুনে না হেসে পারি না, বলি, ঠিকই ত' অবিচার কী বলছ রীতিমত অবিচার করা হবে। শুধু একটা অনুরোধ কাজটা যখন শুরু করবে তখন আমার উপর সুবিচার কোর না।

চন্দ্রাও হেসে ফেলল, বলল আমি কী এতই বোকা, তোমার মত একজন নামি লেখকের নামকরণ করে লোকের কাছে নিজেকে পাগল প্রতিপন্ন করে বসি আর কী! আমার স্কুলের দিদিমনিদের যে নাম আমি রেখেছি তা এখনো তোমাকে বলা হয়নি—না? অঙ্কের দিদিমনির নাম হিপোপটেমাস, বাংলার—সুর্পনখা, ইতিহাসের দিদিমনির নাম কুইন এলিজাবেথ। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে কি না জানি না স্কুলের কেউই দিদিমনিদের আসল নাম ধরে তাদের অসাক্ষাতে ডাকে না। শুধু দিদিমনিরাই নিজেদের মধ্যে আসল নাম ব্যবহার করে।

বল কি এরকম একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম করে চলেছ তুমি!

চন্দ্রা আমার কথায় যেন উৎসাহিত হোল। পরবর্তী বক্তব্যে তা যথেষ্টই প্রকাশ পেল। আমার কথা শেষ হোতে না হোতেই ও উৎসাহের আতিশয্যে বলতে থাকল, এতেই অবাক হোচ্ছ দাঁতকপাটিকে কী করেছিলাম জান?

সে আবার কে ?

ভূগোলের দিদিমনি। একবার পড়া পারিনি বলে ক্লাসের বাইরে বার করে দিয়েছিল, পরের দিন চেয়ারের হাতলে বিছুটি পাতা ঘঁষে রেখেছিলাম।

চন্দ্রা একের পর এক তার অপকর্মের কাহিনী মেলে ধরছিল। ওর সে কাহিনী শুনতে আমার খারাপ লাগছিল এ কথা বলতে পারব না, যদিও বুঝতে পারছিলাম ওকে উৎসাহিত করা উচিত নয় তবু আমি বাধা দি-নি। বাধা দি-নি এই কারণে যে কিছু কিছু ছোটখাট অন্যায় কাজ করতে না দিলে পরোক্ষভাবে অনেক বড় অন্যায় কাজ করার দিকে ঠেলে দে'য়া হয়। তাছাড়া কাজটা ও অন্যায় করছে ঠিকই তবে তা দীর্ঘস্থায়ী নয় বলেই মনে হয়েছিল আমার।

বারো ঘণ্টা বাস জার্নির পর শ্রীনগরে এসে পেঁছিলাম যখন আমরা তখন সন্ধ্যে সাতটা। সকলেই পরিশ্রান্ত। একটা রাত এবং একটা দিনের বারো ঘণ্টা সময় ট্রেনে আর বাসে কেটেছে সুতরাং শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ক্লান্তি জড়িয়ে আছে। হোটেলে পেঁছেই প্রত্যেকেই শয্যায় গা রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যদিও শ্রীনগর তখন রাতের রাণী সেজে বসে আছে এবং তার দেহের পাকে পাকে দুর্বিনীত আহ্বান তবু আমাদের যা শরীরের অবস্থা তাতে শরীরকে একটু তরতাজা না করে কোনো আহ্বানেই সাড়া দে'য়ার ক্ষমতা নেই। পরের দিন ভোরের আলো কাঁচের শার্শি অতিক্রম করতেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালাম প্রথম তারপর বারান্দার দিকে পা বাড়ালাম। পদচালনা করে একটা বৃত্তাকার ঝুলবারান্দায় এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম সামনের দিকে। ঠাণ্ডার দাপট এখন খুব বেশি নয় তবু একেবারে নেই বলা চলে না। শিরশিরানি ঠাণ্ডা আছে তবে গায়ে বেঁধে না বলে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। একেবারে হয় না বললে ঠিক বলা হবে না-- গায়ে চাদর জড়িয়ে আসলে ভাল হোত। একবার মনে হোল জড়িয়েই আসি কিন্তু পরে মনে হোল ব্যাগ থেকে চাদর বার করতে হোলে কিছু কিছু জিনিস বার করতে হবে প্রথমে তা না হোলে চাদরটা বার করা সম্ভব হবে না। এটুকু ঠাণ্ডার জন্য এতটা ঝক্কি প্রত্যুষেই পোয়াতে রাজী নই বলে যে ভাবে দাঁড়িয়ে-ছিলাম সে ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলাম।

ডাল-লেকের জলে ভেসে রয়েছে অসংখ্য হাউস-বোট আর শিকারা। এখনো ভোরের আলো খুব স্বচ্ছ নয় কুয়াশা আচ্ছন্ন করে আছে সূর্যকে। কুয়াশার আবরণ ডাল-লেকের উপরও যেভাবে ছড়িয়ে আছে তাতে দৃষ্টি কিছুটা গিয়েই প্রতিহত হয়। কুয়াশার দেয়াল পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এই সময় চন্দ্রার সেই ইন্দিরা গান্ধী ধূমায়িত কাপ হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, যতটা ঠাণ্ডা আশা করেছিলাম ততটা ঠাণ্ডা কিন্তু নেই—আপনি কী বলেন ?

আমি ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তি বারান্দায় নেই সুতরাং কথাটা আমার উদ্দেশ্যেই যে বলেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয় তবু আমি বললাম, আমাকে বলছেন ?

আর কোনো মানুষ যখন নেই তখন প্রশ্নটা যে আপনার কাছেই সেটা না বোঝার ত' কথা নয় !

তা ঠিক—খুব বেশি নেই !—এ পর্যন্ত বলেই তার হাতের ধূমায়িত কাপটার দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, এত সকালে কোথায় পেলেন ?

খাবেন ? দাঁড়ান দেখছি।—বলেই গলার স্বর সামান্য চড়িয়ে ঈশান নামের কোনো একজনের উদ্দেশ্যে হাঁকডাক সুরু করলেন। তার ডাক শুনে এক অল্প বয়সের ছেলে প্রায় ছুটে এলো। ও আসতেই ভদ্রমহিলা আরো এক কাপ চা আনার নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, বিস্মিত হয়েছেন যে কিছুটা তা আপনাকে দেখেই বুঝতে পারছি—কী তাই ত' ?

ঠিক, আমরা কাল সন্ধ্যের সময় হোটেলে এসেছি, বলতে গেলে এসেই বিছানা নিয়েছি—এরমধ্যে ওকে চিনলেন কী করে ?

আমি এই প্রথম নয় এর আগেও এই হোটেলে থেকেছি, হোটেলের অনেককেই চিনি, আচ্ছা এককবাবু আপনার এই যে ঘুরে-বেড়ানো তা কী লেখার উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ?

মূল উদ্দেশ্য বেড়ানো।

আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কোনো সময়ই একা পাচ্ছিলাম না বলে সে আসা এতদিন পূর্ণ হয়নি—যা ভিড় আপনার চারপাশে—আমার সৌভাগ্য আজ আপনাকে একা পেলাম। আমি আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা। কতটা ভক্ত যদি জানতে চান তাহলে বলব আপনার চল্লিশটা প্রকাশিত উপন্যাসের যে কোনো একটার বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন কতটা জানি আমি। আমার বিশ্বাস আপনাকে বিস্মিত করতে পারব।

তাতে কতটা বিস্মিত হব সে কথা পরে, তার আগে আমার যেটা মনে হচ্ছে সেটা শুনবেন ?

যা বললাম তারপর কী কোনো কিছু বলার জন্য অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন আছে ? এ সকাল আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পরে যখন অতীত রোমন্থন করব তখন বার বারই মনে পড়বে একক গুপ্তর সাথে একটা সকালের কথা। আরো অনেক কথা বলার আছে তবে তার আগে আপনার কথা শুনি।

যদি জানতাম আমার এমন একজন গুণমুগ্ধ পাঠিকা আমারই সহযাত্রী তাহলে নিজে এসেই আলাপ জমাতাম, এ সংবাদটা এ ক'দিন জানতে পারিনি ভেবে এ মুহূর্তে কম বিস্মিত হচ্ছি না।

বিশ্বাস করতে পারি ত' ?—প্রশ্ন করে ভদ্রমহিলা হাসলেন।

আমার মুখ খোলার আগেই ঈশান এলো। ধূমায়িত চায়ের কাপটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে যে ভাবে এসেছিল সে ভাবেই চলে গেল। আমি চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালাম তারপর ভদ্রমহিলার প্রশ্নের জবাব দিলাম। বললাম, বিশ্বাস না করলে আমার উপর অবিচার করা হবে।—বলে পূর্বের মত সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম।

কুয়াশার চাদর একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। দূরের দৃশ্য আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন পাহাড় আর গাছ-গাছালি যেন বহু দূরের কোনো জমাট বাঁধা স্তর থেকে ভাসতে ভাসতে দৃষ্টির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করছে। অম্বরে ফিকে লালের প্রলেপ, আকাশের নীল রং আর লালের আভা তখনো আমাকে দেখতে হচ্ছিল কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে। সকালের এই রূপ অপরূপ। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল ইতিপূর্বে দেখিনি অথবা তা আমার ভাল লাগেনি এমন নয় কিন্তু এ ভাললাগা যেন অন্য রকম. যেন কোনো অচেনা দৃশ্য যার জন্য অনেক কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করে আছি তা ক্রমশই প্রকাশিত হচ্ছে আর এই কারণেই মনে হয় এ ভাললাগাটা অন্য রকম।

সমস্ত দিনের মধ্যে ভোরই সব থেকে সুন্দর—না ?— ভদ্রমহিলা প্রশ্নটা করে চায়ের কাপে সিপ করলেন।

বললাম, নিঃসন্দেহে।

প্রত্যেক মানুষের জীবনে ভোর হয়, তখন তার সব কিছু ভাললাগে, পৃথিবী তখন তার কাছে বড় বেশি বর্ণময়—শুধু রংয়ের ছড়াছড়ি। মানুষ একটা দিনের মত প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করতে করতে আসে, এই অতিক্রম করে আসার সময় পৃথিবীকে সে অনেক ভাবে দেখে—আপনি কী বলেন ?

আমি ঠোঁট বিযুক্ত না করেই প্রশ্নের জবাব দিলাম অর্থাৎ দু'ঠোঁটের মাঝে এমন একটা হাসি ভাসালাম যা দেখে ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহ হতে পারেন যে তার সাথে আমি একমত।

দিনের মত মানুষের জীবনেও আসে বিষণ্ণ সন্ধ্যা তখন পৃথিবী তার কাছে বড় বেশি ধূসর—সমস্ত রং অন্তর্হিত, এ সময়টা বড় কষ্টের। আজ আমি এ জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। আজকের এই ভোরের রূপটা অপূর্ব কিন্তু এরকম একটা ভোর আমার জীবনে দেখা দিয়ে কখন কীভাবে মিলিয়ে গেল তা বুঝতেই পারিনি, এখন মনে হয় একটা স্বপ্নের মত যেন ভোর এসেছিল আমার জীবনে। বার বার মনে হয় ভোরের নরম রোদে গা ডুবিয়ে রাখার সুযোগ আর পাব না তবু অতীত রোমন্থন করে কিছুটা সুখের সন্ধান পাবার চেষ্টা করি, কখনো পাইও কিন্তু যখনই মনে হয় আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠেছে তখনই বুকের মধ্যে কষ্টটা অনুভব করি। আপনি লেখক আমার ধারণা আপনারা একটা সম্পূর্ণ দিনকে দেখতে পান, প্রত্যেকটা পর্যায়ের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারেন আর এই কারণেই এত কথা ব্যক্ত করতে পারলাম।

একটা দিনের সঙ্গে মানুষের জীবনের উপমাটা খুব বেশি সঠিক।

সন্ধ্যা যখন ঘন হয় তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না রাত্রি খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে, রাত্রি মানেই ত' একটা দিনের অবসান। সন্ধ্যা আসা মানেই প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা।

আপনার সাথে আমি একমত হতে পারছি না। মৃত্যু মানুষের জীবনের একটা পরিণতি—প্রত্যেকের জীবনে আসবে ; অবশ্যম্ভাবী। যা অবশ্যম্ভাবী যা প্রত্যেকের জীবনে আসবে তার কথা ভাবাও উচিত নয় অপেক্ষা করে থাকাও উচিত নয়। মৃত্যুই

অপেক্ষা করে থাকে সময়ের জন্য, সঠিক সময় মৃত্যু প্রত্যেককে কাছে টেনে নেবে। যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেদিন মৃত্যুর কথা ভাবেননি, তিলে তিলে যখন বেড়ে উঠছিলেন তখন কী মনে হয়েছে মৃত্যুর কথা! নিশ্চয়ই হয়নি তাহলে আজ কেন এ কথা ভাবছেন? আমরা আমাদের বংশধরদের মধ্যে বেঁচে থাকি।

আপনি লেখক তাই আপনার বিচার-বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণ অনেক বেশি নিখুঁত, যা বললেন তা ঠিক। ঐ ভাবে না দেখলে মৃত্যুভয় আমাদের পুরোপুরি গ্রাস করে রাখবে, যে ক'দিন আছে সে ক'দিন শুধু মৃত্যুর পদধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে থাকাই হবে, সেটা ভয়ঙ্কর।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকল। যতক্ষণ না সূর্যের গায়ে সোনালী রং দেখা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কথার মালঞ্চে বিচরণ করতে থাকলাম আমরা। কুয়াশার চাদর যখন পুরোপুরি সরে গেল ডাল-লেকের উপর থেকে এবং ভাস্কর যখন পীত বস্ত্রখানি অঙ্গে তুলে নিল তখন আমি ভদ্রমহিলার কাছে বিদায় নিয়ে আমার কক্ষে ফিরলাম।

॥ নয় ॥

বিকেলে আমরা বেরোলাম। এক সাথে নয়, দু'চারজন করে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। আমি, চাচিজী, বিয়াস, সুরেখা, চন্দ্রা, চন্দ্রার মা-বাবা এবং মাসিমা-মেসোমশাই বেরোলাম এক সাথে। আমাদের হোটেলের দরজার বাইরে পা বাড়ালেই ডাল-লেকের সংলগ্ন প্রশান্ত রাজপথ; এই রাজপথ ধরে পরস্পরের সাথে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেছি, কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নয়, যা চোখে পড়ে তা দু'চোখ ভরে দেখে নে'য়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। আমাদের দশ সংখ্যা বিশিষ্ট দলটি কোনো সময়েই এক সারিতে চলতে সক্ষম হচ্ছিল না, সক্ষম হচ্ছিল না এই কারণেই যে এত বড একটা দল পাশাপাশি হাঁটলে যান-বাহনের চলাচলের বিঘ্ন ঘটবে, বিঘ্ন না ঘটাবার জন্য দু'তিনজন করে এগিয়ে পিছিয়ে থাকছিলাম। এক সময় সুরেখা আর আমি এগিয়ে গেলাম।

পড়ন্ত বিকালের রোদ এখন পাহাড়ের মাথায়-মাথায়। ডাল-লেকের উপর হাউস-বোট এবং শিকারা ভেসে আছে। কখনো কোনো কোনো শিকারাতে নববিবাহিত দম্পতির ঘন হয়ে বসে থাকার দৃশ্য চোখে পড়ছিল আবার কখনো চোখে পড়ছিল তিন-চারজন এক একটা শিকারাতে। কোনো কোনোটা থেকে ভেসে আসছিল হিন্দি এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুর। মাঝে মাঝে ডাল-লেকের বুকে আরো একটা মনোরম দৃশ্যের উপর চোখ পড়ছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম এক একটা ভাসমান উদ্যান। এই বিকেল এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে বিরল, মনে হয় ভূস্বর্গ ব্যতীত আর কোথাও সব মিলিয়ে এরকম একটা বিকেলের দৃশ্য চোখে পড়বে না।

বড় সুন্দর বিকেল—না?—সুরেখা দৃষ্টি বিছিয়ে রেখে হাঁটছিল। ওর চোখ

অনেক কিছুর মধ্যে ডুবে ছিল, যে মুহূর্তে ও ওর কথার সমর্থনের জন্য প্রশ্নটা করল শুধু সে সময় একবার ওর দৃষ্টি আমার মুখের উপর ঘুরে গেছিল।

আমি বললাম, এরকম একটা বিকেল দেখার জন্যই ত' এতটা পথ অতিক্রম করে আসা।

আমার উত্তর শুনে আরো একবার ওর দৃষ্টি ঘুরে গেল আমার মুখের উপর। এরপর ও দৃষ্টি সামনে প্রসারিত রেখে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল, বলল, আপনি যা লেখেন তাতে বাস্তবের ছোঁয়া কতটা ?

আপনি ত' আমার লেখা পড়েছেন আপনার কী মনে হয় ? অবাস্তব ?

আপনার সব লেখা আমি পড়িনি যেটুকু পড়েছি তাতে অবাস্তব বলব না তবে খুব বেশি বাস্তবধর্মী লেখা এ কথা বলতে পারছি না। আপনার লেখার আরো একটু সমালোচনা করলে আপনি কতটা ক্ষুব্ধ হবেন !

বিন্দুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করব না আপনি নির্দ্বিধায় আপনার বক্তব্য শেষ করতে পারেন। ভুল যে করে তার চোখে ভুলটা সহজে ধরা পড়ে না।

যদিও আমাদের পরিচয়ের সময়-সীমা খুব বেশি নয় তবু এ সময়ের মধ্যে আপনাকে যেটুকু বুঝেছি তাতে বলতে পারি জীবন সম্বন্ধে আপনার যে রিয়েলাইজেশন তার রিফ্লেকশন কিন্তু আপনার লেখায় নেই, একেবারেই নেই বলব না আছে তবে যতটা থাকা উচিত ততটা নেই।

সব পাঠকই যদি আপনার মত হোত তাহলে লেখার আগে ভাবতে হোত।

আপনি পাঠককে কী ভাবেন জানি না তবে আমার ধারণা তারা ফাঁকিটা ধরতে পারে।

সব পাঠক ধরতে পারেন কিনা জানি না তবে আপনার মত পাঠক-পাঠিকারা যে ধরতে পারেন তার প্রমাণ ত' পেলাম। আসলে কী জানেন মস্তিষ্কের গবেষণাগারে চরিত্রগুলো নিয়ে খুব বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার সুযোগ আমাদের হাতে থাকে না, ফলে নিজের ভেতর যা কিছু আছে তা মন্থন করে যা পাওয়া যাওয়ার কথা তা পেতে পারি না এবং পাঠকের হাতে তুলেও দিতে পারি না।

কেন ? সুযোগ থাকে না কেন ?

আপনি যে ধরনের লেখার কথা বলছেন সে লেখার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা হাতে থাকে না, আসলে লেখাকে জীবিকা করে নে'য়ার পরিণতি এটা। প্রফেশনাল হোলে এই হয়।

কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত কারণ সংখ্যাধিক্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে গুণগত মানের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখলে পেটে টান পড়বে এটা সত্যি বলে মেনে নে'য়া যায় না। শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মানিক বন্দোপাধ্যায়ের লেখা আজও মানুষের মনের কতটা জায়গা দখল করে আছে তা ত' দেখতেই পাচ্ছেন। সব থেকে বড় কথা মানুষের মনের মধ্যে যে রিপুগুলো আছে তাতে সুড়সুড়ি দে'য়ার চেষ্টা করেননি, মানুষের মনের সনাতন দাবিগুলো সম্বন্ধে অধিক মাত্রায় সচেতন ছিলেন তারা। আমরা যতখানি এগিয়েছি তার থেকে বেশি পিছিয়ে পড়ছি, এরজন্য অনেকাংশেই আপনারা দায়ী।

আপনি বলতে চাইছেন আধুনিক সাহিত্যের ব্যাকসিলড হচ্ছে !

লেখার স্টাইলের দিক নিয়ে বিচার করলে আপনাদের উত্তরণ হয়েছে এটা অনস্বীকার্য কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচনটা ভাল এ কথা স্বীকার করতে পারছি না। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে একটা হিংস্র জানোয়ার থাকে, মানুষ সভ্য বলে তাকে ঘুম পারিয়ে রাখার চেষ্টা করে. আপনারা সেই ঘুমন্ত জানোয়ারকে জাগিয়ে তুলছেন।

অর্থাৎ এখন আর ভাল লেখা নেই !

নেই এ কথা বলব না তবে তার সংখ্যা খুব কম।

একটা তর্কের ঝড় দানা বেঁধে উঠছিল। সাহিত্যের আকাশে অনুজ্জ্বল নয় এরকম একটা তারকা একক গুপ্ত। ঝড়ের মুখে পড়তে হয়নি তাকে দীর্ঘদিন। সেই একক গুপ্তকেই ঝড়ের মুখে পড়ে বলে উঠতে হোল, যুগধর্ম, অধিকাংশ পাঠক যা চায় তার দিকে দৃষ্টি রেখেই ত' আমাদের লিখতে হবে।

সুরেখা আমার কথা শুনে হেসে ফেলল, সেলফ্-ডিসেপশন। পাঠক তৈরি হয় না পাঠককে আপনারা তৈরি করেন, ছাঁচে ঢেলে যেভাবে পুতুল তৈরি হয় ঠিক সেই ভাবে আপনারা পাঠককেও ছাঁচে ফেলে আপনাদের লেখা ভাল লাগাবার মতন করে নেন। মানুষ যখন ভাল কিছু পায় না তখন তারা খারাপকেই গ্রহণ করে, করতে করতে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে তখন খারাপের মধ্যেই ভাল-মন্দ খোঁজে। আপনি যা দিতে পারেন তা পাঠককে দিচ্ছেন না একে আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কী বলা যায় !

আমি আস্তে আস্তে পূর্ণ দৃষ্টি সুরেখার মুখের উপর ছড়ালাম তারপর বললাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, এভাবে কেউ কোনোদিন বলেনি আমাকে বললে কলম চালনা করার পূর্বে দশবার ভাবতাম।

আমরা যে ভাবে হাঁটছিলাম তাতে পেছনে যারা আসছিল তাদের সঙ্গে ব্যবধান কমে কমে আসছিল। চাচিজী ক'পা এগিয়ে আমার পাশে এসে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি গুরুজী তোমার সম্বন্ধে কী বলেছেন জান ?

আমি অন্তর্যামী এ সংবাদ আপনাকে কে দিল ?

আমার প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে উনি বললেন, তোমার সম্বন্ধে তাঁর খুব ভাল ধারণা তবে উনি একটা মন্তব্য করেছেন সেটা শুনতে হয়ত তোমার ভাল লাগবে না।

দর্পণে নিজের ভয়ংকর চেহারাটা দেখতে হবে বলে যারা দর্পণের সামনে দাঁড়াতে চায় না তাদের দলে আমাকে ফেলবেন না, সত্যিকে স্বীকার করে নে'য়ার মত সৎ সাহস আছে, আপনি বলুন।

সমুদ্রের ঢেউ পাড়ের কাছে থাকে, মাঝখানের জলে ঢেউ নেই, এর কারণ মাঝখানের গভীরতা বেশি। পাড়ের কাছের ঢেউয়ের মত মানসিক অস্থিরতা অনেকের। তোমার মনেও আছে অস্থিরতা তবে পাড়ের কাছের ঢেউয়ের মতন নয়। উনি মনে করেন তুমি পাড়কে পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছ মাঝখানের গভীরতার দিকে। মনের ভেতর যে অস্থিরতা এখনো আছে তা খুব বেশেক্ষণ স্থায়ী হবে না।

গুরুজীর উপর আপনার খুব বিশ্বাস—না ?

নিজেকে যতটা বিশ্বাস করি ততটা অথবা তার থেকেও বেশি। তিনি যা বলেন তা কখনো মিথ্যে হোতে পারে না। একটা কথা—তাঁর কথা যদি বিশ্বাস করতে না পার তাহলে তা নিজের মনে রেখে দিও আমার কাছে প্রকাশ কোর না, করলে কষ্ট পাব। এক এক সময় সন্দেহ হয় আমার দুই মেয়েরই হয়ত গুরুজীর উপর খুব বেশি অথবা একেবারেই আস্থা নেই, ওরা সে কথা প্রকাশ করেনি হয়ত আমি কষ্ট পাব ভেবেই তাদের মনের কথা প্রকাশ করে না।

আমি, সুরেখা এবং চাচিজী কথা বলতে বলতে এক সঙ্গে বেশ কিছুটা পথ অতিক্রম করলাম। অনেক দূর পর্যন্ত আসার পর ফিরতে শুরু করলাম। ফেরার সময় বিয়াস আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের ছোট্ট বান্ধবীর একটা বিশেষ গুণ আছে মনে হয়, এখনো তা তোমার কাছে অজ্ঞাত।

কী বলত ?

ওর কণ্ঠ থেকে মধু ঝরে।

গান জানে চন্দ্রা ! এরকম একটা সংবাদ জানায়নি ও ! হোটেলে ফিরেই শুনতে হবে।

আমাদের দলে তিন তিনজন শিল্পী—ভাবা যায় !

তৃতীয় জনটি কে ?

সুরেখা কাপুর। ও ভাল ছবি আঁকে।

আমি সুরেখাকে বললাম, আরো কত কী আছে আপনার মধ্যে বলুন ত' !

সুরেখা আমার কথা শুনে একবার শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলল কিন্তু কিছু বলল না। ওর দৃষ্টির মধ্যে কোনো বক্তব্য থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তা আমার বোধগম্য হোল না। ওই দৃষ্টির অর্থ উদ্ধার করতে না পেরে আর কোনো কথার অবতারণা করা উচিত হবে কি না বুঝে উঠতে পারলাম না। চন্দ্রাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বললাম, তুমি ত' সাংঘাতিক মেয়ে এত বড় একটা ব্যাপার জানাওনি ?

ও শুনে বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ওর অবস্থা দেখে বিয়াস বলল, তোমার গান জানার ব্যাপারটা জানাওনি বলে বলছে কথাটা।

দূর, ওটা কি জানাবার মত কিছু। গান ত' অনেকেই জানে,—ওর চোখের উপর থেকে বিস্ময় অন্তর্হিত হোল।

ক'জন জানে কী না জানে সে কথা থাক হোটেলে ফিরেই শুনব এটা আগেই জানিয়ে রাখলাম।—এ পর্যন্ত চন্দ্রাকে বলেই সুরেখাকে বললাম, আপনি যে শিল্পী এটা জানতাম না কিন্তু আপনার মধ্যে যে একটা শিল্পীসত্তা আছে তা ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম।

আমার কথা শেষ হতেই বিয়াসের কণ্ঠ বেজে উঠল, আমিই শুধু কোনো গুণের অধিকারী নই।

বললাম, কোনো গুণ নাই যার কপালে আগুন। বলেই ঠোঁট টিপে হাসতে থাকলাম।

বিয়াসও হাসতে হাসতে বলল, কথার জাহাজ।

এই জাহাজ এক সমুদ্রে ভাসাতে গিয়েই ত' বিপত্তি ঘটেছিল, প্রায় ডুবতে বসেছিল।

সমুদ্রের নাম নিশ্চয়ই সুরেখা কাপুর ?

অনুমান অভ্রান্ত।

আমার মত একজন সাধারণ মেয়ে আপনাকে পর্যুদস্ত করছে এটা খুবই অবিশ্বাস্য অন্তত সুরেখা কাপুর এটা কখনই বিশ্বাস করতে পারবে না। সুরেখার চোখে আগুন।

কেউ নামি না হোলে তার জ্ঞান আমার থেকে কম এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমি কখনই তা ভাবি না।

কথার পৃষ্ঠে কথা চলতে থাকল। আমরা খুব মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে ফিরতে থাকলাম। সেই সঙ্গে চোখের ক্যামেরায় রাজকন্যার মত সেজে ওঠা শ্রীনগরকে বন্দী করার প্রয়াস চালাতে থাকলাম।

ডাল লেকের উপর ভেসে থাকা হাউস-বোট এবং শিকারাগুলোতে আলো জ্বলে উঠল এক এক করে। রাস্তার এক পাশে কিছুটা প্রশস্ত রেলিং এবং রেলিংয়ের পরেই ডাল লেকের ঘন নীল জল, রাস্তার বিপরীত দিকে অসংখ্য ছোট-বড় হোটেল। এইসব হোটেলেও জ্বলে উঠল নিয়ন লাইট। লাইট জ্বলে উঠতেই তার ছটা এসে পড়ল রাস্তার উপর। কোনো একটা হাউস-বোট থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সুরেলা বেহালার সুর! গাছপালা আর পাহাড় এখন অস্পষ্ট, সেই অস্পষ্ট গাছপালার প্রতিবিম্ব ডাল-লেকের জলে তিরতির করে কাঁপছে। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য সুসজ্জিত দোকান এবং ডাল-লেকের ধার ঘেঁসে রাস্তার উপর কিছু অস্থায়ী দোকান যেন নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করার জন্য সেই সঙ্গে ক্রেতাদের কাছে টানার উদ্দেশ্যে গলার স্বরের তারতম্য ঘটিয়ে কত কী যে বলছে তা দু'চার কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়! এদের মধ্যে বেশির ভাগই আখরোট, কাজু, কিসমিস, মনক্কা, চেরি আর ফ্রুট-জুসের বিপণী। সুসজ্জিত বড় বড় দোকানগুলিতে কাশ্মীরের হস্তশিল্পের সম্ভার—শাল, গালিচা এবং আখরোট কাঠের খেলার সামগ্রীতে এক একটি দোকান পরিপূর্ণ। আমাদের অনেকেরই চোখ দোকানগুলোর উপর। মহিলাদের ঐকান্তিক ইচ্ছেতে আমাদের সকলকে ঢুকতে হোল এক এক করে বেশ কিছু দোকানে। এ-দোকান সে-দোকান করে আমরা যখন হোটেলে ফিরলাম তখন অন্ধকার বেশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করেছে চারপাশে। ফিরে এসে ভেবেছিলাম চন্দ্রার গান শুনব কিন্তু তা আর হোল না, ফিরে মাত্র দশ-পনের মিনিট বিশ্রাম নিয়ে মাসিমা আর মেসোমশাই আমার কাছে এসে হাজির; মেসোমশাই এসেই বললেন, তুমি কী খুব ক্লান্ত? যদি খুব বেশি ক্লান্ত না হও তাহলে আমাদের সঙ্গে একটু সময়ের জন্য যেতে পারবে? আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম, বিন্দুমাত্র ক্লান্তি আমার শরীরে বাসা বাঁধতে পারেনি—কোথায় যেতে হবে বলুন?—এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন মাসিমা, বললেন, লালচকে, যাব আর আসব, বয়েস হয়েছে ত' আমাদের তাই একা এত রাত্রে

যেতে ভরসা পাচ্ছি না, সকালে গেলে চলত যদি যার কাছে যাব তার দেখা ও সময়ে পেতাম।—কার কাছে যাবেন, যার জন্য এত রাত্রে ছুটতে হচ্ছে, সে কে? এরকম একটা প্রশ্ন মনে হোল কিন্তু তা নিয়ে প্রশ্ন না করে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমি প্রস্তুত, চলুন।

পরের দিন প্রত্যূষে সবিত্রী কিরণ আমাদের অঙ্গে মেখে যাবার পর বিকাশবাবু ডেকে তুললেন প্রত্যেককে। জানালেন মোঘল গার্ডেন্স দেখার ইচ্ছে থাকলে আমরা যেন সাতটার পূর্বেই হোটেলের দোরগোড়ায় যে বাসটা দাঁড়িয়ে আছে তাতে উঠে পড়ি। দেখার জন্যই কষ্ট স্বীকার করে আসা সুতরাং না দেখার ইচ্ছে নিঃসন্দেহে বলা যায় একজনেরও নেই, এটা প্রমাণিত হোল যখন দেখলাম সাতটার অনেক আগেই প্রত্যেকে বাসে উঠে এসেছে। ঠিক সাতটায় বাস ছাড়ল। কয়েক ঘণ্টা বাস ছোটার পর প্রথমে এসে যে উদ্যানটার সামনে বাস থামল তার নাম হারওয়ান্স। পাহাড়ের ঠিক নিচে এই বাগানে পা দিয়েই বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চোখের পাতা নামাতে পারিনি। বসরাই গোলাপ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি, শুনেছি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেই গোলাপ, হারওয়ান্সের বাগিচায় যে গোলাপ দেখলাম তার রংয়ের বৈচিত্র্য এবং আয়তন দেখে ভাবলাম এর থেকে বৃহৎ আয়তনের গোলাপ ফোটে এ পৃথিবীরই কোনো এক স্থানে—কিমু আশ্চর্যম্! শুধু গোলাপই যে আমার বিস্ময়ের কারণ তা নয় আরো অনেক কিছুই মনের আঙিনা ভরিয়ে তুলল। পাহাড়ি ঝরনা চঞ্চল কিশোরীর মত অস্থির ভাবে গড়িয়ে নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে তারপর প্রবাহিত হচ্ছে এই উদ্যানের বাঁধানো পথ দিয়ে। ইঁট-সিমেণ্টের সামনে অশান্ত ঝরনা কিছুটা সংযত, সংযত কিন্তু ক্ষুব্ধ, এটা তার চালচলনেই প্রকাশ পাচ্ছে, যেভাবে ফুলে ফুলে উঠছে এবং তার দেহ থেকে যেভাবে আসার নিক্ষিপ্ত হয়ে ঘাসের গালিচায় আছড়ে পড়ছিল তাতে এটা পরিষ্কার ইঁট সিমেণ্টের বাঁধনে সে বাঁধা থাকতে চায় না।

চন্দ্রা বাগানে ঢোকার পর হাততালি দিয়ে উঠেছিল এখন সমস্ত বাগানে নেচে বেড়াচ্ছে।

চন্দ্রার দৌলতে শীলভদ্র নামে যে মানুষটাকে আমি চিনেছি তিনি হঠাৎ আমার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আপনার একটা বই আমার ভাল লেগেছে যদিও গল্পের বইয়ের সাথে আমার সম্বন্ধ নেই বললেই চলে তবু যে কটা বই পড়েছি, এবং যে কটা বই ভাল লেগেছে তার মধ্যে আপনার বই একটা ছিল।

কোন বইটা বলুন ত'? আমি প্রশ্ন করতে করতে বাঁধানো পথ অতিক্রম করে ঘন ঘাসের গালিচায় পা ডোবালাম। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা না বলতে হোলে এতক্ষণে ঘাসের গালিচার উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়তাম।

পাতাল থেকে আলাপ—লেখাটা দারুন।

বললাম, ওটা আমার লেখা নয়, যতদূর জানি বইটার রচয়িতা বুদ্ধদেব বোস।

ভদ্রলোক কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠলেন, কিছু মনে করবেন না আসলে আমি মধ্য রাতের তারার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি।

আমি হেসে ফেললাম, বললাম, বুঝতে পারছি আপনি পণ্ডিত লোক গল্প-উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করতে চান না।

এবারও ভুল বলেছি?

আপনি বিদগ্ধ পণ্ডিত আমার মত লেখকের কোনো বইয়ের নাম মনে না থাকারই কথা।

এর অর্থ ঠিক বলিনি। ভদ্রলোক কিছুটা অপ্রস্তুত হয়েছেন যে তা তার কথাতেই প্রকাশ পাচ্ছিল।

এবার আমাকে জানাতেই হোল লেখাটা আমার নয় প্রতিভা বসুর। শুনে লজ্জিত হোলেন, হঠাৎ আমার কাছে দু'এক কথায় বিদায় নিয়ে যেভাবে গলার স্বর বাড়িয়ে সুজাতা সুজাতা বলে কোনো একজনের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলে গেলেন তাতে এ কথাই আমার মনে হোল। ভদ্রলোক চলে যেতেই আমি ঘাসের উপর বসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার সহযাত্রীরা বাগানের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তারা শরীরকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল এখানে-সেখানে। আমার মধ্যে শারীরিক ব্যস্ততা না থাকলেও দু'চোখ ব্যস্ত ছিল হঠাৎ চোখে পড়ল চন্দ্রা ছুটতে ছুটতে আমার দিকে আসছে। ওর পেছনে অন্যান্যরাও আসছে তবে ছুটে নয় ধীর পদক্ষেপে। চন্দ্রা এসেই বসে পড়ল ঝুপ করে। বসেই বলল, দেখলাম শীলভদ্র দু'দন্ড তোমার সাথে কথা বলেই পালালো কী ব্যাপার?

সে কথা পরে হবে তার আগে তোমার গান শুনব?

এখানে?

এটাই ত' গান গাইবার মত জায়গা, আমারই কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে গান শুধু চতুষ্পদের ভয়ে গলা ছাড়তে পারছি না।

আবার বাজে বকতে শুরু করলে! এখানে গান-টান হবে না।

তুমি ত' বন্ধু নও—বন্ধুর।

সে তুমি যাই বল এখন আমি গান গাইতে পারব না।

পারবে না ত'? ঠিক করে ভেবে বলবে।

আমার কথা শুনে প্রথমে একটু থমকায় ও তারপর বিস্মিত হয়ে বলে, কেন ভেবে বলতে বললে বল।

যতক্ষণ গান শুনতে না পাচ্ছি ততক্ষণ তোমার সঙ্গে একটা কথাও বলব না। এবার গাইবে কী গাইবে না তা নিয়ে ভাব!

কথাটা শুনে ও চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না, সামান্য কিছুক্ষণ নীরব থেকে গলা ছাড়ল। গান শুরু হওয়ার পর প্রায় প্রত্যেকে এসে জড়ো হোল সেখানে, চন্দ্রার গলা যে ভাল তা বিশ্বাস জানিয়েছিল কিন্তু তা যে অসাধারণ সেটা ভাবিনি। গান শেষ হওয়ার পর ওর মাকে বললাম, আপনি রত্নাগর্ভা, ওর যা গলা ইচ্ছে করলেই রেডিওতে গাইতে পারে।

চন্দ্রার মা আমার কথার উত্তরে বললেন, শুধু গলা থাকলেই বোধহয় সুযোগ জোটে না, তার জন্য—

আমি তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, আপনারা চেষ্টা ত' করুন আগে না হোলে আমাকে বলবেন, আমি বলছি ও রেডিওতে গাইবেই।

চন্দ্রার মা অতি মাত্রায় খুশি হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই বিকাশবাবু এসে জানালেন এখনি বেরিয়ে পড়তে না পারলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে কারণ আরো দুটো মোগল গার্ডেনে যাওয়ার আছে। যে কথা বলবেন বলে ঠিক করেছিলেন চন্দ্রার মা সে কথা বলা আর হোল না, বিকাশবাবুর কথা শুনে প্রত্যেকেই উঠে পড়ল ঘাসের গালিচার মায়া কাটিয়ে।

হারওয়াসের পর ওরকমই দুটো সুসজ্জিত উদ্যান চশমাশাহী ও নিশাতবাগ ঘুরে আমরা আসলাম একটা মসজিদে। পাহাড়ের ঠিক নিচে প্রশস্ত একটা হ্রদ, হ্রদের এক পাড়ে পাহাড় এবং অন্য পাড়টাতে এই মসজিদ। সিত অশ্মের এই মসজিদে আছে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ। পড়ন্ত বিকেলে মসজিদের শ্বেতপাথরের প্রশস্ত চত্বরে দাঁড়িয়ে হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে মসজিদের প্রতিবিম্বর দিকে দৃষ্টি রেখে, সুরেখাকে বললাম, আপনার ক্যানভাস, রং আর তুলি নিয়ে বেরানো উচিত ছিল, কোনো শিল্পী কী এই সৌন্দর্যকে বন্দী না করে থাকতে পারে!

সুরেখার দু'ঠোঁটের মাঝে হাসির একটা রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। যেন হিসেব করে হাসল, ও খুব হিসেবী, কখনোই বেহিসাবী হতে দেখিনি ওকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাও বলে না, হাসেও না। ওর ব্যক্তিত্ব গনগনে আঁচের মত। ওর এই ব্যক্তিত্বের কঠিন আবরণটার জন্য ও বড় বেশি একা। বিয়াসের কাছ থেকে জেনেছি এবং নিজেও দেখেছি। এমনকি দশজনের মধ্যে যদি থাকেও তবু ও ভীষণ একা। একাকিত্ব ওকে গ্রাস করে রাখে সর্বক্ষণ, আমি উপলব্ধি করেছি। বিয়াস আমাকে বলেছে, তুমি আছ বলে ও একাকিত্বের শিবির থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসতে পারছে। আমি আছি বলে ও ফেটে পড়তে পারছে না। যদিও আমি খুব বেশি নই, ওকে ধরে রাখার মত বড় নই তবু আমি আছি বলে ও সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়তে পারছে না। ঝুঁকে ওর ভেতরটা দেখো, আমি দেখবার চেষ্টা করেছি. কী দেখেছি শুনবে? দেখেছি শত-সহস্র আগ্নেয়গিরি থেকে ক্রমান্বয়ে গলিত লাভা নির্গত হয়ে যাচ্ছে, তার কী উত্তাপ কী বলব তোমাকে! ভয় হয়!—আমি ওর কথার সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। সুরেখাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি, নিজের মধ্যে এ মেয়ে থাকে কেন তা বুঝতে এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না আমার। মানুষ ত' কম দেখিনি এই জীবনে অনেক দেখেছি, হাটে-গঞ্জে, যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি, দু'চোখ দিয়ে মন দিয়ে তাদের দেখেছি, বুঝেছি। কিন্তু সুরেখাকে কতটা দেখেছি তা বুঝে উঠতে পারিনি এবং কতটা বুঝেছি তা-ও বুঝে উঠতে পারিনি, তবু বলি বিয়াসের কাছ থেকে যেটুকু জেনেছি এবং নিজে যতটুকু জেনেছি তা এই রকম— ও বেহিসাবী হতে পারে না, প্রতিটি কথা বলার আগে হিসেব করে, প্রতিটি পদক্ষেপের

আগে হিসেব করে, হিসেবের বাইরে কিছু পেতেও চায় না দিতেও চায় না। একটা সুখের ব্যাপার—ওর ব্যক্তিত্বের আঁচ যত গনগনে হোক না কেন তা অন্যাকে বিব্রত করে না।

আমি যে প্রশ্ন করেছিলাম তার উত্তর দিল সুরেখা, বলল, তুলি আর রং সঙ্গে থাকলে এ দৃশ্যের ছবি আমি ক্যানভাসে নামিয়ে আনতে পারতাম না।

কেন?

আমি ছবি আঁকি একথা শুনেছেন কিন্তু কী আঁকি সেকথা শোনেননি। যা আঁকি তা জীব-জন্তু, মানুষ কিম্বা প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্য নয়।

তবে কী! কিসের ছবি আঁকেন?—আমি সুরেখার কথা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারি না।

একটা কিছু, একটা অনাবিষ্কৃত কিছুর ছবি এঁকে মনের জঠর থেকে বার করে আনার প্রয়াস চালাই। একটা চিত্র মনের গভীরে ভেসে আছে, খুব অস্পষ্ট ভাবে সেই ছবিটা যেন আমি দেখতে পাই। অনেক কিছুর আবরণের আড়ালে ছবিটা আত্মগোপন করে আছে বলেই অস্পষ্ট, আমি বার বার ক্যানভাসের আবরণ সরিয়ে ছবিটাকে স্পষ্ট করে তুলতে চেষ্টা করে চলেছি। যা আঁকি তা অন্য লোকের কাছে ক্যাকোগ্রাফি।

বিয়াস এ ছবি দেখেই কী আপনাকে শিল্পী আখ্যা দিয়েছে?

হ্যাঁ।

যা অন্য লোকের কাছে ক্যাকোগ্রাফি তা শিল্প হয় কী করে? তা দেখে বিয়াস কী করে বলে আপনি শিল্পী?

হয়ত এই কারণে বলে যে যদি ইচ্ছে করি তাহলে যা দেখি তা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

ঐ ছবি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করলে উত্তর পাব?

না। যে ছবি আমার কাছেই অস্বচ্ছ তা নিয়ে প্রশ্ন করা উচিত নয় আপনার।

আমি এরপর কিছু বলতে পারলাম না শুধু দুচোখের তারা স্থির হয়ে থাকল সুরেখার মুখের উপর।

এবার বোধহয় আমাদের ফেরা উচিত।—কথাটা বলতে বলতে সুরেখা আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল।

আমি বললাম, আমি বোধহয় খুব বেশি বিব্রত করছি আপনাকে?

একটুও নয়, ফেরার কথা বললাম বলে কী এ কথা মনে হোল আপনার?

না সেজন্য নয়, আপনাকে এমন একটা ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করে বসলাম যা নিয়ে প্রশ্ন করা আমার উচিত ছিল না।

প্রশ্ন করে খুব বেশি অন্যায় করেছেন বলে আমার মনে হোচ্ছে না।

আমার ভয় হোচ্ছে যে প্রশ্ন আমি করে বসলাম তাতে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটটা ধরে আকর্ষণ করে বসেছিল কি না বুঝে উঠতে পারছি না।

শুনে সুরেখা কিছু বলল না শুধু আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালো সেরকম কিছু করে বসিনি।

আমার হাতে একটা সিগারেট অনেকক্ষণ ধরে জ্বলছিল, জ্বলতে জ্বলতে ছোট হয়ে আসছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে একটা হালকা উত্তাপ ক্রমশই গাঢ় হয়ে উঠছিল, এক সময় মনে পড়ল সিগারেটটাকে এক্ষুনি রিলিজ না করলে সিগারেটের আগুন আঙুল স্পর্শ করবে। আমি দুটো আঙুলের মধ্যে সামান্য ব্যবধান সৃষ্টি করে সিগারেটের শেষাংশটা মাটিতে ফেলে দিয়ে বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন এখন আমাদের ফেরা উচিত, ওরা হয়ত আমাদের খুঁজছে আর থাকা চলে না, চলুন।

যাবার পূর্বে একটা কথা বলে নি আপনি আমাকে কতটা কাছ থেকে দেখতে চাইছেন?

যতটা কাছ থেকে দেখলে আপনি বিব্রত বোধ করবেন না এবং যতটা কাছ থেকে দেখলে আপনাকে আমি বন্ধু বলতে পারব।

সুরেখা আমার কথার উত্তরে কিছু বলল না কিন্তু ওর দৃষ্টি আমার মুখের উপর কেটে বসতে থাকল। কিছু একটা যেন খুঁজতে থাকল আমার চোখে। আর তখনই আমি ওর ভেতরের দরজাটা খুলে দেখতে চাইলাম ওকে। দেখতে চাইলাম বিয়াসের উল্লেখিত সেই আগ্নেয়- গিরিগুলো চোখে পড়ে কি না। সে সব দেখলাম কি না বুঝে উঠতে পারলাম না, সেরকম কিছু যদি নাও থাকে তাহলেও বলা যেতে পারে একটা কিছু যেন আছে একটা কিছু যেন দেখতে পাব। দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা গভীর কূপের ভেতর মুখে বাড়িয়ে দিয়ে ভাবছি দৃষ্টি আরো একটু তীক্ষ্ণ করলেই দেখতে পাব কিছু। দৃষ্টিকে তীব্র করে তীক্ষ্ণ করে এবং সমস্ত চেতনাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে অনুসন্ধান চালালাম ওর মনের বিবরে।

গুরুজী আমার সম্বন্ধে কী বলেছে মনে আছে?—সুরেখা নিস্তব্ধতার প্রাচীর ভেঙে ফেলল।

আছে। আপনি কী ভাবছেন তার কথা আমি বিশ্বাস করিনি? সে কথা ভেবেই ত' প্রশ্নটা করলেন?

না।

তাহলে?

আপনি বিশ্বাস করেছেন কী করেননি সে কথা জানতে চাইনি, আমি বিশ্বাস করি নি।

শুনে আমি থমকালাম, আমার পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করতে চাইলাম ওর চোখে।

কথাটা শেষ করে ও আর দাঁড়ায়নি দ্রুত পা ফেলে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল।

আমি ওকে অনুসরণ করে চললাম সেই সঙ্গে ভাবতে থাকলাম ওর কথার আড়ালে আসল বক্তব্যটা আমি অনুমান করতে পারছি কিনা।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে যখন রাত্রির মধ্যে ডুবতে বসেছে তখন আমরা ফিরে আসলাম হোটেলে। সকাল থেকে বাসের আর ঘোরা-ঘুরির ধকলে শরীরের কলকব্জার যা

হাল তাতে মনের মধ্যে একটাই বাসনা কতক্ষণে শয্যার কোলে নিজেকে স'পে দে'য়া যায়। এ অবস্থা শুধু আমার নয় সকলেরই হাল অনুরূপ। এমনকি কথার আতস বাজি যে সর্বক্ষণ জেবলে রাখতে চায় তার মুখেও কথা নেই। চন্দ্রার চোখে-মুখেও ক্লান্তির ছাপ বেশ ঘন হয়ে পড়েছে।

আমাদের পরের দিনের গন্তব্যস্থলের নাম প'হেলগাঁও। কখন আমাদের বেরোতে হবে তা আগেই জানিয়ে দে'য়া হয়েছিল। সাতটার পূর্বে সবাই গিয়ে হাজির হলাম বাসে। নির্দিষ্ট সময়ে বাসের যান্ত্রিক শব্দ শুরু হোল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাস পিচের রাস্তার উপর গড়াতে আরম্ভ করল। দীর্ঘ পথ, সেই পথ অতিক্রম করে আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পে'ছিলাম তখন বেলা বারোটা পাঁচ-দশ। এত বেলাতেও ঠাণ্ডার প্রকোপ প্রচণ্ড, ছু'চের মত ঠাণ্ডা যেন বি'ধছে সমস্ত শরীরে। দুটো দিন ধরে অনেক দেখেছি। দেখেছি ঝাউয়ের অরণ্য, নদী আর পাহাড়ি ঝরনা কিন্তু পহেলগাঁও এর পাহাড়, ঝরনা আব পাহাড়ের গায়ে গাছগাছালির রূপ যেন অন্য রকম, চোখের পাতা নামাতেও ভয় হয়, প্রকৃতির এ সৌন্দর্যকে এক পলকের জন্য হারাতে নারাজ আমি। আমার অনুমান প্রত্যেকের দৃষ্টিই হারিয়ে আছে দৃশ্যাবলীর মধ্যে। পাহাড়ের গায়ে সবুজের ছড়াছড়ি, গাছগাছালির রং ঘন সবুজ, কোথাও কোথাও সবুজ এত ঘন যে তা দেখে অনেকটা নীলের মত মনে হয়। আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তার সামনে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অসম স্বচ্ছ সলিল যা নিঃসন্দেহে কোনো পাহাড় বিদীর্ণ করে নেমে আসছে এবং নিজের রূপের দম্ভে ফুলে ফুলে উঠছে। কখনো পাহাড়ের গা বেয়ে কখনো লাফিয়ে নামছে নিচে, সেই সঙ্গে হয়ত কোনো অচেনা ভাষায় সকলকে শোনাচ্ছে তার সৃষ্টির কথা অথবা কোনো কথকতা। সেই ঝরনার হীমশীতল জলের কুলকুল কলকল শব্দ অবিরাম বর্ষিত হচ্ছে আমাদের কর্ণকুহরে। এই নির্ঝরের উৎসস্থল কোথায় তা এখনো আমাদের অজ্ঞাত তবে খুব কাছেপিঠে কোথাও যে নয় তা অনুমান করতে পারছিলাম। দু'চোখের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে এই জলপ্রবাহ একই রূপে ধরা দিচ্ছে এতেই বুঝতে পারছিলাম এর শুরু কিম্বা শেষ কোনোটাই খুব কাছে নয়। এই জলপ্রবাহ বড় বেশি অস্থির। একটা অগভীর পথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে চলেছে। যদিও জলের গতি বন্য বরাহের মত তবু গভীরতা নেই বলে হে'টে জলকে অতিক্রম করে অপর প্রান্তে যাওয়া মোটেও দুরূহ কাজ নয়। আমি জলে নেমে পড়তেই সোনাবৌদিও নেমে পড়লেন। নেমে বললেন, আমি ভয় পাচ্ছিলাম আপনি নামলেন বলে সাহস সঞ্চয় করে নেমে পড়তে পারলাম। ওপাড়টা দারুন—না ?

যে পাড়েই আমরা থাকি না কেন সব সময়ই তার বিপরীত পাড়টা সুন্দর।

সোনাবৌদি আমার কথা শুনে হাসলেন। হেসে হয়ত কিছু বলবেন বলে ঘাড়টা ফেরাতে যাচ্ছিলেন, বুঝতে পেরে আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, উ'হু চোখ সরাবেন না সরালেই বিপদে পড়বেন। খুব সন্তর্পণে এগোতে হবে আমাদের কারণ পায়ের নিচের পাথরগুলো খুব বেশি বিশ্বস্ত নয়।

আমার নির্দেশ পালন করে সোনাবৌদি অপর প্রান্তে পেঁছিলেন সেই সঙ্গে আমিও। এরপর আরো অনেকে আসল। কেউ পায়ে হেঁটে আবার কেউ ঘোড়ায় চেপে। সোনাবৌদি পেঁছেই তার যে চেহারাটা প্রায় সব সময় দেখে আসছি সেটা হারিয়ে ফেললেন, একটা পরিবর্তন আসল তার চেহারায়। জল পেরিয়ে আসার সময়ে সম্ভবত তার খুশির আবরণটা খোয়া গিয়েছে। এ প্রান্তে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সুরে বললেন, এককবাবু একটা কথা আমার মনে এলো যদিও কথাটা বিশ্বাস হবে না কারো তবু আপনাকে বলি, আচ্ছা হঠাৎ যদি তার দেখা হয় এখানে, না হয় এই ট্যুরেরই কোনো এক সময়ের মধ্যে পেয়ে যেতে পারি না! আপনারা গল্প উপন্যাসে এরকম অনেক কিছুই ত' লেখেন যা লেখেন তা কী কখনো বাস্তব হতে পারে না? এরকম হওয়া কী একেবারেই অসম্ভব!

কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না অনেক সময় মানুষ মিথ্যে আসার মধ্যেই সুখের সন্ধান পেতে চায়। সোনাবৌদিও এভাবেই একটু সুখের বাতাস লাগাতে চাইলেন ব্যথার স্থানে, এই সুখটুকু কেড়ে নিতে পারলাম না। কথাটা শুনে তাই বলতেই হোল, অসম্ভব হবে কেন হয় বৈকি।

সোনাবৌদি শুনে আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে যে আশার বাণী শুনিয়েছিলাম তা আমি নিজে কতটা বিশ্বাস করে বলেছি সেটাই সম্ভবত জরিপ করে নিলেন, তারপর নিজের সেই সুখ-স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে বলে উঠলেন, দূর, তাই কী কখনো হয়! এত বড় ভারতবর্ষে সে কোথায় হারিয়ে আছে কে জানে।—বলেই একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

আমার গল্পের একটা চরিত্র যদি হোতেন সোনাবৌদি তাহলে তার এ অবস্থা বরদাস্ত করতে পারতাম কি না সেটা নিয়ে ভাবতে থাকলাম। এই মুহূর্তে তার ব্যথাটা ভীষণ ভাবে আমার মধ্যে সংক্রামিত হোল বলে ভাবলাম স্বামীর সঙ্গে তার নাটকীয় ভাবে দেখা করিয়ে ছাড়তাম। কিন্তু সত্যি সেরকম কিছু করতাম কী? বিয়োগান্ত যে করতাম না একথা এই মুহূর্তে বলে ফেলা কী সম্ভব! নিজের সিদ্ধান্তই এখন নিজের কাছে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল।

মানুষ শুধু সুখ চায়, সুখের তরীতে ভেসে সে অন্য পাড়ে যেতে চায়। আমি ভাবি শুধু সুখকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা যায়! যায় না, শুধু সুখ নিয়ে বাঁচাও সুখের নয়; সুখ আর দুঃখকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকার মধ্যেই সুখ। যতক্ষণ সুখ এবং দুঃখ আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ততক্ষণ আমরা বেঁচে আছি, যে মুহূর্তে ও দুটো থাকবে না সে মুহূর্তে আমাদের মহানির্বাণ, এক্সিটেন্স নেই। ধান ভাঙতে শিবের গাজন! বলছিলে বাপু সোনাবৌদির কথা তারমধ্যে সুখ-দুঃখের আর বাঁচা না বাঁচার কচকচানি কেন! সোনাবৌদির কী হোল বল। তার আবার কী হবে! গরু হারালে হ্যারিকেন নিয়ে রাত-বিরেতে ঝোপজঙ্গল তছনছ করে খুঁজতে পার আর সোনাবৌদির ব্যথাটা বুঝতে পার না!

আপনি এসেছেন বেড়াতে আর আমি আপনাকে ধরে-বেঁধে দুঃখের কথা শুনিয়ে

ছাড়ছি। ছি ছি দিলাম ত' আপনার ভাললাগার মুডটা নষ্ট করে!—সোনাবৌদি একটা পাথরের উপর বসে বললেন। এরপর দৃষ্টিকে অনেক দূরে পর্যন্ত প্রসারিত করে আবার মুখ খুললেন, বললেন, আপনি যান-না ওদের সঙ্গে আমি না হয় এখানে একটু বসি।

আমার সঙ্গে সঙ্গে তার কথার প্রতিবাদ করে বলা উচিত ছিল, ভাললাগার মুড আমার নষ্ট হয়নি, হয় না, এরকম ক্ষেত্রে যে কথা বলার ছিল তা বলিনি, বলার ছিল আমার তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ ছুটে বেড়ায় সর্বত্র, সেই সঙ্গে মানুষের মনের ছবিটাও ত' দেখতে চাই কিন্তু সে কথা সময়ে জানাতে পারিনি এখন তা বলা চলে না। সময়ে কথাটা বলতে পারিনি এবং সোনাবৌদি বলা সত্ত্বেও স্থান ত্যাগ করিনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন অহল্যার পাষাণ মূর্তিকে দেখতে থাকলাম। রামচন্দ্র কত যুগ পরে অহল্যাকে স্পর্শ করে রক্ত-মাংসের মানুষ করে তুলেছিল তা আমার জানা নেই যখনই আসুক তার স্পর্শ অহ্যালার পাষাণ মূর্তি পেয়েছিল কিন্তু এই পাষাণ মূর্তি যার স্পর্শে হয়ে উঠবে আবার প্রাণবন্ত সে কবে আসবে এ কথাই ভাবছিলাম। চন্দ্রাকে দেখলাম আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে। ও আমাদের নিকটবর্তী হয়ে দু'জনকেই উদ্দেশ্য করে বলল, কী হোল তোমরা এত চুপচাপ কেন?—বলেই উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সোনাবৌদির হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে বলল, মা-বাবা, মাসিমা, সুরেখাদি আর ইন্দিরা গান্ধী পাহাড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, চলুন বৌদি আমরাও উঠব।

সোনাবৌদি আঁৎকে উঠে বললেন, এই শরীর নিয়ে—খেপেছ?

কিছু হবে না প্লীজ চলুন-না বৌদি দারুন মজা হবে, এককদা বল-না বৌদিকে।

তুমি বরং তোমার এককদাকে নিয়ে যাও।

এককদা ত' যাবেই আপনিও চলুন।—বলেই জোর করে সোনাবৌদিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি ওদের অনুসরণ করে এগোতে থাকলাম। সত্যি বলতে কী আমার মনেও ছিল পাহাড়ে ওঠার বাসনা।

এখানে আসার পর বয়স যেন সকলেরই কমে গেছে। চাচিজী আর কৃষ্ণাদেবী অর্থাৎ চন্দ্রার ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে পাহাড়ে উঠছিলেন তাতে আমার ভয় হচ্ছিল। যাদের জন্য ভয় তাদের কোনো ভয় আছে বলে মনে হোল না। গলা চড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, আর উঠবেন না নামবার সময় কষ্ট হবে।

আমার কথা শুনে এবার বোধহয় ভয় পেলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে নামতে শুরু করলেন। অতি কষ্টে নিচে নেমে এসে চাচিজী বললেন, খুব বাঁচিয়েছ একক সময় মত না বললে কী যে হোত—ভাবতেই পারিনি নামার সময় এত কষ্ট, ভাগ্যিস আরো উপরে উঠে যাইনি।

আমি পাহাড়ে উঠব ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু খুব বেশি উপরে ওঠার ইচ্ছে ছিল না। ইতিপূর্বে পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়, নেমে আসা যে কতটা কঠিন তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি। বেশি উপরে উঠব না এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু সে সিদ্ধান্তে অনড় থাকা সম্ভব হোল না। সম্ভব হোল না চন্দ্রার জন্য, ও তরতর করে পাহাড়ে উঠতে

থাকল এবং আমার উপদেশ উপেক্ষা করে অনেকটা উপরে উঠে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম ওখান থেকে সহজে ও নেমে আসতে পারবে না, আমার সাহায্য ব্যতিরেকে ও নেমে আসতে পারবেই না হয়ত, এ কথা ভেবে আমাকে উপরে উঠতেই হোল। কিছুটা উঠে ওকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হোলাম। এরপর ও নিজে নেমে যেতে পারবে বলে যখন মনে হোল তখন ওকে নেমে যাবার নির্দেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি আবার কিছুটা উঠলাম বা উঠে আসতে হোল। শখে নয় কৃষ্ণাদেবীকে নামিয়ে আনতে। কৃষ্ণাদেবী উঠেছেন অনেকক্ষণ কিন্তু নেমে আসতে পারছিলেন না বলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একে তাকে ডাকছিলেন। এই কারণেই আমাকে আড়াআড়ি ভাবে কিছুটা উঠে আসতে হোল। অনেক কষ্টে তার নিকটবর্তী হোলাম যখন তখন রীতিমত হাঁপ ধরেছে, মনে হোল দু'দণ্ড বিশ্রাম না করে নামা সম্ভব নয় তাই গাছের একটা শাখা ধরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাদেবীকে বললাম, চাচিজীর সঙ্গেই ত' আপনি উঠলেন উনি নেমে আসতে পারলেন আর আপনি পারলেন না ? ওনার যা বপু তাতে অসুবিধা হওয়ার কথা তারই বেশি। —কৃষ্ণাদেবী একটা আবক্ষ গাছকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার কথা শুনে বললেন, চোদ্দ বছর বয়সের বাঙ্গালী ঘরের বিধবার শরীর গড়ে উঠেছে আতপ চাল আর ডাল-আলু সেদ্ধ খেয়ে এই শরীরের সঙ্গে পাঞ্জাবীদের তুলনা করতে চান ! এই বৃদ্ধ বয়সে ঝোঁকের বসে এতটা উঠে আসাই ভুল হয়েছে, নেমে হয়ত যেতে পারতাম কিন্তু ভরসা হয়নি।—আমি আর কথা বাড়ালাম না শ্বাস-প্রশ্বাস একটু স্বাভাবিক হতেই ভদ্র-মহিলাকে ধরে আস্তে আস্তে নিচে নামিয়ে আনলাম। তাকে নিচে নামিয়ে আনার পর দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত করতেই দেখতে পেলাম বেশ কিছুটা দূরে জলের ধার ঘেঁষে বিয়াস একা দাঁড়িয়ে আছে, খুব মনযোগ সহকারে কী দেখছিল ও তা বুঝে উঠতে পারলাম না। ওর আর আমার মধ্যে ব্যবধানটা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। ওর কাছে পেঁছিতেই বিয়াস বলল, এরকম একটা জায়গায় সচ্ছন্দে জীবনটা কাটিয়ে দে'য়া যায়, দারুন জায়গা—না ?

আমি বললাম, নিঃসন্দেহে দারুন তবে জীবনটা সচ্ছন্দে এখানে কাটিয়ে দে'য়া সম্ভব নয়।

হাওয়ায় বিয়াসের আঁচল ফরফর করে উড়ছিল, চুলে ক্লিপের কিম্বা ফিতেটিতের শাসন ছিল না বলে তা-ও একই ভাবে উড়ছিল। ওর কোনো দিকেই লক্ষ্য নেই, দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। আমার সাথে কথা বলছিল ঘাড় না ঘুরিয়েই, শুধু আমি যখন এসেছিলাম তখন একবার মাত্র ঘাড় ঘুরিয়ে এক মুহূর্তের জন্য দেখে নিয়েছিল। এবারও আমার কথার পৃষ্ঠে ওর কথা আসল ঐ ভাবেই। বলল, এ জায়গায় একজন সঙ্গী পেলে আমি নিঃসন্দেহে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব।

সঙ্গী বলতে কী রকম সঙ্গীর কথা বলছ ?

যাকে ভালোবাসা যায়, যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং যে আমাকে ভরিয়ে দিতে পারবে।

এমন মানুষ আমি হতে পারি না ?

না।

কেন ?

তোমাকে ভালবাসা যায় এবং বিশ্বাসও করা যায় কিন্তু তুমি আমাকে ভরিয়ে দিতে পারবে না একক।

এ ধারণা হোল কী করে তোমার ?

আমি একজন মানুষের কথা বলছি—রক্ত-মাংসের মানুষ, এ হিউম্যান বিং।

আমি তা নই।

না।

তবে আমি কী ?

সেটা আমারও প্রশ্ন।

আমি দু'হাত দিয়ে ওর বাহু-সন্ধিদ্বয় ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে ওর চোখের উপর আমার চোখ রাখলাম। এরপর খুব আস্তে আস্তে ওর নাম ধরে ডাকলাম। মানুষ ঘুমিয়ে থাকলে যে ভাবে ঘুম ভাঙানো হয় সেভাবে ডেকে যেন ওর মধ্যে ওকে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম।

আমার ডাক শুনে ও বলল, বল।

বললাম, তোমার আমার সম্বন্ধে এ ধারণা জন্মাল কেন এটা আমার কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার।

তুমি কী ভাবছ জানি না যদি ভেবে থাক দেহজাত কোনো কিছু, কোনো প্রশ্ন জড়িয়ে আছে আমার কথার মধ্যে তাহলে বলব আমরা পরস্পরের কাছে এখনো অপরিচিত।

তোমাকে এত নিচে নামাব এটা ভাবলে কী করে !

ভাবিনি, ভাবার কোনো কারণও নেই কারণ তুমি তা ভাবতেই পার না, এটা আমি বুঝেছি তাসত্ত্বেও ভয় পেলাম এই কথা ভেবে যে, যদি তুমি আমাকে ঠিক মত না চিনে থাক তাহলে এমন কিছু ভেবে বসতে পার যা ঠিক নয়। তোমাকে জানার পর আমার যে কথা তুমি শুনেছ তাতে সেরকম কিছু মনে হওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে বলেই বলে ফেললাম কথাটা।

এরকম ভাবলে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারতাম না। সে যাক এবার একটা কথার জবাব দাও ত' কে তোমাকে ভরিয়ে দিতে পারবে ?

বিন্নাস নীরবতা বজায় রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, খুব বেশিক্ষণ নয় এক-আধ মিনিট কিম্বা তারও কম সময়, এরপর বলল, ঠিক এই প্রশ্নটা আমি নিজেকেও করি বার বার।

এর কারণটা আমি বলব ?

বল।

আসলে তোমার অভাবটা কী তাই এখনো বুঝে উঠতে পারনি।

সম্ভবত তোমার কথাই ঠিক।

আচ্ছা বিয়াস একটা সত্যি কথা বলবে? আমি হিউম্যান বিং নই এটা শুধু আজ নয় ইতিপূর্বে তা ব্যক্ত করেছ অথচ আমি কী তা বলতে পারছ না তাহলে সুরেখার কথাটাই ঠিক প্রমাণিত হোচ্ছে—তাই না?

কোন কথাটা?

আমরা পরস্পরকে চিনেছি বলে ভাবছি আসলে কেউ কাউকেই চিনতে পারিনি।

এখনি এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে পারব না। হয়ত পেরেছি হয়ত বা পারিনি। যদি পেরে থাকি তাহলে তোমার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তা শুনতে চাও?

অবশ্যই।

তুমি বড্ড বেশি ছড়িয়ে থাক, আমার মনে হয় কোনো কিছুতেই তোমাকে ধরে রাখা যায় না। পরিচয়ের পর থেকে দেখে আসছি দু'জন রূপসী তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারেনি, এতে তুমি প্রথমেই রক্ত-মাংসের মানুষ নও বলে প্রমাণ করে বসে আছ। এরপর নিঃসন্তান বৌদির আর অনীতার কথা বলে আরো একবার প্রমাণ করেছ এবং অবশেষে নীতার কথা সেও তোমাকে ছুঁতে পারেনি।

বিয়াস আজ কী মনে হচ্ছে জান! মনে হচ্ছে তোমাকে আমি একটুও চিনিনি।

কেন মনে হচ্ছে বলবে?

তুমি ভীষণ কঠিন হয়ে উঠছ।

তোমার সম্বন্ধে মন্তব্য করলাম বলে!

না, আমার আসার পর থেকে তোমার মুখ থেকে যে সব কথা নির্গত হয়েছে তাতে আমার সেরকমই মনে হচ্ছে।

আমার এলোমেলো ভাবনা-চিন্তার কথা বললাম, সে কথা শুনে এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছিও না।

চল ফিরি।

যাবে? যাবার আগে একটা কথার সদুত্তর দেবে?

দেব। তোমার প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর তুমি আমার কাছ থেকে পাবে।

আমাদের সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের কিন্তু এরকম যদি না হোত, যদি আমি তোমাকে ভালবাসতাম?

এখনো বাস।

আমৃত্যু পর্যন্ত দু'জন এক সঙ্গে চলব যদি এরকম কোনো ইচ্ছে আমার মনে থাকত?

দু'জন এক সঙ্গে আমৃত্যু পর্যন্ত চলা যায় না যে কোনো একজনকে আগে চলে যেতে হয়ই।

এভাবে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে? এত ভয় কিসের! আমি শুধু জানতে চেয়েছি, তুমি ভাল করে জান কী ভাবে তোমাকে পেতে চাই আমি।

কেন জানতে চাইছিলে? কী হবে জেনে?

তোমাকে আরো বেশি ভাল করে চিনে নিতে চাইছিলাম।

তাহলে সত্যি চেনোনি ? সুরেখার কথাই ঠিক তাহলে ?

কী জানি এক এক সময়ে মনে হয় চিনেছি আবার কখনো মনে হয় বোধহয় তুমি এখনো আমার কাছে অচেনাই রয়ে গেছ।

আর নয় চল এবার ফিরি।

আমার কথার সমাপ্তির পর বিয়াস কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আচ্ছা একক তোমার মনস্তত্ত্বটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না কেন বলতে পার ?—প্রশ্নটা করে আবার পূর্বের গতিতে পথের দূরত্ব কমিয়ে আনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল।

সত্যি কথা বলতে কী কারো মনস্তত্ত্ব সঠিক ভাবা জানা অত সহজ নয়, আমিই কী পেরেছি ওর মনস্তত্ত্বটা সঠিক ভাবে জানতে !—এটা জানালাম বিয়াসকে।

আমার কথার পর ও বলল, অনেক প্রশ্নই ত' তোমাকে করলাম কিন্তু একটারও সঠিক জবাব দিলে না, অন্তত একটা সঠিক জবাব দেবে ?

বল।

তুমি কী চাও ?

সঠিক জবাব যদি তোমার একান্তই কাম্য হয়ে থাকে তাহোলে আরো একটু পরিষ্কার করে জানাতে হবে তুমি কী জানতে চাইছ।

তুমি নারীর রূপ-যৌবনের পূজারিণী নও এ কথাটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য ? নারীর ভালবাসা কী কখনই তোমার মনের আঙিনায় এসে আশ্রয় নিতে পারবে না ?

আমি প্রকৃতির পূজারী, তুমি জান নিশ্চয়ই নারীর এক নামও প্রকৃতি, তাছাড়া মানুষের মনের চেহারাটা আমি সব সময়ই দেখে নিতে চাই মনের দর্পণে। মানুষ শুধু পুরুষমানুষকে নিয়ে নয়।

আমার কী মনে হয় জান ?

কী ?

তৃষ্ণার্ত মানুষ যে ভাবে অন্যের হাত থেকে জলের পাত্র নে'য় তুমি ঠিক সে ভাবে জলের পাত্রটা ছিনিয়ে নিয়ে তৃষ্ণা দূর কর কিন্তু কার হাত থেকে পাত্রটা নিলে তার দিকে ফিরেও তাকাও না।

কথাটা সত্যি নয়।

নয় ?

না। শুধু ভয় বাঁধা না পড়ে যাই কোথাও। তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ নিয়ে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছোটার ব্রতযতদিন শেষ না হচ্ছে ততদিন কোনো গৃহ-কোণেই নিজের ঠাঁই করে নিতে পারব না বিয়াস, এই একটা জায়গায় আমি বড় নির্মম। একটা তৃষ্ণার্ত মানুষের হাত থেকে জলের আধারটা ছিনিয়ে নে'য়ার মত নির্মম আমি। এমন কী মানুষটা কতটা তৃষ্ণার্ত সে কথা পর্যন্ত ভাবি না !

তাহোলে আমি ইতিপূর্বে তোমার সম্বন্ধে যা যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক তাই ত' ?

তুমি ত' অনেক কথাই বলেছ কোন কথাটা ধরব ?

একক গুপ্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর।

এ অভিযোগ ভুল এটা বলার মত প্রমাণ খুঁজে বার করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না সুতরাং অভিযোগটা মাথা পেতে নে'য়া ছাড়া উপায় নেই, এরপর বল।

বিয়াস আমার কথা শুনে হেসে ফেলল, বলল, তুমি অসম্ভব চতুর। আমি আজ পর্যন্ত যত মানুষ দেখেছি তারমধ্যে তোমার মত একজনও খুঁজে পাইনি।

তোমার অভিযোগ মাথা পেতে নিলাম বলে কী এ কথা মনে হচ্ছে ?

যে মানুষ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে নির্বিকার থাকতে পারে হয় সে নির্বোধ না হয় খুবই বুদ্ধিমান।

চতুর না বুদ্ধিমান ? দুটো কথার মানে এক নয়। আচ্ছা বুদ্ধিমান না হয়ে নির্বোধও ত' হতে পারি ?

তোমাকে নির্বোধ মনে করব আমি !

দোষটা কোথায় ?

একক গুপ্তকে যে নির্বোধ বলবে তাকে অন্য লোকেরা কী আখ্যা দেবে তা আমি খুব ভাল করেই জানি। সে যাক আমি যদি তোমাকে ভুল না চিনে থাকি তাহোলে বলতে পারি তোমার মনে আমার স্থায়ীত্বও খুব বেশি দৃঢ় নয়। হয়ত তোমার পথ চলার সঙ্গী হয় অনেকেই এবং অনেকের সঙ্গেই হয়ত বন্ধুত্ব হয় কিন্তু পথ চলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা একক গুপ্তর মন থেকে ঝরে পড়ে, আমার অনুমান তাদেরই একজন বিয়াস কাপুর। বল এ ধারণা ভুল না সত্যি ?

মনে হয় ভুল !

মনে হয় ! এর অর্থ পথ শেষ হোলে আমার একমাত্র বন্ধু বেল যাকে ভাবছি তাকেও হারাতে পারি ! এই যদি হয় তাহলে সত্যি তুমি নির্মম, সত্যি তুমি তৃষ্ণার্তর হাত থেকে জলের আধার নিঃসঙ্কোচে ছিনিয়ে নিতে পার। তুমি যখন কথাটা বলেছিলে তখন ধরে নিয়েছিলাম ওটা কথার কথা কিন্তু এখন বলছি আই বিলিভ ইট্ দ্যাট ইট ইস্ এ্যাবসোলিউটলি কেডিবল।

একথা বলা তোমার ঠিক হচ্ছে না বিয়াস।

কেন ! তুমি ত' বলেছ মনে হয় ভুল এরকম ভাবে কথার জবাব দিলে এটা আমার মনে হতেই পারে যে···

আমি স্বীকার করছি 'মনে হয়' এ কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমার ? এরপর আশা করি তোমার মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই ?

আমরা শরীর ছেড়ে দিয়ে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলাম। বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে আসার পর সুরজিৎ আর চন্দ্রাকে দেখতে পেলাম। ওরা দু'জন অনেকটা দূরে দিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিল যেদিকে, সেদিকে আমাদের সহযাত্রীদের একজনকেও দেখতে পেলাম না। দেখতে পেয়েই আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম ওদের বিয়াস বুঝতে পেরেই বাধা দিয়ে বলল, ওদের ডেকো না।

আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম কেন বল ত ?

গতকাল থেকে একটা ব্যাপার আমার চোখে পড়ছে, ওরা পরস্পরের কাছে আসবার চেষ্টা করছে। চন্দ্রাকে বোধহয় তুমি একটু বেশিই ছেলেমানুষ ভেবে বসেছ।

তুমি যদি ঠিক বুঝে থাক তাহোলে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ঠিক হবে না কিছু একটা করতে হবে। ওদের যা বয়েস তাতে ভুল করে বসাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হবে বলে মনে হয় না।

আমিও সে কথা ভাবছি কিন্তু আমার মনে হয় এক্ষুনি কিছু করার প্রয়োজন নেই, আরো একটু অপেক্ষা করা যাক দেখি আমার অনুমান অভ্রান্ত কি না।

তুমি ঠিকই বলেছ বিয়াস চন্দ্রাকে আমি সত্যিই খুব বেশি ছেলেমানুষ ভেবে বসেছিলাম।

বিয়াস আমার কথার পর আর কিছু বলল না। ওর চোখ এখন ওদের উপর বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। আমিও ওদের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে গজেন্দ্রগমনে অসমতল সড়কের উপর পদচিহ্ন রেখে এগোতে থাকলাম, দেখলাম ওরা ক্রমশঃই ছোট হয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাওয়ার জন্যে যেভাবে সবকিছু ছোট হয়ে যায় সেভাবে ছোট হচ্ছিল না, পায়ের দিক থেকে শুরু হয়ে উপরের অংশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। বুঝলাম কোনো ঢালু জায়গায় ওরা নেমে যাচ্ছে, ঐভাবে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা সৃষ্টির সীমানার বাইরে চলে যেতেই আমি বিয়াসের দিকে চোখ ফেরালাম। আমার চোখে প্রশ্ন ছিল ও তা ধরতে পেরে বলল, এখানে একটু বসি তারপর ওদের কাছে যাব, ভুল করতে দেয়া যায় না ওদের। বিয়াস কথা শেষ করে চারপাশে দৃষ্টি চালিয়ে বসার উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকল, একটা পাথরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলল চল ওখানটায় বসি কিছুক্ষণ।—এ পর্যন্ত বলে আমার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে পাথরটার দিকে হাঁটতে থাকল। আমি ওকে অনুসরণ করে চললাম। পাথরটার কাছাকাছি পেঁছে বললাম, এভাবে—বোধহয় ঠিক হচ্ছে না নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে।

বিয়াস আমার কথার জবাব দিল অনেক পরে। প্রথমে ও নির্দিষ্ট জায়গাটায় বসল তারপর চোখের মণি সরিয়ে আমাকে বসার জন্য ইঙ্গিত করল। নির্দেশ পালিত হওয়ার পর বলল, তোমার কথা ঠিক কিন্তু ওরা পা কাদায় ফেলতে পারে জেনে চুপ করে বসে থাকা কী ঠিক হবে?

পা যে কাদায় পড়বেই একথা জোর দিয়ে বলা চলে না তবে ওদের বয়সের কথা ভেবে বলা যায় সম্ভাবনা বেশি তবু এভাবে ওদের অপেক্ষায় থাকা উচিত হচ্ছে না আমাদের।

ওদের অপেক্ষায় নয় আমার অনুমান ঠিক কি না এটা যাচাই করে নিতে চাইছি, অনুমান ঠিক হোলে চন্দ্রাকে আমি বোঝাব। সেই সঙ্গে একথা বললেও ভুল বলা হবে না—ওকে আমি বুঝব। অনেক সময় ঐ বয়সের মেয়ের মধ্যেও এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় যাতে তার উপর ভরসা করা চলে।

নিজের ঐ বয়সের কথা ভেবে বলছ বোধহয়? বিয়াস কাপড়ের কটা আছে বলে

তোমার মনে হয়! আমার অভিজ্ঞ চোখ যদি ভুল না করে থাকে তাহোলে বলতে পারি চন্দ্রা তোমার মত হয়ে জন্মায়নি, হয়ে ওঠার সম্ভাবনাও নেই।

তোমার কী ধারণা ঐ বয়সে আমি অসাধারণ ছিলাম।

ছিলে এবং এখনও আছ।

কমপ্লিমেণ্টের জন্য ধন্যবাদ এবার জানাতে পারি তোমার এরকম ধারণা হোল কেন?

কেনর উত্তর দেবার মত প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না তুমি নিজেই তা ভাল করে জান।

বিয়াস আর আমার মধ্যে কথা বিনিময় হতে থাকল। কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বিয়াস উঠে পড়ল, ও উঠে পড়বার পর আমিও উঠে দাঁড়ালাম। আমি দাঁড়াতেই ও বলল, চল দেখি ওরা কী করছে।

আমার খুব খারাপ লাগছে বিয়াস।

আমারও তবু চল।

আমরা কিছুটা দ্রুত পদক্ষেপে ওদের দিকে অগ্রসর হোলাম, কিছুটা হেঁটে আসার পরই ওদের দেখতে পেলাম। একটা বড় পাথরের আড়ালে ওরা ঘন হয়ে বসে আছে। চন্দ্রার মুখ নামানো, ভাঁজ হয়ে থাকা হাঁটুর উপর একটা হাত ঝুলিয়ে রেখে অন্য হাতটা দিয়ে ছোট ছোট পাথর নিয়ে খেলছিল, সেই সঙ্গে ওর মুখও চলছিল, ওর আর সুরজিতের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। দূর থেকে ওদের বক্তব্যের একবিন্দুও আমাদের কানে পেঁছিল না। বিয়াস বলল, চল একক এবার ফিরি। দেখলে ত' আমার অনুমান অভ্রান্ত!

আমি বিয়াসের কথার উত্তর না দিয়ে চরণদ্বয়কে ব্যস্ত করে তুললাম। হাঁটিতে হাঁটিতে পূর্বের মত আমাদের কথোপকথন চলছিল। অনেকটা পথ হেঁটে সহযাত্রীদের প্রায় কাছাকাছি পেঁছে আমি বললাম, চন্দ্রাকে কিছু কী তুমি বলবে?

বলতে হবেই তবে কী বলব তা ভেবে দেখতে হবে, আমি আমার মা'র সঙ্গে থাকব কিছুক্ষণ, তুমি আসবে?

না। সত্যান্বেষীর নতুন কাজ জুটেছে—সত্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকব কিছুক্ষণ।

খুলে বল।

একজন মানুষের গভীরে ডুব দেব।

বিয়াসের চোখে কৌতূহলের দীপ জ্বলে উঠল, বলল, মানুষটা কে? আবার কোন রহস্য ভেদ করার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করবে সত্যান্বেষী?

তোমাকে বলব তবে এখন নাই বা জানতে চাইলে প্রিয় বান্ধবী।

বিয়াস একটা হাসি উপহার দিয়ে চলে গেল। ও চলে যেতেই আমি বিকাশবাবুকে খুঁজে বার করলাম। উনি বাসের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে সিগারেট ফুঁকছিলেন আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, আসুন, আসুন।—আমি কাছে যেতেই পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে উনিই আবার বললেন, আগে একটা ধরান তারপর কথা হবে।

আমি কোনো কিছু না ভেবেই একটা সিগারেট প্যাকেট থেকে বার করে নিয়েছিলাম পরে মনে হোল ধূমপান করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, মনে হতেই সিগারেটটা পূর্বের জায়গায় রেখে দিয়ে বললাম, কিছু মনে করবেন না অভ্যাসবশত নিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু ধোঁয়া গেলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আপনি ব্যস্ত নন বোধ হয় এখন ?

একটুও না, কিছু বলবেন বলে মনে হচ্ছে ?

বিশেষ কিছু বলব বলে আসিনি কাজ না থাকলে গল্প করব এই আর কী।

তাহলে চলুন বাসের ভেতরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে কথা বলি। বলেই বিকাশবাবু হাতের প্রায় শেষ হয়ে আসা জ্বলন্ত সিগারেটটা আঙুলের টোকা মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বাসের দরজার দিকে ঘুরলেন।

বাসে উঠে আসার পর আমি বললাম, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব অবশ্য সে প্রশ্ন যদি আপনার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো কিছু ধরে টানাটানি শুরু করে এবং তারজন্য যদি বিব্রত বোধ করেন তাহোলে বলব আমার সে প্রশ্নের উত্তর না দিলেও চলবে।

ঠিক আছে আগে ত' করুন তারপর ভেবে দেখা যাবে এতকিছু।

সেদিন বলেছিলেন কাব্যরসিক নন আপনি কিন্তু কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি।

কেন বলুন ত' ?

মুখে আপনি যাই বলুন না কেন বাস্তবে আমি তার বিপরীতধর্মী কথারই প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছি।

আমার কথা শেষ হওয়ার পর আশা করেছিলাম বিকাশবাবু কিছু বলবেন কিন্তু সে আশা পূর্ণ হোল না। শুনে কিছু বললেন না। আরো একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে আটকালেন। এরপর একটু সময় নিয়ে ফস্ করে একটা দেশালাইয়ের কাঠি জ্বাললেন। খুব অলসভাবে অগ্নিসংযোগ করলেন সিগারেটটাতে। করে আস্তে আস্তে ধোঁয়ায় মুখটাকে ভর্তি করলেন! আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম সেই সঙ্গে বুঝতে চাইলাম তার মানসিক প্রতিক্রিয়া। তার ভাবান্তর আমার চোখে পড়ল, বললাম, একথা বলা বোধহয় আমার উচিত হয়নি।

আপনি যে কথা বলেছেন তা মিথ্যে নয় সত্যি কথাটা আপনাকে বলিনি। আমাকে নিংড়ালে একফোঁটা রস ঝরবে না এতটা আপনাকে বলিনি কিন্তু অন্যদের কাছে বলি, একটা কিছু গোপন করার উদ্দেশ্যে। আমার কথার আড়ালে একটা কিছু যে আছে তা আপনি বুঝতে পেরেছেন, বুঝে ফেলবেন এ ভয় আমার ছিলই তবে এত তাড়াতাড়ি ধরতে পারবেন বলে ভাবিনি।—বিকাশবাবু এ পর্যন্ত বলে কথার ঘরের দরজায় অর্গল তুলে দিয়ে সিগারেট টানতে থাকলেন।

আমি বললাম, ভয়ঙ্কর একটা ভুল করে ফেলেছিলেন সেদিন কেন বলতে গেলেন কাব্যটাব্য আপনার আসে না! ঐ কথা বলার পূর্বে একটা কাজ আপনার করা উচিত ছিল।

কী কাজ ?—প্রশ্নটা করার সময় তার চোখে বিস্ময় ঝাঁকিয়ে বসল।

বললাম, মনান্তরীক্ষের বুকে কবে অরুন্ধতী দেখা দিয়েছিল বিকাশবাবু ?

আমার কথা শুনে চমকে উঠে বললেন. একথা আপনি জানলেন কী করে ?

আপনি জানিয়েছেন।

আমি ! আপনাকে জানিয়েছি !

হ্যাঁ।

আপনাকে আমি সেকথা বলেছি বলে মনে পড়ছে না।

বলেছেন এ কথা ত' আমি বলিনি, বলেছি জানিয়েছেন।

আমার কথা শুনে তার বেশ কিছুক্ষণ লাগল বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে, প্রায় দেড়-দু' মিনিট। এরপর বললেন, প্লীজ খুলে বলুন আপনার কথার বিন্দুবিসর্গ আমার মাথায় আসছে না।

দিন কয়েক আগে আপনার কাছ থেকে কখন কোথায় পেঁছিব জানতে চেয়েছিলাম, মনে পড়ছে ?

পড়ছে, আমি আমার লেটারহেডে লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু তারমধ্যে অরুন্ধতী নাম কোথাও আছে বলে মনে পড়ছে না।

সম্ভবত লেটারহেডের যে কাগজটা আমাকে দিয়েছিলেন তার উপরে যে কাগজটা ছিল তাতে ঐ নাম আপনি একাধিকবার লিখেছিলেন, কারণ আমার কাগজটায় তার ছাপ ছিল। অরুন্ধতী নামে কেউ একজন আপনার জীবনে এসেছিল অথবা এখনো সে আছে এটা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

নেই। এখন মনে হচ্ছে আপনি জানায় ভালই হোল. আমার কথা কাউকে বলতে পারিনি বলে একটা কষ্ট সবসময় বুকের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে। মনে হয় ইতি-পূর্বে দু'একজনকে জানাতে পারলে এতটা কষ্ট থাকত না। কথায় বলে সুখ ভাগ করে নে'য়া উচিত আর দুঃখ একা ভোগ করতে হয় কিন্তু দুঃখ একা ভোগ করা সহজ ব্যাপার নয়। অরুন্ধতী আমার মনে একদিন ঝড় তুলেছিল, সে ঝড় মনের ভেতরটা তছনছ করে দিয়েছে। আজ আমি কতটা নিঃস্ব তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।

আমি তার মুখের দিকে দৃষ্টি রেখে ভাবছিলাম এই মানুষটাকে আমি ঠিকই বুঝেছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম দেয়ার ইস সামথিং বিহাইন্ড দ্যা কারটেন—মে বি এ ট্রেজিক স্টোরি। অনুমান আমি অনেক কিছু করতে পারি, কখনো চোখ-মুখ দেখে কখনো দু' একটা অসতর্ক মুহূর্তের বচন শুনে। অনুমানের উপর নির্ভর করে কথার জাল বিস্তার করি। কথার কারিকুরির সাহায্যে আসল সত্যটা আবিষ্কার করার প্রয়াস চালাই। কথায় আমি রাজা-উজির মারি, খোঁড়াকে দিয়ে গিরি লঙ্ঘন করাই আরো কত কী যে করি তার ঠিক নেই, সুতরাং মানুষের মণিকোঠার দরজা-জানালা টান মেরে খুলতে আমার খুব বেশি সময় লাগে না। কথার উৎসের মুখ খুললে ফল্গুধারার মত তা প্রবাহিত হয়। বাতো বাতো পর কিতনী রাত বীত গ্যায়ি কিতনী মনকি দিয়ারে টুট পড়ি—মেরি তমন্যা পুরি হো গ্যায়ি, এমনটা হয়

অনেক সময়ই যখন হয় না অর্থাৎ যখন 'তমন্যা পুরি' হয় না তখন মনের সাগরে পানসী ভাসিয়ে রেখে অনুসন্ধানের কর্মটি চলতেই থাকে। সাইবধানে পিদিম জ্বালি উর মনে তারপরে খুঁজ্যা দেখি পরশ-পাথর। আমার পরশ-পাথর মানুষের মনের সত্য। এ সত্য আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই আমার অভিজ্ঞতার কুম্ভ একটু একটু করে পূর্ণ হয়ে উঠে। মধুকরী যেমন ফুলের হৃদপিণ্ড থেকে সুধা অবচয় করে ঠিক সেভাবে এ সত্য সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে মানুষের মনের অলিন্দ থেকে। বিকাশ-বাবুর মনের কক্ষটা বেহুলা-লক্ষ্মীদরের বাসর ঘরের মত সুরক্ষিত ছিল, সুরক্ষিত ছিল ঠিকই কিন্তু সেই বাসর ঘরের মতই যেন তার প্রাকারেও ছিল ছিদ্র, সেই ছিদ্র অন্বেষণ করেছি এ ক'দিন। অবশেষে পেয়েছি, পেয়েই মনে মনে চিৎকার করে উঠেছি, ইউরেকা—ইউরেকা!

বিকাশবাবু খুব আস্তে আস্তে বারকয়েক চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকালেন এবং ঐ কাজেই ব্যস্ত রেখে বললেন, জানেন অরুন্ধতীকে আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেরই দোষে।

হারিয়ে ফেলেছিলেন? কী ভাবে? প্রশ্নটা করা আমার উচিত হোল কি না বুঝে উঠতে পারছি না।

অরুন্ধতী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমরা পরস্পরকে ভালবাসতাম, আমি এখনো বাসি। প্রথম-প্রথম আমাদের দুজনকেই সুখ বেশ ভাল ভাবেই জড়িয়ে ছিল। এই সুখই একদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। কেন জানেন?

কেন?—প্রশ্নটা তার শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঠোঁট থেকে খসে পড়ল।

কারণটা শুনলে কারো বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে না হয়ত কিন্তু ঐ একটা মাত্র কারণেই আমরা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। যে ভাবে আঁধার নামতে থাকে সে ভাবে অ-সুখ নেমে আসছিল আমাদের মধ্যে। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম।

কারণটা তখনো ব্যক্ত করেননি বলে ব্যাপারটা তখনো আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছিল না, কখন আসল ঘটনাটা ব্যক্ত করবেন তারজন্য অপেক্ষা করে আছি। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না একটু পরেই প্রকৃত কারণটা মেলে ধরলেন। বললেন, কাব্যচর্চা করতে গিয়ে কী হাল হয়েছে আমার দেখুন অরুন্ধতীকে খুইয়ে বসে আছি।

কাব্যচর্চা করতে গিয়ে!

বিশ্বাসযোগ্য না হোলেও কথাটার মধ্যে অসত্য একবিন্দুও নেই। অরুন্ধতী শুধু আমাকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। সাহিত্যচর্চা বিসর্জন দিয়ে শুধু ওকে নিয়ে বাঁচার কথা আমি ভাবতে পারিনি। অথচ দেখুন যে সাহিত্যচর্চার জন্য ওকে হারালাম সেই কাব্যরচনা আর আমার দ্বারা হোল না। ও চলে যাওয়ার পর থেকে শত চেষ্টাতেও এক ফোঁটাও লিখতে পারিনি। ও আমারই এক বন্ধুর সঙ্গে চলে গিয়ে-ছিল। শুভ আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমার অনুপস্থিতিতে অরুন্ধতীর সঙ্গে

গল্প করত। সে সময় আমার ধ্যান ধারণা একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল, যে করেই হোক প্রতিষ্ঠা পেতে হবে আর এই একটা মাত্র কারণে অন্যদিকে দৃষ্টি দে'য়ার সুযোগ হয়নি। অরু ঘর ছেড়েছিল। ও ঘর ছাড়ার পর বুঝেছিলাম ওকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি কথাটা বলে হয়ত আপনাকে বোঝাতে পারব না কতটা স্থান ও দখল করে আছে আমার হৃদয়ে, শুধু একটা কথা আপনাকে বলি মনে হয় তাতেই বুঝতে পারবেন, আমি ও চলে যাবার পর লেখা ছেড়ে দিয়েছি। অরু শুভর সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল। আমি ভাবতেই পারিনি শুভ কিম্বা অরু এরকম একটা কিছু করে বসতে পারে। এমন কি ওরা চলে যাওয়ার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ ট্যুরের দিন চারেক আগে অরুর একটা চিঠি পাই। আর তাতেই বুঝতে পারি ওকে আমি ঠিকই চিনেছিলাম। যে চিঠিটা আমার হস্তগত হয় তাতে ওর ঠিকানা ছিল না শুধু পোস্ট-অফিসের ছাপ দেখে বুঝতে পারি ওটা দিল্লী থেকে পোস্ট করা হয়েছিল। সে যাক এবার শুনুন চিঠিটা পড়ে কেন মনে হয়েছিল ওকে আমি চিনতে ভুল করিনি।—এ পর্যন্ত বলে বিকাশবাবু আবারও একটা সিগারেট ধরালেন। ধরিয়ে বলতে শুরু করলেন, বললেন, অরু যেভাবে চিঠিটা লিখেছে ঠিক সেভাবে বলছি—প্রিয় বিকাশ, অনেকদিন পর আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা অবাক হবে, হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুভর সঙ্গে যেদিন ঘর ছেড়েছিলাম সেদিন বার বার তোমার কথাই শুধু মনে হয়েছে। সে সময় কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল বুকের ভেতর তা তোমাকে বোঝাতে পারব না! প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমি ভুল করেছি একথা মনে হওয়া সত্ত্বেও আমি ফিরে আসতে পারিনি। তুমি যদি কাগজ-কলম নিয়ে সর্বক্ষণ পড়ে না থাকতে তাহলে আমাদের মাঝখানে যে প্রাচীরটা গড়ে উঠেছিল তা গড়ে উঠতে পারত না, সেরকম না হলে সুখের সড়ক ধরে আজও হেঁটে যেতে পারতাম আমি—আমরা। যাক যে কথা বলার জন্য চিঠিটা লিখছি তা লিখে নি আগে— শুভর সঙ্গে আমি দিল্লীতে আসি। শুভ ভেবেছিল আমি ওকে ভালবাসি এবং যেহেতু ওর সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে আসতে পেরেছিলাম সেহেতু আমার দেহের উপর ওর অধিকার আছে। এই ধারণার জন্য ও হোটেলের এক কামরায় থাকার কথা ভেবে রেখেছিল। আমি বুঝতে পেরে আগেই জানিয়ে রেখেছিলাম অন্ততঃপক্ষে দুটো ঘর যেন নে'য়া হয়। এরজন্য এবং অন্যান্য খরচের জন্য যে টাকা ব্যয় হবে তার অর্ধেক ব্যয়ভার বহন করব আমি। শুনে ও কিছুটা বিস্মিত হয়েছিল, বলেছিল, তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসলে কেন?—শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমি কোনো জবাব দিইনি। পরে বলেছিলাম, তুমি দিল্লীতে ট্রান্সফার নিয়ে আসছ জেনেই তোমার সঙ্গ নিয়েছি তা না হোলে আমাকে একাই আসতে হোত কারণ—। কথাটা শেষ না করে ব্যাগ থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে ওর হাতে দিয়ে বলেছিলাম, পড়ে দেখ।— ও কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে বলল, তুমি চাকরি নিয়ে এসেছ?—আমি ওর হাত থেকে অ্যাপোয়েণ্টমেণ্ট লেটারটা নিয়ে বললাম, একা মেয়েমানুষ এতটা পথ আসতে ভরসা হয়নি তাছাড়া তুমি যখন আসছই তখন একা আসি কেন।—শুভ

বিস্মিত হয়ে বলেছিল, তুমি ত' জান আমি কেন তোমার সঙ্গে এসেছি আমাকে তোমার ভয় পাওয়া উচিত ছিল—তাই না ?—আমি ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম, বললাম, আমাকে কী তুমি এতটাই অবলা ভেবেছ ? যদি ভেবে থাক তাহলে ভুল ভেবেছ ?—ও এরপর প্রশ্ন করেছিল, যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করি ? কী করবে তুমি ?—আমি ওর প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলে ব্যাগ থেকে রাখি বের করে ওর হাতে বেঁধে দিয়ে বলেছিলাম, আশা করি এর মর্যাদা তুমি রাখবে।—শুভকে আর কিছু বলার প্রয়োজন যে নেই তা আমি জানি কারণ ওকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি, দেখে বুঝেছি ও কখনই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারবে না। বুঝেছি অনেক কিছু, যেভাবে বুঝেছি সেভাবে না বুঝতে পারলে ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। বিকাশ শুভ আমার কাছে কী পেতে চেয়ে তার বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে দিল্লী চলে এসেছিল তা আমি জানতাম, জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি কারণ ওকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। এখন আমার কথা, এখন আমার কী মনে হচ্ছে জান ? মনে হচ্ছে তোমার সাহিত্য সাধনার অন্তরায় না হয়ে তোমাকে প্রেরণা যোগানো উচিত ছিল আমার। তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বার বার একটা কথাই শুধু মনে হচ্ছে—আই লাভ ইউ বিকাশ, ভীষণভাবে তোমাকে ভালবাসি আমি। ভালবাসা নিও।—এর পরই ওকে আমি যে নামে ডাকতাম সে নামটা লেখা ছিল। তোমার (যদি তুমি এখনও আমাকে তোমার মনে কর) অরু। —বিকাশবাবু বক্তব্য শেষ করে ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকতে থাকলেন।

বুঝলাম ভীষণ এক অস্থিরতা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করে রেখেছে। আমি আমার একটা হাত তার হাতের উপর রেখে বললাম, আপনি আমার একটা কথা বিশ্বাস করবেন ? আমার বিশ্বাস কিছুদিনের মধ্যেই আপনি আপনার অরুর দেখা পাবেন।

কী ভেবে বললেন একথা ?

আপনার কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে আমার এ কথাই মনে হচ্ছে। আগেই ত' আপনাকে বললাম আমার বিশ্বাস।—আমার আর বিকাশবাবুর মধ্যে দশ-পনের মিনিট কথোপকথন চলল তারপর এক সময় আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসলাম সবার মধ্যে।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোল। যে জায়গার উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রারম্ভ হোল সে জায়গার নাম গুলমার্গ। যাবার সময় বিকাশ-বাবু গুলমার্গ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে চলেছেন। অন্য দিনের তুলনায় আজ তাকে অনেক বেশি প্রাণবন্ত মনে হচ্ছিল। সবার দৃষ্টি যখন জানালার বাইরের জগৎ স্পর্শ করে আছে তখন আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিশফিশ করে বললাম ব্যাপার কী মশাই আজ যে কাঁখের কলসী থেকে চলকে পড়া জলের মত খুশি ঝরছে আপনার চোখ-মুখ থেকে !—আমার কথার উত্তরে সামান্য একটু হেসে বললেন, আপনি ত' বললেন অরুকে আমি ফিরে পাব। আপনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চিত

ফিরে পাবই।—এর পরও আমি নিরুত্তর থাকতে পারি না, বলি, এটাই কী একমাত্র খুশির কারণ?—আমার প্রশ্ন শুনে সামান্য একটু হাসি মেখে গেল তার দু' ঠোঁটে, বললেন, আরো একটা কারণ আছে—ওকে আমি চিনেছি।—এ পর্যন্ত বলে গেটের দিকে এগোতে থাকলেন। তখনো তার মুখে হাসির মাখামাখি।

কখনো যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনো বাসের বাইরের দৃশ্যাবলীর মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রেখে গুলমার্গে পৌঁছলাম। পৌঁছে বাস থেকে নেমে দাঁড়াতেই আমাদের ঘিরে ধরল বেশ কিছু মানুষ। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য একটাই পর্যটকদের কাছ থেকে কিছু আদায় করা। এদের মধ্যে কোচোয়ানদের সংখ্যাই বেশি। ওদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা পাহাড়ে ওঠার জন্য তাদের ঘোড়া ব্যবহার করি। কে কাকে প্রথম অ্যাপ্রোচ করেছে এই নিয়ে চলল নিজেদের মধ্যে কলহ। আমাদের কী করণীয় যখন বুঝে উঠতে পারছি না তখন ত্রাণকর্তার ভূমিকায় বিকাশবাবুকে দেখতে পেলাম। এসেই ওদের কাছ থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন। তাদের সঙ্গে তার কী কথা হোল বলতে পারব না তবে যা বললে তাতে কলহ বন্ধ হোল। কোচোয়ানদের দল মন্ত্র-মুগ্ধ হয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। যাত্রীদের কয়েকজন ঘোড়া নিলেন এবং আমরা দশ-বারোজন ল্যান্ডরোভারে চেপে বসলাম।

বরফে ঢেকে থাকা পর্বত-শৃঙ্গ অনেক দেখেছি কিন্তু বরফের উপর দিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম। পীচের রাস্তার শেষ সীমানা পর্যন্ত ল্যান্ডরোভারে আসার পর পদব্রজে পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে আসলাম আমরা। এরপর শুরু হোল বরফের উপর দিয়ে হাঁটার পালা। দূর থেকে বরফকে যেরকম ভেবেছিলাম আসলে এখানকার বরফ আদৌ সেরকম নয়, পেঁজা তুলোর মত বরফের স্তূপ। বরফ যত ঠাণ্ডা হয় এই বরফ সেরকম ঠাণ্ডাও নয়। হাতে করে বরফ তুলে নেওয়া যায়। এখানে আসার পর প্রচণ্ড ভাবে যেন বয়স কমতে থাকল। কোনো অদৃশ্য যাদুদণ্ডের স্পর্শে আমরা আবার যেন কৈশোরকে ফিরে পেলাম। বরফের উপর দিয়ে অনেকেই ছুটে বেড়াতে থাকল। আমি, সুরেখা এবং আরো দু'একজন ছোটা-ছুটি করলাম না ঠিকই কিন্তু বরফের বৃত্ত বানিয়ে একে অপরের গায়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারার যে খেলা চলছিল কয়েকজনের মধ্যে তাতে অংশগ্রহণ না করে পারলাম না। এই খেলার আকর্ষণ নিশ্চয়ই অপ্রতিরোধ্য ছিল তা না হোলে সুরেখার মত মহিলা পর্যন্ত অংশগ্রহণ না করে পারল না কেন! সুরেখা বরফের বৃত্ত নিয়ে ছুঁড়ে মারল আমার গায়ে। আর ঠিক তখনই আমি অন্য এক সুরেখাকে দেখেছিলাম সেখানে। সেই অন্য সুরেখা সম্বন্ধে অনেক কথা বলার আছে কিন্তু তার পূর্বে গুলমার্গের রূপের বৈচিত্র যা আমার মনকে ভীষণভাবে স্পর্শ করেছিল তার কথা না বলে অন্য কিছুই বলা সম্ভব নয়।

গুলমার্গে যে দৃশ্য দেখেছিলাম তার কতটা লিপিবদ্ধ করতে পারব জানি না, হয়ত যৎসামান্যই পারব তবু সেটুকু লিপিবদ্ধ না করে উপায় নেই আমার। ⋯ ⋯ এক সঙ্গে এত বরফ দেখিনি কোনোদিন, যেদিকে তাকাই শুধু বরফ। ঝকঝকে রূপোর

চাদরের উপর সূর্যের আলো পড়লে যেরকম দেখায় ঠিক সেরকমই চোখ ঝলসানো উজ্জ্বলতায় চকচক্ করছিল বরফাবৃত সমস্ত অঞ্চলটা। এ রূপ দেখে আমি আত্মহারা। মনে মনে বলি, এই আমার অমৃতকলস, আমার অমরত্বের চাবিকাঠি। এই রূপের সন্ধানে গৃহের বন্ধন টুটে যায়। কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার মনের যে হাল হোত মনে হয় আমার অবস্থাও অনুরূপ, এরকম দৃশ্যাবলীর আকর্ষণে গৃহছাড়া আমি সুতরাং রাধার কাছে কৃষ্ণের বাঁশির আকর্ষণের চেয়ে কম কিসে। বিকাশবাবু বলেছিলেন, মেঘমুক্ত আকাশ সুতরাং গুলমার্গের সৌন্দর্য আপনারা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবেন কিন্তু যে দৃশ্য দেখলে আপনি অভিভূত হয়ে পড়তেন সে দৃশ্য এখন দেখতে পাবেন না। আমি দেখেছি। সে দৃশ্য দেখতে গেলে সূর্যোদয়ের সময় গুলমার্গে আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে। কোনো ট্রেভেলিং-এজেন্টের সঙ্গে এসে কখনই আপনি সে দৃশ্য অবলোকন করতে পারবেন না।—শুনে বলেছিলাম, কীভাবে তা দেখতে পাব জানাবেন?—আমার কথা শুনে উনি বলেছিলেন, সত্যিই আপনি যদি দেখতে চান তাহোলে আমাকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়তে পারেন।—আমি বিকাশবাবুর কথা শুনে বলেছিলাম, তাহোলে ত' কথাই নেই এবার বলুন ত' কী দেখতে পাব?—আমার প্রশ্ন শুনে বিকাশবাবু চোখ বুজলেন। মনে হোল সে দৃশ্যকে মনের পর্দায় ভাসিয়ে তুলতে চাইলেন। সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর চোখমুখ দুটোই খুললেন, ঊষার সূর্যের লাল রং যখন বরফে এসে পড়ে তখন তার রূপ অবর্ণনীয় এরপর সেই রং ফিকে হয়ে আরেক রংয়ের প্রলেপ লাগায় বরফের গায়ে। এভাবে একের পর এক রংয়ের খেলা চলতে থাকে, অবশেষে সূর্য তার সোনালী রং ঢালতে শুরু করে এই ল্যান্ডস্কেপের উপর। সে দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব কিনা জানি না।

সুরেখা আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম বরফের উপর দিয়ে। আমার দৃষ্টি সামনে প্রসারিত। মনের মধ্যে বিকাশবাবুর কথাগুলো বাজছিল। ভাবছিলাম আবার আমাকে এখানে আসতেই হবে। ইতিমধ্যেই ভেতরে-ভেতরে ছটপটানি শুরু হয়ে গেছে।

কী ভাবছেন? কোনো কিছুর মধ্যে ডুবে আছেন বলে মনে হচ্ছে?—সুরেখা প্রশ্ন করল।

আমি বিকাশবাবুর কথা জানালাম।

হঠাৎ সুরেখা আমার একটা হাতকে আঁকড়ে ধরল। আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। আমার চোখের মণিদ্বয়ে যে বিস্ময় ফুটে উঠল তা সম্ভবত ওর চোখেও ধরা পড়ল, বলল, আপনি ত' দিব্যি হাঁটছেন, আমি মোটেও সুবিধা করতে পারছি না, মনে হচ্ছে এই বুঝি পড়ে যাব।—বলতে বলতে ও কিছুটা ঘন হয়ে আসল আমার কাছে।

আমি ওর কথার উত্তরে শুধু হাসলাম, ঠোঁট বিযুক্ত হোল না। সুরেখার আঁচল হাওয়ায় উড়ছিল, উড়ছিল আর বার বার আমার মুখের উপর আছড়ে

পড়ছিল। যতবার আমার মুখের উপর উড়ে আসছিল ততবার ও টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সঠিক স্থানে। যদিও ওর শুধুমাত্র আঁচল উড়ে এসে আমার চোখ মুখ, ঠোঁট স্পর্শ করছিল তবু আমার মনে হচ্ছিল যেন সুরেখাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গোলাপের পাঁপড়ির মত ঠোঁট দিয়ে আমার চোখ-মুখ-ঠোঁটকেই স্পর্শ করে চলেছে। মানব-মানবীর আকর্ষণ আমার কাছে কতটা তা নিশ্চয়ই শত-স্থানে শত-কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র মানবীয় আকর্ষণে আমি দিশেহারা কখনই নই। মনে ভয় মানবী শুধু কাছে টানে না সে আরো কিছু চায়, সে বন্ধন চায়, গৃহ চায়, সে সম্পূর্ণভাবে পেতে চায়। সুরেখাকে যেভাবে জেনেছি তাতে সে ভয় থাকার কথা নয় তবু মনে হোল আজ যেন অন্য এক সুরেখাকে দেখতে পাচ্ছি। ওর মুখে শুধু এখন রোদের খেলা। অন্য সময় ওকে আমি যেভাবে দেখেছি তাতে সব সময়েই মনে হয়েছে আলো আর আঁধারের খেলা যেন চলতে থাকে ওর মুখের উপর। সেই আলো-আঁধারের মধ্য থেকে ওকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

একটা অনুরোধ করব আপনাকে ?

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম।

একটু বসবেন ?

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে—না ?

না সেজন্য নয়, এ বরফাবৃত স্থানে আবার কবে আসতে পারব জানি না তাই ভাবছি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকি। দারুণ জায়গা—না ?

হ্যাঁ, এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি।

আচ্ছা এককবাবু শুনেছি এ ধরনের পাহাড়ি অঞ্চলে মাঝে মাঝে ধস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, সত্যি কী সেরকম সম্ভাবনা আছে ?

নেই বলি কী করে তবে সাধারণত এ সময় ধস নামে না।

যদি নামে তাহোলে কী হবে ?

কী আর হবে আমরা আটকে পড়ে থাকব এখানে।

ও আমার চোখে চোখ রাখল। কিছু বলল না তবু আমার মনে হোল ও যেন অনেক কিছু বলতে চাইছে। যে কথা মনে উদয় হোল সে কথা যে সুরেখাকে আমি দেখেছি সে বলতে পারে না। কিন্তু এখন যে সুরেখাকে আমি দেখতে পাচ্ছি সে শুধুই নারী। রক্ত-মাংসের মানবী। তার চোখে-মুখে শুধুই আলোর খেলা। শুধুই প্রাপ্তির প্রত্যাশা। যে মেয়ে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে বেড়ায়, যন্ত্রণার একটা ছায়া বারবার যার চোখের তারায় প্রতিফলিত হয় এ যেন সে মেয়ে নয়। পাকে পাকে জড়ানো জীবনের মনস্তত্বের সন্ধান করার জন্য যে মেয়ে নিজের মধ্যে বেশির ভাগ সময় ডুবে থাকে এ সে নয়।

আরো একটা প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।

বলুন।

একক গুপ্তর জীবনে আমাদের স্থায়িত্ব কতক্ষণের ?

আপনাদের না আপনার ?

আমার প্রশ্নের উত্তর আসল না। সুরেখা দৃষ্টি ছড়িয়ে রেখে বসে থাকল।

আমি চোখের কোণ দিয়ে ওকে একবার দেখে নিয়ে বললাম, আপনার প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনো মানুষ কখনো দিতে পারে না। স্থায়িত্ব কখনো ক্ষণস্থায়ী, কখনো চিরদিনের। যে কথা মানুষ নিজেই জানে না সে কথার উত্তর দেয় কী করে সেটাই আমার কাছে বিস্ময়। এই মুহূর্তে যে কথা সব থেকে বড় বেশি সত্যি বলে মনে হয় হয়ত পরবর্তী সময়ে সেটা ভয়ংকর মিথ্যে হয়ে যেতে পারে। মনের ভেতরের বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মিনারগুলো ক্রমাগত ভাঙছে আর গড়ে উঠছে। ভাঙা-গড়ার কাজ যেখানে সর্বক্ষণের সেখানে এ প্রশ্নের উত্তর কী সঠিকভাবে দে'য়া চলে সুরেখা !

আমার কথা শুনে ও সামান্য একটু হাসল কিন্তু মুখ খুলল না। ওর এই হাসি আমার কাছে বোধগম্য হোল না। বুঝে উঠতে পারলাম না হাসির আড়ালে কোনো বক্তব্য আছে কিনা। সামান্য কিছু সময়ের ব্যবধানের পর যে সুরেখা এতক্ষণ উপস্থিত ছিল সে হারিয়ে যেতে থাকল। আবার যেন ওর চোখে-মুখে আলো-আঁধারের খেলা দেখতে পেলাম। গলিত লোহা যেভাবে কঠিন হয়ে ওঠে সেভাবে কঠিন হয়ে উঠেছিল ও। বুঝতে পারছিলাম ও নিজের জায়গায় ফিরছে। একটু পরেই ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলুন ফেরা যাক।—আমি প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়ালাম। ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ বসি কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না ওকে। আমরা ফিরতে শুরু করলাম। চাচিজী, সোনাবৌদি, কৃষ্ণাদেবী, বিয়াস, চন্দ্রা এবং আরো কয়েকজন নিজেদের মধ্যে বাক্য বিনিময় করতে করতে মিনিট দু'তিনেক আগে নিচে নেমে গেছে। এখন শুধু আমি আর সুরেখা হেঁটে চলেছি বরফের উপর দিয়ে। অনেকটা পথ নীরবে হাঁটতে থাকলাম আমরা। ভাবছিলাম কিছু বলে নীরবতার প্রাচীরকে ভেঙে ফেলি কিন্তু সুরেখার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না। ও ভীষণ-ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে থেকে হাঁটছিল। একটু আগের দেখা মানুষটা ত' নেই-ই এমনকি যে সুরেখাকে আমি চিনি তাকেও যেন দেখতে পাচ্ছি না। আর এই কারণেই কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। অনেকটা পথ ঐভাবে হে'টে আসার পর সুরেখা মুখ খুলল, বলল, আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা যেন পেতে চাইছে মন কিন্তু সেটা যে কী তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।—হঠাৎ বাতাস যেন ঝড়ের রূপ নিল অন্তত সুরেখার কথাটা যেভাবে আসল তাতে সেরকমই মনে হোল আমার। আরো একটা কথা—ও এই প্রথম নিজের কথা বলল। আমি ওর বক্তব্য শুনে কিছু বলতে পারলাম না কারণ যেভাবে কথাটা শুনলাম তাতে কিছু বুঝে নিয়ে উত্তর দে'য়া আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল, এছাড়া ওর কথা ভাল করে না বুঝে জবাব দে'য়ার পরিণতি কী তা এ ক'দিনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। যদিও ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না তবু বুঝতে পারছিলাম ওকে নিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা করতে ইচ্ছে করছে, ওর সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল আমার,

প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওকে বুঝি, ওকে জানার আগ্রহে আমি অস্থির। ল্যান্ড-রোভার পর্যন্ত হেঁটে আসার সময়ের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করতে থাকলাম তারপর যানটির নিকটবর্তী হয়েই হঠাৎ দমকা বাতাসের মত মনের কথাটা প্রকাশ করে ফেললাম, বললাম, সুরেখা আমাকে আপনি যাই ভাবুন না কেন মনের একটা ইচ্ছের কথা ব্যক্ত না করে পারছি না, আমি আপনাকে জানতে চাই।—সুরেখা কথার উত্তর না দিয়ে শুধু ঘাড় ফিরিয়ে একবার আমার মুখের উপর দৃষ্টি ফেলল এবং তারপরই ল্যান্ড-রোভারে উঠে পড়ল। ওর ওভাবে তাকানো এবং তারপর যানটাতে উঠে পড়াটা আমার কাছে খুবই অপমানজনক মনে হোল। অপমানে সমস্ত মুখের কী হাল হোল বলতে পারব না তবে শরীরের ভেতর রক্ত প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াতে শুরু করল এটা বেশ বুঝতে পারলাম। আমি গাড়িতে উঠে যখন ভাবছি এরকম অপমানিত ইতিপূর্বে হয়েছি কিনা তখন হঠাৎ সুরেখার একটা হাত আমার হাত ছুঁলো। প্রথমে আমার হাতের উপর ওর হাতটা নামিয়ে আনল তারপর ঘাড়টা কাৎ করে ওর দৃষ্টি আমার চোখের তারা দুটো যেন ছুঁয়ে থাকল। ঐ স্পর্শের মধ্যে প্রেম নিবেদন ছিল না, ছিল অন্য কিছু। ওর ব্যবহারে আমি অপমানিত বোধ করেছি এটা ও বুঝেছিল, সম্ভবত তাই ঐ স্পর্শের মধ্য দিয়ে ও অনুরোধ জানাচ্ছিল ওর ব্যবহারে অপমানিত না হওয়ার জন্য। ল্যান্ড-রোভার যখন যান্ত্রিক শব্দ উৎপন্ন করে রাস্তার উপর গড়াতে শুরু করল তখন সুরেখা ওর হাতটা সরিয়ে নিল।

॥ দশ ॥

পরের দিন সোনামার্গে যাওয়ার জন্য সবাই প্রস্তুত শুধু আমি শুয়ে থাকলাম আমার ঘরে। মাঝরাত থেকে অনুভব করছিলাম গায়ে সামান্য জ্বর। ভোরের দিকে জ্বরটা কিছুটা বেড়েছে আর এই কারণেই এখনো বিছানার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়নি আমার। একটু পরেই চাচিজী সম্ভবত আমাকে দেখতে না পেয়ে আমার ঘরে এসে হাজির। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী ব্যাপার তুমি এখনো তৈরি হওনি ?

বললাম, শরীরটা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসে আছে, যা অত্যাচার করে চলেছি মাসাধিককাল যাবৎ তাতে শরীর কতদিন আর নীরবে তা সহ্য করবে বলুন।

চাচিজী কয়েক পা এগিয়ে এসে আমার কপালে হাত রাখলেন, রেখেই আঁৎকে উঠলেন, গা যে পুড়ে যাচ্ছে—আমি থাকছি তোমার কাছে।

আমি অনেক চেষ্টা করে বুঝিয়ে তাকে বাসে পাঠালাম। চাচিজীর পর বিশ্বাস, চন্দ্রা এবং আরো অনেকে আসল। সর্বশেষে আসল সুরেখা। ও আমার খাটের পাশে চেয়ার টেনে এনে বসল, বসে বলল, আপনি একা থাকবেন অসুস্থ শরীর নিয়ে ?

একা কেন থাকব ট্রেভেলিং-এজেণ্টের বিকাশবাবু ছাড়া সমস্ত কর্মচারীই থাকছে আমার সঙ্গে।

ও আর কিছু বলল না শুধু কপালে হাত ঠেকিয়ে জ্বরটা দেখল।

ওকে উদ্দেশ্য করে বললাম, আর দেরি করবেন না আপনার জন্য বাস ছাড়তে পারছে না।

ও নীরবে উঠে দাঁড়াল, কিছুক্ষণ আমার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করে দাঁড়িয়ে থাকল, বাসের হর্ণ শোনার পর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার ঠিক আগে ওর দৃষ্টি দেখে মনে হোল ও যেন কিছু একটা ফেলে যাচ্ছে। ও বেরিয়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর মতিলাল কাঁচের একটা গ্লাসে সবুজ রংয়ের কোনো তরল পদার্থ বহন করে আমার কাছে এসে বলল, বাবুসাব একটা দেহাতী দাওয়াই খেয়ে দেখুন আধ-ঘণ্টার মধ্যে বুখার ছোড়ে যাবে। আপনার বুখার হয়েছে শুনে তৈরি করে লিয়ে এসেছি। ই হুটেলের বাগিচা মে উ ওষুধের পেড় আছে বলে ইতো তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলেন না হোলে আনতে পারতাম না।

আমি মনে মনে ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না ঐ তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করা উচিত হবে কিনা। সম্ভবত মতিলাল আমার মনের কথাটা পড়ে ফেলল, বলল, বাবুসাব বিসোয়াস করতে পারছেন না—না? আপনি ইতো নামি আদমী আপনাকে বাজে কুছু দিতে পারি?

এবার আর ওর হাত থেকে গ্লাসটা না নিয়ে পারলাম না। অনেক সময় এরকম দেহাতী ওষুধের গুণ আমি প্রত্যক্ষ করেছি। হাটে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে শরীরকে যে সব সময় সুস্থ রাখতে পেরেছি তা নয় দু'একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং তখন এই রকম দেহাতী ওষুধের উপর ভরসা না করে উপায় থাকে নি। একবার শুধু একটু বিপাকে পড়েছিলাম। দেহাতী ওষুধ খেয়ে একবার চোখে সর্ষেফুল দেখে-ছিলাম। খেয়ে পেট ফেঁপে মরি আর-কী। সেই একবার ছাড়া প্রত্যেকবারই বেশ উপকার পেয়েছি। এই কারণেই শেষ পর্যন্ত মতিলালের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে নিলাম।

আপনি একটু ভাল হোন উসকা বাদ আপনার সাথে একটু গল্প করব আপনি বিরক্ত হবেন না ত'?

আমি মতিলালের হাতে খালি গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, না—না তুমি এসো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ও আবার আসল। ও যখন আসল তখন আমি অনেকটা সুস্থ, জ্বরটা কমেছে। ওকে জানালাম সেকথা, শুনে বলল, হামি বলিনি বাবুসাব একদম ঠিক হয়ে যাবেন।—বলে খাটের কাছে মেঝেতে বসে পড়ল।

তোমার কে কে আছে মতিলাল?—ও বসতেই প্রশ্ন করলাম আমি।

মা আর দুটো বহিন আছে। দেশের বাড়িতে শুধু মা থাকেন ইকা।

বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে বোধহয়?

এখঠোর হয়েছে।

আর অন্য জনের ?

ও অনেকক্ষণ আমার কথার জবাব না দিয়ে মাথা নত করে মেঝের উপর আঙুলের ডগা দিয়ে অদৃশ্য কিছু এঁকে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর বলল, আউর এক বহিন কলকত্তাকা কে-পি-রায় লেনমে থাকে। খরাব হোয়ে গেছে। –এ পর্যন্ত বলে আবার কিছুক্ষণ একই কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখল ও। প্রায় আধমিনিটের নীরবতা পালন করার পর আবার দু' ঠোঁট বিযুক্ত হোল ওর, হমার জন্যই খরাব হয়ে গেল ও। হামি একজনকে বিয়ে দিতে থালি-লোটা বিক্রি করিয়ে ফেলছিলাম। রুপিয়া ন রহনেকে লিয়ে মন-মেজাজ সোব সময় খরাব হয়ে থাকত তার উপর যব ফুলবতীকে চোখের সামনে দেখতাম তখুন মেজাজ আউর ভী খরাব হোয়ে যেত। উকে দেখলে মেজাজ চড়তে শুরু করত এখটা কারণে—উকেও সাদী করাতে হবে ইয়ে বাৎ ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত। কোউন উপায়ে যে দেবো কুছু ভেবেই পেতাম না আউর ইসি ওয়াস্তে উকে দেখলে গুস্সা এসে যেত। উ একদিন বাড়ি ছোড়ে পালালো। বহুত দিন তক্ উর কই খবর পাইনি। মাত্র পিছলে সাল উকে দেখতে পাই কে-পি-রায় লেনের খরাব মেয়েদের সঙ্গে একঠো কোঠির দরওয়াজার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উর ইয়ে হালত্ কী করে হোল বুঝতে পারলাম না। উ বাড়ি ছোড়কে যানে কা বাদ উর খবর হমার কান তক্ পোঁছেছিল। শুনেছিলাম মহাবীর সাহু উর লেড়কার সাথে ফুলবতীর বিয়ে দিয়েছিল। ই খবর শুনকে হামি খুশ হোতে পারিনি আউর একদম যে অখুশি হয়েছিলাম ইয়ে বাৎ ভী বোলনা ঠিক নেহী হোগা। খুশি না হোনে কা কারণ মহাবীর সাহুকে ভালমতন পহেচানতাম। উর মতন বদমাস আদমি হামি খুব কমই দেখেছি। উ না পারে এমন কোন কাজ নেই। ইয়ে ছোড়কে উসকা লেড়কাভী ঠিক নেহী থা, উর হাত-পা কাঁপত। কুথা বলতে গেলে অসুবিস্তা হোত। ইসসে ভী বড়কে উ ওর বাবার খরাব কামকো সাথ দিত না ঠিকই কিন্তু উসকা বিপক্ষমে মাথা তুলে দাঁড়াবার মুতন মনকা তাগদ্ ভী নেহি থা। মহাবীর সাহুর সাথ হমার সম্পর্কটাও ছিল খুব খরাব। খরাব কী করে হোল সে কুথা বলতে গেলে বহুত কুছ বোলতে হবে। উ বাত্ এখুন থাক। উ কারণকে লিয়ে খবরটা শুনে খুশ হোতে পারিনি। আউর একদম খুশ যে না হয়েছি ই বোলনা ভি ঠিক নেহি হোগা কারণ ফুলবতী ভেসে না গিয়ে একজনকা জরু বন গিয়া। হা যো বোল রহে থে, ফুলবতীকে সাঝকে বখত কে-পি-রায় লেনে দেখলাম দাঁড়িয়ে থাকতে। দেখে থোরা ভি টেইম বরবাদ ন করকে উর কাছে এসে বললাম, তুহার ই হালত্ ক্যায়সে ব্যনি! রহনে দে উ বাত্ বাদমে শুনেঙ্গে উসসে পহ্‌লে তু হমার সঙ্গ চল, তুঝকে ই নরক পর রহনে নেহি হোগা।—হমার কুথা শুনে ফুলবতীর কপালে ভাঁজ পড়ল, বলল, অভি উ-সব বাত্ ছোড়—হমার বড়ি ভাইয়া—বাপু-ভাইয়া কোইভি নেহি হ্যায়—সিরিফ্ খরিদুয়ার। বউনিকা টেইম পর ঝমেলা মত কর আনা হ্যায় ত' ঘর মে চল।

—উসকা বাত শুনকে হামি কানে আঙুল দিয়ে ভেগে এলাম, আপনি ত' লিখেন-টিখেন বাবুসাব তাই আপকো হমার মনের তখুনকার অবস্থার কুথা নিশ্চয়ই বোঝাতে হোবে না, নিজেই বুঝে লিতে পারবেন।

ওর কথা বন্ধ হতেই প্রশ্ন করলাম, কী ভাবে ঐ জায়গায় পেঁছিল জানতে পারনি মতিলাল ?

আমার কথা শুনে ও অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকল সামান্য কিছু সময় তারপর বলল, স্যকা, হমার জান-পহচান একজনের কাছ থেকে জেনেছি। হামি জানতাম মহাবীরের ছেলে সোভাবিক ছিল না লেকিন উ যে পুরুষ ছিল না ই বাত্ সেই জান-পহচান আদমির কাছ থেকে জানলাম। অউর ভী জানলাম ফুলবতীকে মহাবীর লেড়কার বউ করে আনলেও রাতমে তার লিজের বিস্তরাপর লিয়ে যেত ওকে। কুছু-দিন পর ফুলবতী ঐ বাড়ি ছোড়ে আবার পালাল। ইসকা বাদ আউর কুছু হামি বলতে পারব না। আউর এক বাত—ফুলবতী যখন উখান থেকে ভেগে গেল তখন উ মা বননে ওয়ালি থি।

মতিলালের সঙ্গে তার প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল প্রায় সমস্ত দিন ধরে তবে নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে নয়, ও দৈনন্দিন কাজ সারছিল এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে এসে গল্প জুড়ে দিচ্ছিল। ওর সান্নিধ্য না পেলে প্রায় তেরো ঘন্টা সময় কাটানো আমার পক্ষে যে কতটা দুর্বিসহ হোত তা বলে বোঝানো শক্ত। রাত আটটার কাছাকাছি সময়ে যাত্রীরা ফিরে আসল। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত চন্দ্রা আর বিয়াসের কাছ থেকে সোনামার্গের সম্বন্ধে শুনে কিছুটা তৃপ্ত হতে চাইলাম। যতই শুনছিলাম ততই রাগ হচ্ছিল নিজের শরীরের উপর। এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার আমার অমৃত-কুম্ভটি পূর্ণ করার প্রয়াস চালাতে অক্ষম হোলাম শুধুমাত্র শারীরিক কারণে। চন্দ্রা আর বিয়াসের মুখ থেকে সোনামার্গের সম্বন্ধে শুনে তৃপ্ত ত' হইনি বরং বুকের মধ্যে ছটপটানি বেড়েছে। আমার অবস্থা সর্পকুলের মত, অমৃত লাভের আশায় কুশাসন চেটে তারা যেমন জিভ চিরে বসেছিল কিন্তু অমৃতের ছিটেফোঁটাও তাদের কপালে জোটেনি আমার অবস্থাও অনুরূপ, যত শুনি তত ছটপটানি বাড়ে। দু'চোখের তৃষ্ণায় বুক ফাটার উপক্রম।

আর মাত্র তিনটে দিন শ্রীনগরে কাটিয়ে রাজধানীতে আসলাম আমরা। আমাদের সংরক্ষিত কম্পার্টমেণ্টটা যখন দিল্লী স্টেশনে এসে পেঁছল তখন সকাল। প্লাটফর্মে লোকজনের ব্যস্ততা নেই, অল্প কয়েকজন যাত্রী পরিচ্ছন্ন প্লাটফর্মে বসে এবং পদচারণা করে সময় অতিবাহিত করছে। আমাদের ট্রেন 'ইন' করার পর আমাদেরই কয়েকজনের কণ্ঠস্বরে জেগে উঠল দিল্লী স্টেশন। একটা ঘুমন্ত শিশুকে হঠাৎ জাগিয়ে তুললে সে যেভাবে বাতাসকে ছিঁড়ে ফেলে সে ভাবেই এই স্টেশনের বাতাসের স্তর ছিন্নভিন্ন হতে থাকল। ন'টার সময় বেরোতে হবে একথা জানিয়ে বিকাশবাবু বাস 'বুক' করতে গেলেন।

আমাদের বেরোবার কথা ছিল ন'টায় কিন্তু শত চেষ্টাতেও দশটার আগে যাত্রা শুরু

করা গেল না। নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রারম্ভ হয়নি বলে বিকাশবাবু কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু তার থেকে দশগুণ বিরক্ত হোল বাসের ড্রাইভার। গজগজ করতে থাকল। বাসে যখন আমি উঠেছিলাম তখনই বিয়াস আমাকে ডেকে ওর পাশের আসনটিতে বসিয়ে বলেছিল, বাস ছাড়ার পর তোমাকে একটা খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাবো।—কী খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানাবে তা জানা হোল না তখন, কারণ বাসের ড্রাইভার যেভাবে গজ গজ করছিল তাতে আমরা সকলেই বেশ বিরক্ত বোধ করছিলাম, হয়ত তা সত্ত্বেও বিয়াসকে জিজ্ঞেস করতাম কিন্তু মিঃ টি. সি. ঘোষ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ড্রাইভারকে এমনভাবে ধমকাতে আরম্ভ করলেন যে তখন অন্য দিকে মন দে'য়ার উপায় থাকল না। এই মানুষটাকে কথা বলতে দেখিইনি বললে চলে, শুধু মাঝে মাঝে রেগে উঠতে দেখেছি। হাওড়া থেকে এ পর্যন্ত তাকে অন্তত কম করে দশবার রেগে উঠতে দেখেছি। আমি বুঝেছিলাম প্রায় সকলেই তাকে অপছন্দ করছে এবং এই কারণেই তার ধারে কাছে কেউই ঘেঁষতে চায়নি, এতক্ষণ এটাই ছিল একমাত্র সত্যি কিন্তু এই মুহূর্তে মানুষটাকে অনেকেরই ভাল লাগল। ড্রাইভারের উপর তার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনেককেই বলতে শুনলাম, বেটার গজ-গজানি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হচ্ছিল ঘোষবাবু ঠিকই করেছেন, এদের এভাবে না দাবড়ালে এরা পেয়ে বসে। ঘোষবাবুর মত মানুষ সঙ্গে থাকা ভাল। এরকমই অনেক মন্তব্য শুনতে পাচ্ছিলাম তার সম্বন্ধে। যাই হোক ড্রাইভারের মুখ একেবারে বন্ধ করিয়ে ছাড়লেন ঘোষবাবু। ড্রাইভারের মুখ বন্ধ হোল এবং সেই সঙ্গে বাসটাও বেঁচে উঠল। বাসের ভেতরের গুঞ্জন আস্তে আস্তে কমে আসল। এতক্ষণে আমি বিয়াসের কাছ থেকে জানতে চাইতে পারলাম কোন খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য ও অনুরোধ জানাবে আমাকে।

কথার খেলা।—আমার প্রশ্নের পর বিয়াসের উত্তর ছিল এটা।

কথার খেলা? খুলে বল।—ওর কথা বোধগম্য হোল না বলে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বলছি কিন্তু তার পূর্বে একবার সতর্ক করে দিতে চাই তোমাকে, এটা শুধু মাত্র খেলা এর মধ্যে অন্য কিছু নেই। এবার বলছি, ধরো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অন্য রকম, অন্য দশটা মেয়ের মত আলাপের পর তোমাকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। দুর্বলতা মনে আশ্রয় নিতে শুরু করেছে, তুমি যখন জানলে তখন কী করবে?

ধরো আমিও তোমার কাছে আমার হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে আহুতি জানিয়েছি।—যদিও বিয়াসের কথার খেলা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি তবু খেলা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আর না করে ওর কথার উত্তর দিলাম।

শ্রীনগরে আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে মাইল কয়েক দূরে কিম্বা পহেলগাঁওয়ের কোনো এক নির্জন স্থানে আমরা দু'জন হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম।

অকারণে যাব কেন?

বিয়াস চাপা কণ্ঠে আমাকে ধমকে উঠল, বোকার মত কথা বোল না, আমি কী তোমার সঙ্গে হাটের মাঝে হৃদয় বিনিময় করব! প্রেম করার জন্য কোনো নির্জন জায়গা খুঁজে নিতে হয় সুতরাং জনপদ ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি ওরকম কোনো নির্জন স্থানে। আমরা যেখানে এসেছি সেখানে রহস্যঘন সবুজ আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তার অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে পরস্পরের হৃদয়ের ঘ্রাণ নেবার জন্য। তার আহ্বান উপেক্ষা করার শক্তি কিম্বা ইচ্ছে কোনোটাই আমাদের নেই, তাই পায়ে পায়ে হারিয়ে যাই আমরা সেই অরণ্যে; অরণ্যের নিস্তব্ধতার বুকে আঘাত না করে পরস্পরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে হাঁটতে থাকি আমরা। মাথার উপর আকাশ যেন বলতে থাকে, আরো এগিয়ে যাও তারপর আমি যখন আঁধার নামাব তখন বিশ্ব-সংসার ভুলে যেও, তখন পরস্পরকে জেনে নিও যেভাবে জানার পর বলার প্রয়োজন হয় না—তুমি সা আমি অম, তুমি ঋক আমি সাম, তুমি পৃথিবী আমি আকা, এরকম আমরা দুজনে বিবাহিত হচ্ছি। তখন শুধু বোল তোমার প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সঙ্গে আমার অস্থির, তোমার মাংসের সঙ্গে আমার মাংস এবং তোমার ত্বকের সঙ্গে আমার ত্বক মিশে যাক। ঐ ভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমরা পৌঁছে গেলাম এক গুহার সামনে, এবার তুমি বল।

আমি কেন বলব?

এটাই ত' খেলার নিয়ম। আমি যেখানে শেষ করব তুমি সেখান থেকে শুরু করবে আবার তুমি যেখানে শেষ করবে সেখান থেকে শুরু করব আমি।

বেশ, গুহার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। তুমি বললে, দেখ একক কী জমাট অন্ধকার গুহার ভেতর, অন্ধকারের আকর্ষণ তুমি অনুভব করছ না একক! আমি করছি, অন্ধকার বড় রহস্যাবৃত, তার মধ্যে কী আছে খুঁজে দেখার আনন্দ যে কী ভীষণ তা তুমি কী সত্যিই অনুভব করতে পারছ না একক? আমার বিশ্বাস হয় না। চল একক আমরা খুঁজি আমাদের, অন্ধকারেই শুধু নিজেদের খোঁজা যায় আলোতে শুধু আমরা মানুষ। অনেক মানুষের একজন। দুনিয়ার মানুষ বলবে আলোতে সব কিছু স্পষ্ট, এত স্পষ্ট যে আর কিছু জানার থাকে না—সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত। আমি কী বলি জান বড় ভুল ধারণা মানুষের মনে, আলোতে শুধু মানব-মানবী আমরা, শুধু 'আমি' আমরা, আমিও 'আমি' তুমিও 'আমি' অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষই 'আমি'। আলোতে যেটা সব থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হচ্ছে আমি থেকে যা উৎপন্ন হয়—আমার। অন্ধকারে অনেক কিছু খুঁজে নেয়া যায় অবশ্য সেখানেও অহমকে খোঁজার ব্যাপার আছে তবে সে অহম অনেক ব্যাপক কারণ সেখানে আমার বলে কিছু মনে আসে না। এছাড়া আঁধারে এত কিছু আছে যে তা খুঁজে দেখার সময় 'আমার' সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে অনেক কথাই ত' বললাম এবার গুহার ভেতরে চল একক আঁধারে নিজেদের খুঁজে দেখি সত্যি আমরা মানব-মানবী নাকি অন্য কিছু। খুঁজে দেখি শরীর আছে কী নেই।—আমি বললাম, তুমি যাও বিয়াস আমি এখানে একটু দাঁড়াই, দেখি

অস্তগামী সূর্যের আভা কিভাবে পর্বতশিখরে মেখে আছে, কীভাবে সবিত্রীর শরীর রূপান্তরিত হচ্ছে, কীভাবে আমরা হারিয়ে যাই তমিস্রার মধ্যে।—তুমি গুহার মধ্যে হারিয়ে গেলে, যাবার আগে জানিয়ে গেলে আমি যেন তোমাকে খুঁজে আনি গুহার ভেতর থেকে। আমি সম্মতি জানিয়ে গুহার বাহিরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালাম সেই সঙ্গে আমার অমৃত-কলসটা ভরে নে'য়ার উদ্দেশ্যে লোচনদ্বয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে রাখলাম। যখন আঁধার গড়িয়ে নামতে শুরু করল তখন গুহার ভেতরে ঢুকলাম সন্তর্পণে। চোখ দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে তোমাকে খুঁজতে থাকলাম। সামান্য একটু সময় খোঁজার পর দেখতে পেলাম তোমাকে, শুধু তোমাকেই নয় আরো একজনকে দেখতে পেলাম সেখানে। জটাধারী এক সন্ন্যাসী তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, তার কথা আমি শুনতে পেলাম। তিনি বললেন তুমি কে?—তার কণ্ঠ ভারী। গুহার প্রাকারে সে কণ্ঠস্বর আছড়ে পড়ে ভরিয়ে তুলল বাতাসকে। তুমি জানালে পঞ্চ-নদের দেশের মেয়ে তুমি—বিয়াস। তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপছিল। তুমি কম্পিত কণ্ঠেই সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলে, প্রভু এই গুহার মধ্যে আপনি কতদিন আছেন? —তোমার প্রশ্নের উত্তর দে'য়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখতে পেলেন, পেয়ে তোমাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলেন আমি তোমার সঙ্গে এসেছি কি না। জানার পর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কতদিন এখানে তা আজ আর আমার মনে নেই তবে কয়েক যুগ ধরে আছি এটা বলতে পারি। এই গুহার ভেতরে মহাকালীর মূর্তি আছে, আমার গুরুদেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে আসলে যখন তখন দেবীকে না দেখে যেও না তোমরা।—তুমি তার কাছে জানতে চাইলে আমরা দেবীর পুজো দিতে পারি কি না। সন্ন্যাসী বললেন, পার তবে তার একটা বিশেষ নিয়ম আছে।

আমি বিয়াসের দিকে ফিরে বললাম, এবার বল তুমি।

বিয়াস মুখ খুলতে পারল না, বাসটা ওর মুখ খোলার আগেই দাঁড়িয়ে পড়ল লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরের কাছে। আমরা বাস থেকে নেমে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। প্রশস্ত রাস্তার ধারে, বেশ কিছুটা সিঁড়ি অতিক্রম করে আসার পর মন্দিরের দ্বিতীয় দ্বারটি অতিক্রম করে বিগ্রহের দেখা পেলাম। দেউলটি বড়, শুধু বড়ই নয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এটা নির্মাণ করা হয়েছে। সুরেখা বিগ্রহের কাছে দাঁড়িয়েছিল, আমি প্রায় ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললাম, কী দেখছেন সুরেখা শিল্পকর্ম নাকি বিধাতাকে?

আপনি ঈশ্বর আছে এটা বিশ্বাস করেন?—আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও অন্য কথা বলল।

আপনি করেন না?

এটা ত' আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। আমার কথা পরে হবে তার আগে আপনার মতামতটা ব্যক্ত করুন।

এক এক সময় মনে হয় আছে, আবার কখনো মনে হয় ঈশ্বর বলে কিছু নেই, হয়ত ঈশ্বর আমাদের মনের দুর্বলতা, একটা ভয় যে ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি।

জয় করতে পারিনি না বলে বলা উচিত ছিল তাড়াতে পারিনি। আমি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি না আবার বিশ্বাস করি এ কথা বলতে পারছি না আসলে ঈশ্বর নিয়ে কখনো ভাবিনি, আজ এই লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল মূর্তির দিকে তাকিয়ে কী ভাবছিলাম জানেন? ভাবছিলাম ঈশ্বর আছে, তা না হোলে যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষ এখনো তাঁর অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে বসত না এটা বিশ্বাস করা যায় না।

আপনার অভিমত অনুযায়ী বলা যায় যেহেতু অসংখ্য মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেহেতু ঈশ্বর আছে, এত মানুষ এক সঙ্গে ভুল করতে পারে না—তাই ত'? আমি যদি বলি পারে, যদি প্রমাণ চান দিতে পারি।

গেলিলিয়োর কথা বলবেন ত'!

হ্যাঁ।

সে ভুল ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভুল হোতে পারে কিন্তু কোনো ভুলই দীর্ঘস্থায়ী হোতে পারে না।

এখন কী পূর্বের প্রশ্নটা আরো একবার করতে পারি?

কোনটা বলুন ত'?

কাকে দেখছিলেন এতক্ষণ—বিগ্রহকে? নাকি এমন মার্বেল পাথরের···

আমি কিছু দেখছিলাম ঠিকই তবে তা পাষাণ মূর্তি নয়, ভাবছিলাম এই পাষাণ মূর্তিকে যদি কথা বলাতে পারতাম তাহোলে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতাম।

জানতে পারি কী সে প্রশ্ন?

এক কথায় বা দু'চার কথায় তা বলা যাবে না, তা বলতে গেলে লাইফ-টাইমের মধ্যে বলে শেষ করতে পারব কি না তাও জানি না।

এমন কঠিন প্রশ্ন তাঁর কাছে ব্যক্ত করতেন কী ভাবে?

করতাম না, বলতাম, আমার মনের ভেতর যে প্রশ্ন আছে তা তুমি বুঝে নিয়ে উত্তরটা শুধু জানিয়ে দাও বিধাতা।

কৃষ্ণাদেবী এসে হাজির হোলেন আমাদের কাছে, এসে বললেন, মন্দিরটা অনেক বড় —ঘুরে দেখবেন না আপনারা!

আমি বললাম, চলুন দেখে আসি।

সুরেখা যেতে রাজী হোল না, বলল, আপনারা যান আমি এখানে থাকব কিছুক্ষণ।

আমি আর কৃষ্ণাদেবী মন্দির পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম। লক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দিরটা দেখা হয়ে যেতেই কৃষ্ণাদেবী বললেন, কাছেই কালী-মন্দির—যাবেন? যাবেন বলছি কেন যেতে হবেই কারণ দিল্লীর কালী-মন্দির না দেখলে দিল্লী দেখাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনেকেই ইতিমধ্যে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন।

কালী-মন্দির ঘুরে প্রায় দশ-বারোজন এক সঙ্গে বাসে ফিরলাম, অনেকে আগেই

ফিরে এসেছিলেন কিন্তু দু'জন তখনো ফিরে আসেনি দেখে বিকাশবাবু তাদের খুঁজতে বেরোলেন। আমি আমার আসনটিতে বসে বিয়াসকে বললাম, এখনই কী কথার খেলাটা শুরু করবে ? যদি না কর তাহোলে……

তাহোলে নয় এক্ষুনি শুরু করব, এবার ত' আমার পালা—না ?—এ পর্যন্ত বলে চোখ বন্ধ করে সম্ভবত আমি কী কী বলেছি এবং কোথায় শেষ করেছি মনে করার চেষ্টা করল। এক-আধ মিনিট ওভাবে থাকার পরই ও মুখ খুলল, গুহার বাইরে একটা পাহাড়ি ঝরনা আছে গুহাতে ঢোকার পূর্বে তা মনে হয় তোমাদের চোখে পড়েছে, সূর্যাস্তের পর সেই ঝরনার জলে স্নান করে সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে পুজো দিতে হয়।—এ পর্যন্ত বলে সন্ন্যাসী দুটো ফুল আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখন সূর্যাস্ত হয়েছে যদি একান্তই পুজো দেওয়ার বাসনা থাকে তাহোলো তোমরা স্নান করে এসো, এরপর যে ভাবে বললাম ঐ ভাবে দেবীর পায়ের কাছে ফুল রেখে প্রণাম করবে। কোনো মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন নেই, অন্য কোনো সামগ্রীরও প্রয়োজন নেই।—তুমি সন্ন্যাসীর কথায় ভয় পেলে, মাথা নিচু করে বসে থাকলে, আমি সাহসী হয়ে উঠলাম, বললাম, একক চল সূর্যাস্ত হয়েছে আমরা স্নান করে আসি। তোমার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল, মেয়েদের এত সাহসী হোতে তোমরা দেখনি। আমি তোমার হাত স্পর্শ করে বললাম, ওঠ একক ভয় কী, কৃত্রিমতাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা নিষিদ্ধ ফলটা না খেয়ে আদম-ইভ হব এতে ভয় পেও না, সাপটাকে আমি আমার ধারে কাছে আসতে দেব না। তুমি এলে আমার সাথে, এক সঙ্গে ঝরনার জলে স্নান করলাম আমরা। এরপর তুমি বল।

আরো কিছুটা বল বিয়াস।

বিয়াস হেসে ফেলল, বলল, সত্যি তুমি ভয় পেলে একক ? এ খেলায় প্রথমবার তুমি হেরে গেলে। ঠিক আছে আমি বলছি, আমরা স্নান করে গুহার মধ্যে আসলাম। গুহার ভেতরে মসিলিপ্ত আঁধার, আমরা দুজনই বস্ত্র ত্যাগ করলাম। অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই অন্ধকারে দেবীর মূর্তিকেও দেখতে পেলাম না। তোমাকে লাইটারটা জ্বালতে বললাম। শুনে তুমি আরো একবার ভয় পেলে, নিজের উপর বিশ্বাস তোমার নেই।

আমি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে উঠলাম, আমাকে অতটা দুর্বল ভেব না বিয়াস।

বিয়াস দ্বিতীয়বার হেসে উঠল।—এটা তোমার দ্বিতীয়বার পরাজয়, এটা শুধু কথার খেলা।

ঠিক আছে আমার দ্বিতীয়বারের পরাজয়ও স্বীকার করে নিচ্ছি এবার বল।

তুমি আলো জ্বাললে। সেই স্বল্প আলোয় দেখলাম এক বিরাট কালীমূর্তি, তার পায়ে ফুল রেখে প্রণাম করলাম। তুমিও করলে এবার বলতে পারবে ?

বিয়াস তুমি প্রত্যেকবারই বিপদজনক জায়গায় শেষ করছ।

বার বার পরাজয় মেনে নিলে তার সঙ্গে খেলা চলে না এই শেষবার এরপর তুমি যদি মুখ খুলতে না চাও তাহোলে এ খেলায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার তোমার

আর থাকবে না। তোমার জায়গায় আমি হোলে কী বলতাম জান? বলতাম,

দেখো জওয়ানীকা উভার।
য্যায়সা নদীকা মৌজ, য্যায়সা তুর্কি কা ফৌজ,
য্যায়সা শুলেগতে বস্, যায়সা বালক উধম।
য্যায়সা স্বপ্নোকা গাগর, য্যায়সা রূপকা সাগর।
য্যায়সা চন্দনকা মূরথ, য্যায়সা যৌবনকা তীরথ।
দেখো জওয়ানীকা উভার।

এর বাংলা অর্থটা শুনবে? নারীদেহ বল্লরীতে উরজের উল্লাস দেখো। দেখো স্তনের অপরূপ শোভা, নারীর স্তন যেন নদীর ঢেউ, যেন তুর্কীর গর্বিত সৈন্যবাহিনী, যেন বিস্ফোরণের পূর্বের বোমা, যেন এক উল্লসিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বালক, যেন স্বপ্ন সলিল ভরা একটি মৃণাল, যেন রূপ-লাবণ্যের এক সিন্ধু, যেন চন্দনের এক মূর্তি, যেন যৌবনের এক তীর্থ।

বিয়াস আমি পরাজিত তোমার কথার খেলায় আমি আর অংশ গ্রহণ করতে পারব না।

বিয়াস আমার কথার উত্তরে বলল, আমি জানতাম তুমি বলবে এ কথা। ঠিক আছে আমি শেষ করছি—তুমি আমার দিকে ফিরে চোখ বন্ধ করে ফেললে, বললে, বিয়াস আমি তোমাকে এভাবে দেখতে চাই না। এভাবে দেখতে চাইনি, প্লীজ বিয়াস, প্লীজ।—তোমার কথা শুনে আমার বড় ছোট মনে হোল নিজেকে। যে সাপটার কোনো কথাই আমি শুনব না বলে ঠিক করে রেখেছিলাম শেষ পর্যন্ত তার কথাতেই নিষিদ্ধ ফলটা খেয়ে বসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী আমি চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে, একবার, শুধু একবার। একক এবার বল তোমার কোনো অভিযোগ আছে? তোমাকে তোমার জায়গা থেকে নামিয়ে আনিনি। আমি নিজেকেই টেনে নামিয়েছি। এতক্ষণ যা বললাম তা ঐ পরিবেশে স্বাভাবিক কিন্তু খেলার বিয়াসের মত আমি নই। আমি কিরকম তুমি জান। তুমি ব্যতিক্রম, আমিও, আর সুরেখা? সেও ব্যতিক্রম। কেন আমরা এরকম বলতে পার? কথার বিয়াসের সঙ্গে আমার কোথাও মিল আছে বলে মনে হয় তোমার?

একেবারে মিল খুঁজে পাব না বললে মিথ্যে বলা হবে। তুমি একজনকে পেতে চাও। মনের কিম্বা দেহের সুখের জন্য নয়, অন্য কারণে। গল্পের বিয়াসের মধ্য দিয়ে নিজের কোনো কথাই তুমি বলনি ভেব না। তোমাকে যেটুকু বুঝেছি তাতে এ কথা বলতে পারি। অজানাকে জানবার স্পৃহা তোমার মধ্যে আছে। এই কারণেই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাও। হাত বাড়ালেই যাকে পাওয়া যায় তুমি তাকে পেতে চাও না, এক একজনকে এক এক ভাবে পেতে চাও। আমাকে তুমি পেতে চাও এক ভাবে। কখনই তুমি আমার কাছে খেলার বিয়াস হয়ে যেতে পার না। কথার খেলার মানুষটা যদি আমি না হোতাম তাহোলে কী হোত বলব?

বল।

বিয়াস বলত, এই শরীরে কী আছে আমাকে জানাও। আঁধারে এ এক পাওয়া, এ প্রাপ্তিটা কী তা অন্তত একবার বুঝিয়ে দাও। শুধু এর জন্য সমস্ত সংকীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে আমি কিছু সময়ের জন্য অতি সাধারণ রমণী হয়ে যাব। এরপর তুমি আমার কাছে আর এসো না, হারিয়ে যেও জনারণ্যে। আরো শুনবে ?

না। হয়ত তুমি ঠিকই বলছ হয়ত এটা আমার অবচেতন মনের এক সুপ্ত ইচ্ছার প্রতিফলন।

আমাদের কথোপকথন যখন চলছিল তখন এক সময় বাস যাত্রারম্ভ করেছিল, যেহেতু দিল্লীতে যানজট হয়ই না সেহেতু বাস বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে একভাবে ছুটছিল। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এক একটি দ্রষ্টব্যস্থানে পেঁছে যাচ্ছিলাম। ইণ্ডিয়া গেট, পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রপতি ভবন, রাজঘাট দেখে ঘাসের গালিচা পেরিয়ে আসলাম মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থলে। এখানে ব্রহ্মাকে অষ্টপ্রহর বন্দী করে রাখা হয়েছে। শান্তিবনের সবুজ ঘাসের গালিচার চারপাশে বাঁধানো পরিচ্ছন্ন সড়ক। এ সড়কের ধার ঘেঁষে ঘাসের গালিচার অনেকখানি অংশ জুড়ে বেশ কয়েকজন মহিলা চরকায় সুতো কেটে চলেছে ক্রমান্বয়ে। এতো মানুষ এখানে তবু বড় বেশি নিস্তব্ধ। এত মানুষের সমাগম সত্ত্বেও এমন শান্ত পরিবেশ হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। শান্তি বন থেকে বেরিয়ে সমস্ত দিনটা বাসে করে দিল্লীর পথে পথে ঘুরে বেড়ালাম। ফিরলাম যখন তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

॥ এগার ॥

এখন সন্ধ্যে সাতটা। চাচিজী, সুরেখা, বিয়াস, মাসিমা এবং সোনাবৌদি গল্প করছেন। মেসোমশাই ওদের হাত কয়েক তফাতে বসে শরীরতত্ত্বের উপর কোনো বিদেশী বইয়ের মধ্যে চোখ ডুবিয়ে রেখেছেন। আরো একটু তফাতে চন্দ্রা ওর মা-বাবার সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত। অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই এখন গা ছেড়ে দিয়ে প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আলোচনার বিষয়বস্তু রাজনীতি—সিনেমা—মূল্যবৃদ্ধি এবং বিবিধ। এদেরই মধ্যে কেউ কেউ গল্পের গরুকে গাছে তুলতে কসুর করছেন না। এর উপর সবজান্তার দল ত' আছেই। তারা না জানেন এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই। আমি একটা উপন্যাস খুলে বসেছিলাম। পড়বার সৎ ইচ্ছে যথেষ্টই ছিল কিন্তু শত চেষ্টাতেও ধারাবাহিক ভাবে পড়তে পারছিলাম না। কোনো কোনো সময় এক একটা লাইন দু'বার করে পড়ে মগজে ঢোকাতে হচ্ছিল। এই চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অনেক কিছু। মহিলা আসরের আলোচনার এবং কম্পার্টমেন্টের বাইরের আলোচনার বিষয়বস্তু আমার কানকে ঘন ঘন সজাগ করে তুলছিল। মনে মনে বললাম, চালচুলোহীন এককগুপ্ত এমন হাটে ভেসে না বেড়িয়ে পারে! এমন মানুষ এ সময় বই নিয়ে বসে কোন আক্কেলে! যেজন গল্পের গরু গাছে তোলে সে এমন কাজটি একক ব্যতীত সুসম্পন্ন

করে কী কোরে! বইটা বন্ধ করে আমার সংরক্ষিত জায়গায় রেখে পা বাড়িয়েছিলাম প্লাটফর্মে যাব বলে আর তখনই মনে পড়ল সেই উক্তিটির কথা— বউ আর বই একবার হাতছাড়া হোলেই তাকে ফিরে পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হয়। কথাটা মনে পড়তেই বইটা ব্যাগে ঢোকালাম। এরপর মনের সুখে যে গানটা গাইতে গাইতে হাটে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াই সেটা মনে মনে গাইতে গাইতে প্লাটফর্মে এসে হাজির হোলাম। আমি আসতেই শম্ভুবাবু আমাকে ডেকে তার পাশে বসালেন। আমি বসে পড়তেই উনি বললেন, আপনার লেখা আমার ভাললাগে, আপনার কার লেখা ভাললাগে?

বললাম, এত লেখকের লেখা ভাললাগে যে তাদের নাম বলতে গেলে আজ রাতের মধ্যে শেষ হবে কি না সন্দেহ আছে।

কয়েকজনের নাম বলুন।

বাংলা সাহিত্যে— শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেশ বোস, বিমল কর কত আর নাম করব। বিদেশী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাদের লেখা আমার ভীষণ ভাললাগে তাদের মধ্যে পাঁচ-সাতজনের নাম করছি— মোঁপাশা, টলষ্টয়, নভকভ, মেক্সিম গোর্কি এবং আগাথা ক্রিষ্টি। এবার বলুন ত' যাদের নাম করলাম তাদের কোনো লেখা আপনি পড়েছেন কি না এবং পড়ে থাকলে কার কোন বইটা আপনার সব চাইতে ভাল লেগেছে?

শম্ভুবাবু আমার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগই পেলেন না তার উত্তর দেয়ার আগেই চন্দ্রা ছুটতে ছুটতে এসে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল মহিলাদের আসরে। আমাকে ঐ আসরে আনার দায়িত্বটা ছিল চন্দ্রার উপর ঠিকই কিন্তু নির্দেশটা এসেছিল সোনাবৌদির কাছ থেকে। আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময়ে চন্দ্রা কথাটা জানিয়েছিল। আমি হাজির হয়েই বললাম, আপনাদের আসর ত' পুরুষ বর্জিত বলেই মনে হয়েছিল এরকম এক আসরে আমাকে আনা হোল কেন বুঝে উঠতে পারছি না।

সোনাবৌদি বললেন, সাহিত্যিকদের সর্বত্র বিরাজ করার অধিকার আছে।

এরকম অধিকার সাহিত্যিকদের দেয়া হোল কেন জানতে পারি?

সোনাবৌদিই আবার বললেন. তারা নারীর গোপন কথা জানে, তাদের কাছে কিছু লুকোবার উপায় নেই। চোখ-মুখ দেখে তারা মনের কথা পড়ে ফেলে। দর্পণের মতই সব কিছুকে প্রতিফলিত করে। দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কারো যেমন ভাবা উচিত নয় তার কোন অংশের প্রতিবিম্ব দেখা না যাক সেরকম

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, বুঝলাম এবার বলুন ত' এ অধমকে আপনাদের আসরে আমন্ত্রণ জানানো হোল কেন?

অসুখ করলে চিকিৎসকের ডাক পড়ে কেন? গৃহ নির্মাণ করতে হোলে রাজ-মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয় কেন? ঘর ছাইতে গেলে ঘরামীর আবশ্যক কেন তা আপনি জানেন না? আসর জমে কিসে বলুন ত'?—এবারের কথাগুলোও সোনাবৌদির মুখ নিঃসৃত।

কিসে ?—প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলাম আমি।

কথায়। হাতের কাছে কথাশিল্পী থাকতে তাকে ছাড়া এমন কাজ করতে যাব কেন আমরা !

সোনাবৌদির বক্তব্যের পর বিয়াস বলল, তোমার স্তুতি হচ্ছিল এতক্ষণ শুনতে চাও ?

আমি কৃত্রিম ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে বললাম, প্রশংসা শুনতে ভাললাগে না এমন মানুষ আছে কি না জানি না তবু বলব জানিও না কারণ শোনার পর যদি মাটিতে পা না পড়ে !

তাহোলে নিন্দেই শোন আমার কাছ থেকে, শুনে মন খারাপ করে বসে থাক। তোমার মত ভয়ঙ্কর মানুষের ধারে কাছে কারো আসা উচিত নয়। তোমাকে জানার পর বিয়াসের মত নির্বোধ মহিলা ছাড়া আর কেউ তোমার ধারে-কাছে আসবে কি না জানি না।

আমি বিয়াসের কথার উত্তরে বললাম, দুশমনি জমকর বরো, এ গুঞ্জা—

ইশ রহে

যব কভি হাম্ দোস্ত হো যায়েঁ তো –

সরমিন্দা না হো।

অর্থাৎ শত্রুতা করার সময় বন্ধু একটু ভেবে কোর। দেখো এমন নিষ্ঠুর হোয় না এবং এমন ভয়ংকর শত্রুতা কোর না যে পরে যদি আমরা আবার বন্ধু হয়ে যাই তখন লজ্জিত না হোয়ে উপায় থাকবে না।

তুমি আমার এমনি বন্ধু যে ইচ্ছে করলেও তোমাকে শত্রু করে তুলতে পারব না, শত্রুতা কীভাবে করতে হয় তা তোমার জানাই নেই সুতরাং উর্দু কবিতার পংক্তিটি এক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রযোজ্য। এ ব্যতীত তোমার শত্রুতা আমার কাম্য নয় বিশেষ এক কারণে।

কী কারণে তা কী ব্যক্ত করা সম্ভব ?

যে বাল্বটা জ্বালা আছে বলে আমরা পথ চলতে পারছি সেটাকে ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে ফেলব অতটা নির্বোধ আমি নই।

বিয়াসের কথা শুনে মাসিমা বললেন, ঠিকই, এককরা আছে বলে আমরা জানতে-শিখতে পারছি।—এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা হোচ্ছ জ্ঞানের আলো। তোমরা না থাকলে অন্ধকারে ডুবে থাকতে হোত আমাদের।

ছোট্ট একটা আধারে এত কিছু থাকতেই পারে না মাসিমা। আমি শুধু লিপিকার, যা দেখি যা শুনি তা লিপিবন্ধ করি। সেই লেখা কাউকে আঁধার থেকে টেনে তুলতে পারে এ বিশ্বাস আমার নেই।

আমাদের আছে।—সোনাবৌদি বললেন।

আপনারা আমাকে কাছে টানতে গিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছেন। এ রকম স্তুতি কাছে আসার সহজ রাস্তাগুলি নষ্ট করে দিতে থাকে। আমার মধ্যে কী আছে কী নেই সে প্রশ্নগুলিকে যদি দূরে সরিয়ে র‍্যাখা যায় তাহোলে একটা কথা বলতে পারি।

ঠোঁট কাটা মানুষ অপ্রিয় কথা বলতে ভয় পেয়ে ঘরের কোণ খুঁজে বেড়ায় না, তোমার যা বক্তব্য তা বলতে পার।—বিয়াস আমাকে খোঁচা দিয়ে তার মতামত জানাল।

আমি ওর খোঁচাটা নির্বিবাদে হজম করে আমার বক্তব্য পেশ করলাম, আমি সকলের কাছে কাছে থাকতে চাই, ধরা-ছোঁয়ার সীমানার মধ্যে। সকলের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে।

সুরেখা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি নীরব শ্রোতা হয়ে ছিল। আমার কথা সমাপ্তির পর প্রথম মুখ খুলল, বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে যে মসনদে বসিয়েছে তার থেকে নেমে আসা প্রায় অসম্ভব। একটা সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকবেই আমাদের সঙ্গে, ইট ইস একসিওমু, সতঃসিদ্ধ সত্য। এ সত্ত্বেও আমাদের নিজেদের তাগিদে আপনার ইচ্ছেটাকে আমরা স্বাগত জানবো।

আমি শুনতে শুনতেই মনে মনে সুরেখার কথার পৃষ্ঠে কী বলব ভাবছিলাম, ওর কথা শেষ হওয়ার পর মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার পূর্বে বিয়াস আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, সুরেখার কথার প্রতিবাদ করো না। আমি কেন বললাম একথা তা পরে জানতে পারবে।

চন্দ্রা তখন আমাকে আসরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছিল। এরপর আবার ফিরে আসল এইমাত্র। ও আসতেই আমি ওকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলাম। চন্দ্রা শুনে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু ওর বক্তব্য কী হোতে পারে অনুমান করে সকলেই গান গাইবার জন্য পেড়াপিড়ি করতে শুরু করল, ফলে সুরের মায়াজাল বিস্তার করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকল না ওর। চন্দ্রার গান শুনে আর জমিয়ে আড্ডা দিয়ে ভালই কাটল দিনটা। পরের দিন যথারীতি আমাদের বেরিয়ে পড়তে হোল। এ দিনে পূর্ববর্তী ঘটনার অর্থাৎ গত দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোল না, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাসে হাজির হোল। পরপর দু'দিনই দিল্লী দেখার পোগ্রাম ছিল, সেই অনুযায়ী প্রথম দিন নিউ দিল্লীতে কাটিয়েই সমস্ত দিন এবং আজ যা কিছু দর্শনীয় সবই ওল্ড দিল্লীতে। বাসের যান্ত্রিক শব্দ প্রথম বন্ধ হোল যে জায়গার কাছে সে জায়গার নাম লাল কেল্লা। লালকেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার যে পথ তার দু'ধারে রকমারি জিনিসের দোকান আমাদের সঞ্চারমান দৃষ্টি কেল্লায় ঢোকার সময় দোকাগুলোর ভেতরের সামগ্রীকে স্পর্শ করে যাচ্ছিল। কেল্লার ভেতরে আসার পর আমার মনে হোল পাথরের খাঁজে খাঁজে বন্দী হয়ে আছে অনেক কিছু। অনেক সুখ-দুঃখের কথকতা, বেগমদের ওড়নার খস খস শব্দ, মোগল হারেমের খোজা প্রহরীর তরবারির ঝংকার আর হারেমের কান্না। প্রতিক্ষণেই ফিসফিস্ গুঞ্জন কানে বাজছিল বলে মনে হচ্ছিল। বাতাস যেন এখনো আতরের গন্ধে ম ম। আমরা হেঁটে চল্লিশজন একসঙ্গে, একটার পর একটা দ্বার অতিক্রম করে, কক্ষ অতিক্রম করে আসছি অন্য কক্ষে। বিকাশবাবু বলে চলেছেন কেল্লার ইতিহাস। তার কথা শুনে মনে হচ্ছিল ইতিহাসের পাতা

থেকে বেরিয়ে এসে হাজির হচ্ছে অনেক চরিত্র। কথা বলতে বলতে বিকাশবাবু এগোচ্ছিলেন, আমরা তাকে অনুসরণ করে কর্ণদ্বয়কে সজাগ রেখে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ বিকাশবাবু এক জায়গায় আসার পর দাঁড়িয়ে পড়লেন এরপর আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, ইতিহাসের বহির্ভূত একটা গল্প শোনাব আপনাদের। ইতিহাস বহির্ভূত হোলেও সে কাহিনী যে মিথ্যে এ কথা বলা বোধহয় ঠিক হবে না। অনেক কিছুই আছে যা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি তাই বলে সে সব কাহিনী মিথ্যে একথা বলা চলে না। গল্পটা জানতে পেরেছিলাম এক গাইডের কাছ থেকে। মুখে মুখে বলে আসছিল সে কাহিনী বংশপরম্পরায়।—এ পর্যন্ত বলে একটা সুউচ্চ প্রাকারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে বলে, একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর নিশ্চয়ই আপনাদের চোখে পড়ছে? এই প্রাচীর টপকে নিচে কিম্বা উপরে উঠে আসা প্রায় অসম্ভব অথচ এক তরুণ তার প্রেয়সীকে নিয়ে এই দেয়াল টপকেই নিচে নামার চেষ্টা করেছিল। মহম্মদ সেলিম স্বপ্ন দেখত আয়েশাকে নিয়ে ঘর বাঁধার। মোঘল হারেমের সদ্য প্রস্ফুটিত এক তরতাজা গোলাপ আয়েশা। সেলিমের কাছে সে ডানাবিহীন হুরী। ওদের অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে লোকচক্ষুর আড়ালে কেল্লারই কোনো নিভৃত স্থানে। দুজন দু'জনার চোখে খুঁজেছে অনেক কিছু, অনেক অব্যক্ত কথা জানতে চেয়েছে একে অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে। খোজা প্রহরীকে উৎকচ দিয়ে সেলিম আর আয়েশা তাদের মিলনের পথটিকে সহজ করে নিয়েছিল। খোলা আকাশের নিচে কেল্লার কোনো নিভৃত কোণে বসে হয়ত সেলিম আয়েশাকে বলেছে,

টুটতে হ্যায় রাত ভর তারে এ রুঅব—
হুস্ন হ্যায়
বেখবর ইউ কোঠে পর না সোনা
কিজিয়ে।

এই যে অনন্যা রূপবতী তিলত্তমা প্রেয়সী আমার, তুমি উন্মুক্ত ছাদে শুতে যেও না। তুমি টের পাওনি, তুমি ত' নিদ্রার কোলে সুপ্ত ছিলে—তোমার রূপের আগুনে পাগল হয়ে সারা রাত কত তারা যে তোমার কাছে আসতে গিয়ে কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে ছুটে আকাশ থেকে খসে গিয়ে ভস্ম হয়ে গেছে, তুমি জান কী? আবার কখনো হয়ত বলেছে,

জিনে না দেঙ্গী আঁখ তেরী
দিলরুবা মুঝে
ইন খিড়কিয়োঁ মে ঝাঁক রহী
কজু মুঝে।

তোমার দু'নয়ন আমাকে বাঁচতে দেবে না। তুমি যখন তাকাও তখন তোমার ঐ চোখের জানালার ভেতর থেকে আমি মৃত্যুকে উঁকি দিতে দেখেছি। হে প্রেয়সী তোমার চোখেই আমি দেখেছি আমার সর্বনাশ। এ সব শুনে আয়েশা হয়ত

অস্থির হয়ে উঠত, হয়ত প্রিয়তমের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার সুখ পেতে চাইত। চাইত যে তার প্রমাণ মেলে এ কাহিনীতে। আয়েশা বুঝেছিল এভাবে আর নয়, এখন থেকে নির্ভয়ে শুনতে হবে সেলিমের হৃদয়ের ভালবাসার কথা, বুক কান পেতে, তার কণ্ঠলগ্না হয়ে। কোনো ভয় থাকবে না, কেউ বাধা দিতে আসবে না। আর এই কারণেই সেলিমের সাথে পালিয়ে যেতে চাইল কেল্লা থেকে, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর টপকে। এক অমাবস্যার রাতের সূচীভেদ্য অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দড়ির সাহায্যে অনেকটা নেমে এসেছিল ওরা কিন্তু শেষ রক্ষা হোল না ধরা পড়ে গেল। সাহজাহান হুকুম দিলেন ওদের জীবন্ত সমাধিস্থ করার জন্য—এ পর্যন্ত বলার পর বিকাশবাবু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, এ কেল্লারই কোনো এক স্থানে ওরা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল। এ কাহিনী যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকেই অবাক হয়ে নিশ্চয় ভাবতে শুরু করব যে মানুষটা ভালবাসার মর্যাদা দিতে গিয়ে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য সৃষ্টি করে তাজমহল তৈরি করলেন সে এ কাজ কী করে করল!—এ পর্যন্ত জানানোর পর বিকাশবাবু আবার যেন ইতিহাসের বইটা হাতে তুলে নিলেন। দারা, সুজা, জাহাঙ্গীর, জাহানারা, রোশনারা, সাহাজাহান প্রত্যেকের কাহিনী বাজতে থাকল তার কণ্ঠে।

লালকেল্লার পর আমরা আসলাম কুতুবমিনারে। অভ্রভেদী এই মিনারের কাছে দাঁড়িয়ে বিয়াসকে বললাম, আমার সঙ্গে যদি একটু কষ্ট স্বীকার করতে রাজী থাক তাহলে তোমাকে একটা উপহার দিতে পারি।

বিয়াস তার মতামত ব্যক্ত করার আগেই সোনাবৌদি বললেন, আমরা কী দোষ করলাম যে আমাদের ভাগ্যে ওরকম কিছু জুটবে না!

বললাম, বেশ সকলেই সেই উপহারের ভাগ পেতে পারেন। এবার বলি উপহারটা কী—এক মুঠো আকাশ, এখন······

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে বিয়াস বলে উঠল, অসম্ভব, সিঁড়ি ডিঙোবার ক্ষমতা আমার নেই।

আমরা যখন কথা বলাবলি করছিলাম তখন একটা ছেলে আমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, যেহেতু আমরা কথায় ব্যস্ত ছিলাম সেহেতু ওর মুখ বন্ধ ছিল। অপেক্ষা করছিল আমাদের কথোপকথন শেষ হোলেই ও মুখ খুলবে বলে, আমি ওর মনভাব আগেই টের পেয়েছিলাম আর সেজন্যই বিয়াসের কথা শেষ হোতে না হতেই ওকে প্রশ্ন করলাম, কিছু বলবে?

হাঁ স্যার, আপনাকে আমি অনেক করে দিতে পারি। শুধু আপনাকেই নয়, সবাইকে সব কিছুকে অনেকগুলো করে দিতে পারি—বলে একটা রঙিন কাঁচ আমার হাতে ধরিয়ে দিল। এরপর কাঁচটার গুণাগুণ এবং দক্ষিণার কথা জানিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে কাঁচটা চোখের কাছে এনে দেখলাম আমার দৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ধরা পড়ছে তাই অনেক অনেক হয়ে যাচ্ছে। বিয়াস

আমার হাত থেকে কাঁচটা নিয়ে ওর চোখের সামনে ধরল, ধরেই বলল, এ সর্বনাশা বস্তুটি বিদায় করতে হবে।

যেভাবে বিয়াস বলল তাতে সকলেই বিস্মিত হোল। আমি বললাম, কী ব্যাপার বিয়াস, কী হয়েছে?—বিস্মিত আমিও কম হইনি।

এক একক গুপ্তকে নিয়েই সবাই ব্যতিব্যস্ত তার উপর এতগুলো—আমাদের হাল কী হবে ভাব ত! নির্ঘাত কথার সাগরে ডুবে মরব।

বিয়াস কাপুর বর্ণচোরা নয়। তাকে ডুবিয়ে মারা সহজ নয়।

সোনাবৌদির অঙ্গে এখন হাসি-খুশির উত্তরীয়টা রয়েছে তাই আমার কথার পর বললেন, আমি বিয়াস কাপুরও নই, সুরেখা কাপুরও নই, আমার অবস্থাটা কী হবে বলুন ত'?

চন্দ্রা কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল সোনাবৌদির কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলল, বিয়াসদি ওটা আমাকে দাও, আমি সোনাবৌদি নই বিয়াসদি নই এবং সুরেখাদিও নই সুতরাং আমার কোনো ভয় নেই, আমি কোনো কঠিন কথা বলিও না বুঝিও না অতএব আদার ব্যাপারী আমি জাহাজের খবরের প্রয়োজন আমার নেই—কাঁচটা দাও,—বলেই বিয়াসের হাত থেকে কাঁচটা নিল।

চাচিজী আমাদের এক সহযাত্রী ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। যদিও তিনি আমাদের কাছ থেকে খুব দূরে ছিলেন না তবু তার মুখের সামান্য অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। আমাদের বিপরীত দিকে তার মুখ ছিল, হঠাৎ তিনি দৃষ্টি ফেরালেন আমাদের দিকে, ফিরিয়ে বিয়াস আর সোনাবৌদিকে কাছে ডাকলেন কোনো কিছু বলার জন্য। ওরা চলে যেতেই আমি কৃষ্ণাদেবীর কিছুটা নিকটবর্তী হোলাম। কৃষ্ণাদেবীর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন মাঝে মধ্যে সুরেখার সঙ্গেও আমার কিছু কথা বিনিময় হচ্ছিল।

আমরাও আর মাত্র কটা দিন একসঙ্গে আছি তারপর যে যার গৃহে। যাবার সময় মনের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়—আপনার হয় না এককবাবু?—প্রশ্ন করলেন কৃষ্ণাদেবী।

বললাম, হয় না আবার! বোধহয় আপনাদের থেকেও আমার মনের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায় বেশি। দু' চোখের তৃষ্ণা না মিটিয়ে ঘরে ফেরার জ্বালা অন্তর জুড়ে।

ফিরতে ত' হবেই না ফিরে উপায় নেই, গৃহের বন্ধন যে! এ বন্ধনে বাঁধা পড়েনি এমন মানুষ ক'জন! মানুষই বা বলি কেন পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ সকলেই এ বন্ধনের নাগপাশে বাঁধা, গৃহের বন্ধন যে-সে কথা নয় তাকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় এমন দুঃসাহস যার তার কপালে কী জোটে তা জানতে বাকি নেই আমার, কখনো তাকে শুনতে হয় স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রীক নামক কথার কষাঘাত আবার কখনো রক্ত-মাংসের মানুষের পরিচয়টুকুও জুটতে চায় না। 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ' এ কথা যেজন বলে সেজনের গৃহের বন্ধন ছিঁড়ে গেছে কিন্তু এরকম

গৃহের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাই না আমি। গৃহের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ি আমি কিন্তু ছেঁড়ার কাজটি শেষ করে বেরিয়ে পড়ি না, বার বার বন্ধন আর ছিন্ন হওয়ার কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকি। আমি বলি যারা গৃহের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে তারা অসাধারণ। তারা মুক্তপুরুষ। এই মুক্তপুরুষ হওয়াটা সহজ কথা নয়, অনেক বন্ধন ছিঁড়ে অবশেষে গৃহের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে যে পারে একমাত্র সে ঐ আখ্যা পেতে পারে। আমি মুক্তপুরুষ নই, আমার গৃহের আকর্ষণ বার বার ছিন্ন হয় বাইরের আকর্ষণে।

আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে, কী করা যায় ?—সুরেখা প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকল।

বললাম, বলুন-না এত দ্বিধা কেন আমরা ত' এক সঙ্গে সাত পা'র বেশি হেঁটেছি। বাংলায় যে প্রবাদটা আছে সে প্রবাদ অনুযায়ী আমরা বন্ধু।

আমার প্রায়ই মনে হয় গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি, তলিয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত, অন্ধকারের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে, এভাবে অনেক স্তর অতিক্রম করে ডুবে যাবার সময় মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, দু'-হাত বাড়িয়ে দি সাহায্যের আশায় কিন্তু কে সাহায্য করবে ; বেশ কয়েক দিন ধরে বুঝতে পারছি এরকম যখন হয় অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেতে থাকি বলে যখন মনে হয় তখন কে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে ভয় কী সুরেখা আমি আছি। বলতে পারেন কার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই বলে মনে হয় ?

আমার মনে হয় সুরেখার প্রশ্নের উত্তর আমি জানি। অজানা রহস্যের মধ্যে ডুবে যায় সুরেখা আবিষ্কারের আশায়, রহস্য যখনই অজানা তখনই অন্ধকার। রহস্যের খোঁজের যত ছটফটানি বাড়ে ততই সে অন্ধকারে ডুবতে থাকে। রহস্যটা যখন আর অজানা থাকে না তখন আঁধারও থাকে না, যে কণ্ঠস্বর ওকে আশ্বস্ত করছে বলে মনে হচ্ছে ওর তা অজানা কথাটা বিলুপ্ত হওয়ার সংকেত। জানালাম সুরেখাকে। এরপর ওকে বললাম, একটা শায়ের শুনবেন ?—প্রশ্ন করলেও উত্তরের প্রতীক্ষায় না থেকে বললাম,

আচ্ছা হ্যায় দিলকে পাস রহে পাসবানে-অকল্
লেকিন কভি কভি ইসে তনহা ভী ছোড়িয়ে।

এর অর্থ—হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির বাস সেটা ভাল কথা কিন্তু মাঝে মাঝে হৃদয়ের উপর থেকে বুদ্ধির শাসন তুলে দিতে হয়, হৃদয়কে স্বাধীন করে দিতে হয়, মুক্ত করে দিতে হয়। স্বাধীন মুক্ত হৃদয়ের ধর্মকে সব সময় বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে নেই।

আমার কথার পর সুরেখা কিছু বলতে গিয়েও বলল না, আমাকে একটা হাসি উপহার দিয়ে কৃষ্ণাদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি কিছু বলছেন না যে কৃষ্ণাদেবী।

অল্প পড়াশোনা জানা কোনো মেয়েরই এসময় মুখ খোলা উচিত নয়।—কথাটা বলে কৃষ্ণাদেবী হাসতে থাকলেন।

প্রায় মিনিট কুড়ি সময় কুতুবমিনার দেখে আর কথার আদান-প্রদান করে সময় অতিবাহিত করে বাসে ফিরলাম আমরা।

॥ বারো ॥

রাত দশটার পর আবার যাত্রা শুরু। দিল্লী থেকে মথুরার দূরত্ব খুব বেশি নয়, সেই রাত্রেই পৌঁছলাম মথুরায়। যখন পৌঁছলাম তখন সকলেরই চোখে ঘুম ভালমতন জড়িয়েছে, এমনকি যার চোখে ঘুম আসার কথা নয় তার চোখেও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ঘুম! চাচিজী পর্যন্ত দু'চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। আজ প্রথম দেখলাম রাত্রে চাচিজীর নাসারন্ধ্র থেকে হাল্কা একটা ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বেরোতে। আমি শুধু একা জেগে নিশাচরদের ভাষা, তাদের চলাফেরার শব্দ শুনতে থাকলাম।

নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আমাদের খুব ভোরে বেরিয়ে পড়তে হোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মথুরায় কংসের কারাগার দেখে বৃন্দাবনে চলে আসলাম। মনে মনে ভাবি এ তীর্থে আসার জন্য না জানি কতজন দিন গুণছে, কতজন তিলে তিলে অর্থ সঞ্চয় করে চলেছে কৃচ্ছ্রসাধন করে। এই সেই তীর্থ যেখানে শত-সহস্র নরনারী আসছে প্রতিদিন। এই পুণ্যভূমিকে ঘিরে কত যে কাহিনী আছে তা বলে শেষ করা যাবে কিনা জানা নেই, সে সব গল্পের কিছু কিছু অংশ শুনতে পাচ্ছিলাম বিকাশবাবুর মুখ থেকে। শ্রীকৃষ্ণকে একবার এই বৃন্দাবন ত্যাগ করে উড়িষ্যায় যেতে হয়েছিল এক ব্রাহ্মণের হয়ে সাক্ষী দিতে। বহু যুগ পূর্বে পদব্রজে আসতে হোত বৃন্দাবনে, ঐভাবে দুই ব্রাহ্মণ বেরিয়েছিল তীর্থে। একজন যুবক আর অন্যজন বার্ধক্যে জরাজীর্ণ। যুবক নিম্ন শ্রেণীভুক্ত আর বয়ঃজ্যেষ্ঠজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। অনেক ব্যবধান তাদের মধ্যে তবু এক উদ্দেশ্যে একই প্রভুর দর্শন লাভের আশায় চলেছে দু'জন দু'জনার সঙ্গী হোয়ে। ঘুরতে ঘুরতে তারা আসে বৃন্দাবনে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন রোগে আক্রান্ত। যুবক পথের ক্লান্তি ভুলে শুশ্রূষা করতে থাকে তার সঙ্গীকে সুস্থ করে তোলার উদ্দেশ্যে। তার প্রচেষ্টায় আস্তে আস্তে বয়ঃজ্যেষ্ঠ সুস্থ হয়ে ওঠে। নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণকে জানায় দেশে ফিরে সে তার কন্যাকে তুলে দেবে তার হাতে। কিন্তু দেশে ফেরার পর এ অঙ্গীকারের কথা অস্বীকার করে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যুবক রাজার কাছে অভিযোগ করে। রাজা এ সমস্যার সমাধানের জন্য একজন সাক্ষী আনতে বলে তাকে। বৃদ্ধ অঙ্গীকার করেছিল গোপালের মন্দিরে এবং অধিক রাত্রে। সে সময় তাদের কথোপকথন অন্য কারো শোনার কথা নয় সুতরাং সাক্ষী বলতে একমাত্র গোপাল। নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যুবকটি নিরুপায় হোয়ে গোপালকেই ধরে বসল সাক্ষী দেবার জন্য। গোপাল রাজী হয় তবে শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে, যখন গোপাল সাক্ষ্য দিতে যাবে তখন কোনো কারণেই পিছন ফিরে দেখবে না যুবক। যুবক জানতে চায় গোপাল যে তাকে অনুসরণ করে আসবে তা সে জানবে কীভাবে। এর উত্তরে

গোপাল বলে, আমার হাতে থাকবে বাঁশি এবং পায়ে বাঁধা থাকবে ঘুঙুর। বাঁশি আর ঘুঙুরের শব্দে জানতে পারবে আমার উপস্থিতি। শর্ত মেনে যুবক আসে উড়িষ্যায়। ভুবনেশ্বরে যখন আসে তখন বাতাসের দাপটে বাঁশির শব্দ পৌঁছায় না ব্রাহ্মণের কানে আর সেই সঙ্গে ঘুঙুরে বালি ঢোকার জন্য সে শব্দও শুনতে পায় না। সন্দেহ জাগে মনে, ভুলে যায় শর্তের কথা, ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করে গোপালকে। সঙ্গে সঙ্গে গোপাল কালো বর্ণের মূর্তি হয়ে থেকে যায় সেখানে। সেই স্থান এখন তীর্থক্ষেত্র, নাম সাক্ষীগোপাল। এ কাহিনীর পর অন্য কথা পারলেন বিকাশবাবু, জানালেন বৃন্দাবনের সোনার তালগাছের কথা। যে গাছটাকে সকলে সোনার তালগাছ বলে জানে আসলে তা একটা স্বর্ণস্তম্ভ। স্বর্ণস্তম্ভ বলাও ঠিক নয় ওটা স্বর্ণাভ স্তম্ভ। বিকাশবাবুর বক্তব্য শুনতে শুনতে বৃন্দাবনের রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পর আমরা একটা ভগ্ন দেউলে এসে উপস্থিত হোলাম। মন্দিরের দরজা অনেক দিন পূর্বেই অদৃশ্য হয়েছে। বিগ্রহও অনুপস্থিত। কালাপাহাড়ের কবল থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে জয়পুরে। এতক্ষণ বিকাশবাবুর কণ্ঠ গর্জাছিল এবার প্রফেসর আশুতোষ তালুকদার অর্থাৎ চন্দ্রার শীলভদ্র কালাপাহাড় সম্বন্ধে অনেক তথ্য পরিবেশন করতে শুরু করলেন। কালাচাঁদ ছিল এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যুবক। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে কাশীর গঙ্গার পবিত্র সলিলে অবগাহন না করে জল পর্যন্ত মুখে দিত না। প্রতিদিনের মতন একদিন গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরছিল কালাচাঁদ। ঐ সময় শাহাজাদী শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছিল। গজের পিঠে শাহাজাদী আর রাস্তার একপাশে অনেক লোকের ভিড়ে কালাচাঁদ। ভিড়ের মধ্যে কালাচাঁদ হারিয়ে ছিল কিন্তু শাহাজাদীর দৃষ্টি তার কাছে এসে থমকাল। শাহাজাদী বুঝল এরকমই একজন তার স্বপ্নের মানুষ, এ মানুষই একমাত্র তার হৃদয়েশ্বর হোতে পারে। প্রথম দর্শনেই প্রেম। দেখেই তাকে লোক মারফৎ কাছে ডেকে আনে শাহাজাদী। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে আহ্বান জানায়। এ সংবাদ চাপা থাকে না, বাদশার কানে পৌঁছায়। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় কালাচাঁদ। তাকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে সংবাদ শাহাজাদীর কানে পৌঁছতে দেরি হয় না। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটে যায় কালাচাঁদের কাছে এবং দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, আমাকে হত্যা না করে ওকে কেউ বধ্যভূমিতে নিয়ে যেতে পারবে না। নিরুপায় হয়ে বাদশা শাহাজাদীর সঙ্গে তার বিয়ে দেয়। ধর্মান্তরিত হয়ে কালাচাঁদ হয়ে যায় কালাপাহাড়। কিছুদিন পর কালাপাহাড় স্বধর্মে ফিরে আসতে চায় কিন্তু তৎকালীন পণ্ডিতরা তাকে আর ফিরে আসতে দিতে রাজী হয় না। এর ফলে কালাপাহাড় হয়ে ওঠে প্রচণ্ড হিন্দু-বিদ্বেষী। কত অসংখ্য মন্দির তার রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরকে ধ্বংস না করে ছাড়ত না কালাপাহাড় যদি না তার পিসিমা বাধা দিতেন। কালাপাহাড়ের পিসিমা বিশ্বনাথের মন্দিরের

শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তাকে না হত্যা করে এ মন্দির ধ্বংস করতে পারবে না কালাপাহাড়। এ কাহিনী ভগ্ন মন্দিরে প্রবেশ করার পর শুরু হয়েছিল এবং পরিত্যক্ত মন্দিরটা থেকে ফেরার সময়ও সে কাহিনী চলছিল। প্রফেসরের কণ্ঠস্বর থামার পর বিকাশবাবু আবার শুরু করলেন। জানালেন বঙ্কুবিহারীর মাহাত্ম্য। বৃন্দাবনের এক জাগ্রত বিগ্রহ বঙ্কুবিহারী। সকলেই বিশ্বাস করেন এই বিগ্রহের কাছে ভক্তিভরে কোনো কিছুর জন্য আর্জি জানালে তা পূর্ণ হয়। পূর্ণ হয় কী হয় না জানিনা তবে মন্দিরে প্রবেশ করার পর মনে হোল কিছু চেয়ে বসি। কী চাইব বুঝে উঠতে পারলাম না, তাছাড়া ঈশ্বর আছেন কী নেই সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি এখনো, মনের এই দোদুল্যমান অবস্থায় ভক্তি থাকতে পারে না। সুতরাং ভক্তিসহকারে কোনো কিছুর জন্য আর্জি জানানো চলে না। আমি বিগ্রহের কাছে কিছু না চাইলেও দৃষ্টি সরাতে পারলাম না বিগ্রহের উপর থেকে। অনেককেই দেখলাম করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত মনবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার বাসনা নিয়ে কত কী যে বলছে বিগ্রহের কাছে তার ঠিক নেই। সুরেখাকেও দেখলাম নিষ্পলক চোখে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকতে। যদিও ওর হস্তদ্বয় যুক্ত নয় তবু ওর অন্তরে ভক্তির অভাব আছে বলে মনে হোল না। হয়ত ঐ ভাবে অপলক চোখে তাকিয়ে মনে মনে কোনো কিছুর জন্য সেও আকুতি জানাচ্ছে। মন্দির থেকে বেরোবার পর সুরেখাকে প্রশ্ন করলাম। জানতে চাইলাম আমার অনুমান ভুল না নির্ভুল। উত্তর আসল নির্ভুল। সুরেখা উত্তর দিয়ে হাসল। সূর্যাস্তের সময় দিগন্তে ক্ষীণ আলো যেভাবে ছড়িয়ে থাকে গাছ-গাছালির মাথায় সেভাবে একটা হাসি ভেসে উঠল দু'ঠোঁটের মাঝে। এই হাসির স্থায়িত্ব খুব বেশিক্ষণের ছিল না তবু এ হাসি আমার পরিচিত নয় এটা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হোল না। মনে হোল এ হাসি যথেষ্ট অর্থবহ।

কীসের প্রত্যাশায় ?—প্রশ্ন করলাম আমি।

আপনাকে বলা যাবে না।—প্রশ্নের উত্তর দিল সুরেখা।

হাসিটা সম্পূর্ণ ঠোঁট থেকে মুছে গেছে কি না দেখার জন্য পূর্ণ দৃষ্টি ফেললাম ওর মুখের উপর। ওকে অন্যরকম মনে হোতে থাকল। এরূপ ইতিপূর্বে দেখেছি কিনা পরখ করে দেখার জন্য চোখ সরাতে পারলাম না ওর মুখের উপর থেকে। মনে হোল ওর এ রূপ আমার দৃষ্টিতে কখনো ধরা পড়েনি। ফেরার সময় কতবার যে ওকে আমার মস্তিষ্কের গবেষণাগারে নিয়ে ফেলেছি তার ঠিক নেই। খুব বেশি কথা হয়নি আমাদের তবু মনে হোল সুরেখা যেন কথার ভাণ্ডার উজার করে দিল আমার কাছে, যেন নতুন এক শব্দ-তরঙ্গের মধ্যে টেনে নামালো আমাকে। আমরা দু'জন দুটি কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ছুটেছি বেশ কয়েকদিন, কাছাকাছি আসতে গিয়েও আসতে পারিনি, সংঘর্ষের ভয়ে অস্থিরতা ছিল দুটো গ্রহেরই, এখন হয়ত সে অস্থিরতা বিলুপ্ত হোতে চলেছে; বুঝে উঠতে পারি না অচেনা কক্ষপথ ধরে গ্রহ দুটি এক সঙ্গে চলার সংকেত পেল কি না। যদি সেরকম হয় তাহোলে সময়টা

কতক্ষণের ? কতকালের ? এরকম একটা প্রশ্ন ভাবিয়ে তুলবে আমাকে। গ্রহ দুটি কাছাকাছি যদি এসে থাকেও বা আসার সম্ভাবনা থাকেও, তাদের এই কাছাকাছি থাকার স্থায়িত্বটা খুব বেশিক্ষণের হোতে পারে না আমি জানি। হয়ত এটাই বিধির বিধান। মনে ভাবি অনেক কথা, আমার অমৃত কলসটা কতটা পূর্ণ হয়েছে এ ক'দিনে তা বুঝে নিতে চাই। আজই-বা কতটা ভরে উঠল সে কথাও মনে জাগে। সেই সঙ্গে মনে উদয় হয় গৃহের বন্ধনে বাঁধা পড়তে হবে তারপর আবার তাকে ছিঁড়ে অমৃত কলসটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আনন্দ ছড়াবে মনে।

কী ভাবছেন ?—প্রশ্ন করল সুরেখা।

কী ভাবছি সে কথা বলি কী করে ! কী করে বলি আমার মনের মধ্যে একটা গান সব সময় বেজে চলেছে—আমার নয়নের মণি নীলমণিরে কোথায় গেলে দেখতে পাব। এ কথাও বলি কী করে যে আমার অন্তর জুড়ে শুধুই হাহাকার, দু'চোখের তৃষ্ণায় আমি দিশেহারা। আমার অমৃত কুম্ভটি পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়াই, মানুষের মনে ডুব দি, কাছে টানি তাদের। বলতে পারি না, সুরেখা আমার এ অমৃত কুম্ভটি যতটা পার পূর্ণ করে দাও। বলতে পারি না বলে অন্য কথা পারতে হয় আমাকে, বলি ভাবার কী অন্ত আছে, বিশ্ব-সংসার নিয়ে ভাবি, মানুষকে নিয়ে ভাবি।—এরপর আরো কয়েক পা নীরবে পথ চলি তারপর বলি, আপনাকে নিয়েও ভাবার আমার অন্ত নেই।

কথাটা শুনে ওর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া হোল কি না বোঝা গেল না, যে ভাবে পথ চলছিল সেভাবেই চলতে থাকল। হয়ত ও কিছু বলত কিন্তু তার পূর্বেই আমাদের সহযাত্রীদের ভিড় ভেসে এলো আমাদের উপর। সেই ভিড়ের ঢেউয়ে আমরা দু'জন দু'দিকে ভেসে গেলাম।

পরের দিন আমরা এসে পোঁছলাম আগ্রায়। এ দিনটিতেও আমাদের পোঁছতে পোঁছতে রাত হোল। সমস্ত রাত বিশ্রামের পর প্রত্যুষে আবার যাত্রা শুরু। প্রথমে বাস এসে থামল আগ্রাফোর্টের অমর সিং গেটের কাছে। দিল্লীর লালকেল্লার প্রায় সমকক্ষ এই ফোর্টটি। এরও নাম লালকেল্লা। আগ্রাফোর্ট দেখে আমাদের আগমন হোল সেকেন্দ্রাতে—আকবরের সমাধিক্ষেত্রে। সেখান থেকে এতামাদ্দৌলার সমাধি হয়ে ঠিক দুটোয় এসে পোঁছলাম ফতেপুর-সিক্রিতে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বার অতিক্রম করে আমরা সিক্রির ভেতরে যখন এসে পোঁছলাম তখন সূর্যের তাপে সমস্ত কিছু যেন জ্বলছে, লাল পাথরের এই প্রাসাদটিতে পা রাখতেই যা কষ্ট হচ্ছিল তা কহতব্য নয় তার উপর এই প্রাসাদটা ঘুরে দেখা যে কী কষ্টের তা বলে বোঝানো রীতিমত কঠিন কাজ। ভারতবর্ষের রাজধানী একবার স্থানান্তরিত হয়েছিল, কয়েকদিনের জন্য হোলেও ফতেপুর ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল এ কথা ক'জন জানে আমি জানি না তবে আমার জানা ছিল না। জানলাম বিকাশবাবুর কাছ থেকে। জলকষ্টের জন্য ফতেপুর থেকে রাজধানী ফিরে আসে স্বস্থানে। ফতেপুর সিক্রি থেকে বেরিয়ে সেলিম চিস্তির সমাধি হোয়ে আমরা ফিরে আসলাম আস্তানায়।

সন্ধ্যের পূর্বে সর্বশেষ দর্শনীয় স্থানটির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কী বারকয়েক তাজমহল আমি দর্শন করেও তৃপ্ত হোতে পারিনি, আমার কাছে তাজমহলের আকর্ষণ কতখানি তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। আর এই কারণেই বার বার ছুটে ছুটে আসি এখানে।

মুসম্মানবার্জ হয়ে আমরা আসলাম তাজমহলে। তাজমহলে আসার পূর্বে মুসম্মানবার্জের যে কক্ষে সাহাজাহান বন্দী হয়ে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে চাচিজী বলেছিলেন, অদ্যই শেষ রজনী। এবার ঘরে ফেরার পালা। এই যে এতজন এক-সঙ্গে থাকলাম, ঘুরলাম এ ক'দিনে—ফিরে গিয়েই হারিয়ে যাব আমরা, কে কোথায় চলে যাব তার কী ঠিক আছে। একক তুমি হারিয়ে যাবে না ত'? অন্তত তুমি হারিয়ে যেও না। পথের আলাপ পথেই শেষ করে দিও না।

এ অনুরোধ এই প্রথম নয় অনেকেই জানিয়েছে ইতিপূর্বে কিন্তু চাচিজীর আকুতি আমার মনে ঝড় তুলল। বার বার বন্ধনের ভয়ে পথের আলাপকে পথেই শেষ করে দি। দু'চোখে যার তৃষ্ণা সে ত' বন্ধনকে ভয় পাবেই তবু এবার যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল, প্রশ্ন জাগল মনে—এবারের বন্ধন ছিঁড়ে কী কখনো বলতে পারব আমি যাযাবর, মানুষের মনে বিচরণ করি, হাটে-গঞ্জে ঘুরি, সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে অমৃতের সন্ধানে ভেসে চলি একস্থান থেকে আরেক স্থানে। কোনো বন্ধনেই আমি বাঁধা পড়তে পারব না।

চাচিজীর কথার জবাব তখন দিতে পারিনি তাজমহলে আসার পর বলেছি, চাচিজী এবার গৃহে ফেরার পর হয়ত বলতে পারব, ম্যায় আপনে ঘর মে-হী আজনবী হুঁ আকর—

মুঝে ইহা দেখ কর, মেরী রূই ভর গই হ্যায়
সহমুকে সব আরজুওঁ কোণে মেঁ যা ছুপা হ্যায়
লবে বুঝা দি আপনে চেহেরোঁ কী হসর তৌনে
কি সৌক পহচানতা নহীঁ হ্যায়
সবাদেঁ দেহলজ হী সব রুখকে মর গই হ্যায়
ম্যায় কিস তনু কী তলাশ মে ইউঁ চলা যা ঘর সে
কী আপনে ঘর মেঁভী আজনবী হো গয়া হু আকর।

এর অর্থ—নিজের ঘরে এসে দেখেছি আমি নিজের ঘরেই পর হয়ে গেছি। অপরিচিত হয়ে গেছি। আমাকে দেখে আমার আত্মা ভয় পেয়ে গেছে, আমার ইচ্ছেগুলো ভয়ে কোণে গিয়ে লুকিয়েছে, আমার আশার মুখ বন্ধ করে মৌন হয়ে রয়েছে। আমার সখগুলো আমাকে চিনতেই পারছে না আর আমার স্বপ্নের ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে মরে পড়ে রয়েছে। এ আমি কোন দেশের খোঁজে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম যে নিজের ঘরে ফিরে এসে এমন অপরিচিত হয়ে গেলাম।

তোমার কথায় কী বুঝব একক! এ যদি আমার প্রশ্নের উত্তর হয় তাহোলে তোমার কথার মধ্যে আমার উত্তরটা কী ভাবে আছে তা ভেবে দেখতে হবে। যদি

তুমি পথের আলাপ পথেই শেষ করে দিতে চেয়ে এমন ভাবে উত্তর তৈরি করে থাক সে তার অন্তরনিহিত অর্থটা আমি সহজে উন্ধার করতে পারব না এবং যেহেতু উন্ধার করতে পারব না সেহেতু প্রশ্নটা বার বার করে তোমাকে বিব্রত করার সুযোগ থাকবে না আমার।

আমি বললাম, আমাকে ভুল বুঝবেন না চাচিজী আমি সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি। আপনার প্রশ্নটা করাই উচিত হয়নি কারণ এ প্রশ্ন আপনি ইতি-পূর্বে করেছিলেন এবং তার উত্তর পেয়েছিলেন।

বিয়াস দ্রুত পদক্ষেপে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। ওর ও ভাবে আসা দেখেই বুঝেছিলাম কিছু বলবে। আমার অনুমান যে ভ্রান্ত নয় তা প্রমাণিত হোতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হোল না, বিয়াস এসে আমার উদ্দেশ্যে বলল, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে এস আমার সঙ্গে।—এ পর্যন্ত বলে চাচিজীকে বলল, তোমার যদি কথা ওর সঙ্গে শেষ না হোয়ে গিয়ে থাকে তাহোলে একটু অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে এই পাঁচ-দশ মিনিট।

চাচিজী জানালেন তার কথা শেষ সুতরাং এ নিয়ে বিয়াসকে ভাবতে হবে না।

আমি আর বিয়াস কথা বলতে বলতে তাজমহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

কলকাতার থেকেই দিনক্ষণ হিসেব করে সম্ভবত আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল যাতে পূর্ণিমার রাত্রে আমরা তাজমহলে এসে পেঁছিতে পারি। আজ রাকা। জ্যোৎস্না চুঁইয়ে নামছে তাজমহলের গা বেয়ে। তাজমহলকে দেখে মনেই হয় না শুধুমাত্র সিত অশ্মের সমাধিক্ষেত্র এটা, মনে হয় তাজমহল যেন জীবন্ত একটা কিছু, সর্বক্ষণ যেন ফিস ফিস করে বলে চলেছে, আমি সমস্ত মন-প্রাণ উজার করে তোমাকে ভালবাসি। মনে মনে ভাবি এমনই কিছু যেন শুনতে পাচ্ছি আমি। কার এ কণ্ঠস্বর? সাহাজাহানের! মমতাজের! বুঝে উঠতে পারি না, এ আমার মনের ভুল কি না তাও বুঝে উঠতে পারি না শুধু মনে হয় সেই কথা তাজমহলের চারপাশের বাতাসে ভেসে বেড়াবে অনন্ত কাল ধরে আর তা শুনতেই আমি ছুটে আসব বার বার।

আমরা এসে বসলাম তাজমহলের চত্বরে। বিয়াস আমার দিকে সামান্য ঘুরল, ঘুরে বলল, দিন চার-পাঁচেক আগে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম—মনে আছে?

বললাম, আছে, তোমার প্রত্যেক দিনের প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে।

সুরেখার এখন যে রূপ আমি দেখছি তা ইতিপূর্বে আমি দেখিনি।

আমি নিরুত্তর। কী বলতে চাইছে ও তা আমার বোধগম্য হোল না।

বিয়াসই আবার মুখ খুলল, বলল, একক তোমাকে আজ একটা অনুরোধ করব?

বল।

সুরেখা যে ভাবে নিজের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তাতে ভয় হয়, কিসের ভয় তা তোমার অজানা নয়। একক তোমার কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ

তুমি রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে যাও, একমাত্র তুমিই পার ওকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে।

এ বিশ্বাস তোমার হোল কী করে বিয়াস ?

ওর চোখে আমি দেখতে পাচ্ছি অন্য কিছু, সে তোমারই জন্য একক।

আমি যেন গুরুজীর সেদিনের সেই কথা শুনতে পাচ্ছি আজ আবার। সে কথা যেন মনের মধ্যে হাজার প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করতে থাকল।